আল মাসালিহুল আকলিয়াহ লিল আহকামিন নাকলিয়াহ

(যুক্তির আলোকে শরয়ী আহকাম)

মূল উর্দূঃ

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা

আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদ— মাওলানা বশীর উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী বুক হাউস

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইমরান উল্লাহ
মোহাম্মদী বুক হাউস
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্যঃ সাদা ঃ ১৩৫·০০ টাকা মাত্র।
নিউজ ঃ ১০৯·০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণেঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল কলম কম্পিউটার
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা-১৩১০ ফোনঃ ২৩২৩২৭

পরিবেশনায়
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
৫২, চকবাজার, ঢাকা-১২১১

মোহাম্মদী কুতুবখানা
৩৯/১, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লতীফ বুক করপোরেশন
৬০, চক সার্কুলার রোড
চকবাজার, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকের কথা

হাকীমুল উম্মত মোজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর পরিচয় আলমে ইসলামের কোন অঞ্চলেই আজ নূতন করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামের একজন মুখলিস সেবক ও সংস্কারক হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। বিশেষতঃ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্ম-জীবন মওলানা থানভীর নিকট কতখানি ঋণী তাহা পরিমাপ করিয়া বলা যাইবে না।

একাধারে তিনি অধ্যাপনা, খানকাহ কার্যক্রম, ওয়াজ-নসীহত ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি রচনাসহ দ্বীনের প্রায় সকল বিভাগের খেদমতে কতটা দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছিলেন তাঁহার রচনাবলী পাঠে উহার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের আত্মার সংশোধন ও রূহানী এলাজের ক্ষেত্রে তাঁহার রচনাবলী দিক্‌ভ্রান্ত মুসলিম জাতিকে অনাদিকাল যাবৎ রাহে নাজাতের সন্ধান দিতে থাকিবে। তাঁহার লেখনীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে মানুষের আত্মার রোগের নিখুঁত এক্সে রিপোর্ট এবং উহার প্রতিকার অত্যন্ত স্বার্থকভাবে বিবৃত হইয়াছে।

একই সঙ্গে তিনি ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধানের বাস্তবতার উপর যুক্তিভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী যেই রচনা সম্ভার সৃষ্টি করিয়াছেন- "যুক্তির আলোকে শরয়ী আহকাম" উহারই একটি নমুনামাত্র। ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৮ সালে ইউ, পি'র প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা দারুল এশায়াত এই কিতাবটি প্রথম প্রকাশ করেন। মওলানা থানভীর এই অন্যতম রচনাটি বিগত প্রায় অর্ধশত বৎসর যাবৎ উপমহাদেশের পাঠক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষনে বাঙ্গালী পাঠক মহলে এই মূল্যবান কিতাবটির বঙ্গানুবাদ তুলিয়া দিতে পারিয়া আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শোকর আদায় করিতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

বিষয় | **পৃষ্ঠা**

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

আল মাসালিহুল আকলিয়াহ লিল আহকামিন নাকলিয়াহ

(যুক্তির আলোকে শরয়ী আহকাম)

(প্রথম খণ্ড)

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *
نَحْمَدُ وَ نُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

হামদ ও সালাতের পর আমি অধম (গ্রন্থকার) পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, শরীয়তের মুল উৎস একমাত্র কুরআন ও হাদীছ। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শরীয়তের আহকাম ও মাসায়েল মোতাবেক আমল করা ইহাদের তত্ত্ব ও যুক্তি জানার উপর নির্ভরশীল নহে। কোন মাসআলার উপরে আমল করিতে গিয়া উহার তত্ত্ব ও যুক্তি জানার জন্য অপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে আল্লাহদ্রোহীতা। যেমন, শাসক ও বাদশাহ দেশের প্রজাসাধারণের জন্য আইন চালু করিয়া থাকেন। কোন প্রজা যদি বাদশাহের জারীকৃত আইনের যৌক্তিকতা জানা নাই বলিয়া আইন অমান্য করে আর বলে যে, আইনের যৌক্তিকতা না জানিয়া উহা মানিয়া লইতে পারিব না। এই ব্যক্তি যে রাজদ্রোহী তাহাতে কোন বিবেকবানই সন্দেহ প্রকাশ করিবে না।

শরীয়তের আহকাম ও বিধান জারী করেন আল্লাহ পাক। তাঁহার ক্ষমতা ও মর্যাদা কি দুনিয়ার শাসক ও রাজা বাদশাহের চাইতে কম?

মোটকথা; শরীয়তের আহকামের মূল উৎস একমাত্র কুরআন ও হাদীছ। ইহাতে সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নাই। অবশ্য শরীয়তের প্রতিটি হুকুম ও বিধানের পিছনেই বহু যুক্তি ও রহস্য রহিয়াছে। কিন্তু সেইগুলি শরীয়াতের বুনিয়াদ নহে। তবে একথাও সত্য যে, আহকাম ও মাসায়েলের যুক্তি ও রহস্য

জানা গেলে কোন কোন মানুষের মন তাহাতে আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের আজমত ও কুদরত এবং শরীয়তের উপর সুদৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস আছে তাহাদের আহকাম ও মাসায়েল যুক্তি ও রহস্য জানার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগে দূর্বল ঈমানের লোকদের সংখ্যাই অধিক। এই কারণেই ইমাম গাযযালী, খাত্তাবী, ইবনে আব্দুস সালাম প্রমুখ মনীষী আহকাম বিষয়ক আলোচনায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যুক্তি ও রহস্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

আর আমাদের যুগে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে মুক্ত চিন্তাধারার স্বভাব জন্ম লইয়াছে। ফলে অনেকের মধ্যে এই সমস্ত কারণ ও রহস্য উদঘাটন করিবার আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল তাহাদিগকে এই মনোভাব হইতে বিরত রাখা। কারণ অনেক সময় এই ধরনের আগ্রহ ও অনুভূতি ক্ষতিকর হইয়া থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হইয়াছে যে, গোটা কয়েক সত্যিকার অন্বেষণকারী ব্যতীত সর্বসাধারণকে ইহা হইতে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান কোনরূপ সফলতার আশাপ্রদ ছিল না। তাই মুশকিল বিষয়কে সাবলীল করিয়া তোলার জন্য এবং সর্বসাধারণের সামনে বিষয়টি সহজ সরল করিয়া তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন আলেম আস্তে আস্তে এই বিষয় সম্পর্কে কলম হাতে উঠাইয়া লইলেন। তাহাদের বক্তব্য এবং লিখনের ক্ষেত্রে যদি শরীয়তের সীমারেখার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইত তাহা হইলে তাহাদের লিখা ও বক্তব্যকেই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত। নতুনভাবে এই সম্পর্কে কিছু লিখিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু বিশুদ্ধ ইলমের অভাবের এবং বিশুদ্ধ ইলমের অনুসারীদের সংখ্যা স্বল্পতার কারণে এবং ভ্রান্তিপূর্ণ মতামত ও বিভিন্ন প্রকার কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অধিকাংশ সময় এই ক্ষেত্রে সীমালংঘনের মাধ্যমে কাজ লওয়া হইয়াছিল।

এমতাবস্থায় আমার এক বন্ধু এই বিষয়ের উপর লিখিত একটি পুস্তক আমার কাছে প্রেরণ করিলেন, যাহাতে আমি পুস্তকখানা যাচাইয়ের নজরে দেখি। কিন্তু ইলম ও আমলের ক্রুটির কারণে পুস্তিকাটি দুর্বল ও মজবুত, অর্থাৎ ভালমন্দের যাচাই ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে ভরপুর ছিল। ইহা পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইল যে, এই ধরনের পুস্তিকা সাধারণ লোকদের জন্য বড়ই ক্ষতিকর।

কিন্তু যেহেতু সাধারণভাবে মানুষের স্বভাব ও মেজাজ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে– তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এই পুস্তিকার পরিবর্তে দ্বিতীয় আরেকটি পুস্তিকা তাহাদের হাতে তুলিয়া না দেওয়া যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে এই পুস্তিকা অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখা অসম্ভব হইবে। তাই এইসব লোকদের জন্য এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম যাহা এইসব দোষক্রুটি হইতে মুক্ত হইবে; যদি কাহারও এই বিষয়ে অধ্যয়ন করিবার আগ্রহ থাকে তাহা হইলে সে যেন প্রয়োজন মাফিক গ্রন্থ দেখিয়া লইতে পারে। গ্রন্থটি যদি উপকারী নাও হয় কিন্তু ইহা ক্ষতি হইতে অবশ্যই হেফাজত করিবে।

তবে কাহারও স্বভাবে আহকামের রহস্য অবগত হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব ও মর্যাদা কম হওয়া অথবা আহকামের রহস্যকে আহকামের বুনিয়াদ ও মূল উৎস বলিয়া মনে করা আর এই ধারণা করা যে, আহকামের অস্তিত্ব রহস্য বিদ্যমান থাকার উপর নির্ভরশীল অথবা রহস্যসমূহ বুনিয়াদ মনে করিয়া আহকাম কায়েম করা বর্জন করিয়া রহস্য উদঘাটনের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করা– বড়ই মারাত্মক ক্ষতিকর। আর ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে ইহার দিকে "কখনও কখনও এই আগ্রহ ও অনুভূতি ক্ষতিকর হইয়া থাকে।" এই বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

এই ধরনের স্বভাববিশিষ্ট লোকদের এই গ্রন্থ অধ্যায়ন করিবার কখনও অনুমতি নাই।

আমি অধম (গ্রন্থকার) উপরে উল্লিখিত পুস্তিকা হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া এমন সব বিষয় অত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি যাহা বিশুদ্ধতার গুণে গুণান্বিত।

ইহাতে উল্লেখযোগ্য আহকামসমূহের এমন সব রহস্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহা শরীয়াতের বিধানের পরিপন্থী নয় এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য।

কিন্তু এইসব রহস্যের সবগুলি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয় নাই। আবার এইগুলি শরীয়াতের আহকামের বুনিয়াদও নয়। অধিকন্তু যেসব রহস্য এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে উহার মধ্যে কোন হুকুমের রহস্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং উল্লিখিত রহস্য রহস্যের নমুনা মাত্র।

কিছুকাল আগে হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব (রঃ) এই বিষয়ে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শুনিতে পাইলাম যে, ইহার অনুবাদও করা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের ইহা অধ্যয়ন করা ঠিক নয়। ইহার বিষয়বস্তুর মর্ম উদঘাটন করা খুব কঠিন। কারণ ইহার আলোচনা খুব গভীর তত্ত্ব সম্বলিত।

আমাদের এই যুগেও ইবরাহীম আফেন্দী আলী নামক মিশরে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন আলেম এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটির নাম "আসরারুশ শরীয়াত" 'মাতবায়ে ওয়াযেফ' নামক এক মিশরী প্রতিষ্ঠান ১৩২৮ হিজরীতে ইহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছে। ইহার পূর্বে 'হামিদিয়া' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও একই বিষয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উভয়টি আরবী ভাষায় রচিত। তন্মধ্যে 'হামিদিয়া' নামক পুস্তিকাটির উর্দূ অনুবাদ কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আর কান্দালার মওলবী হাফেজ মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব 'আসরারুশ শরীয়াত' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছেন।

আমার এই গ্রন্থের সাথে উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

যেহেতু প্রত্যেক গ্রন্থেরই রচনভঙ্গি পৃথক। তাই "এক গ্রন্থ অধ্যয়ন করার দ্বারা অপর গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন নাই" এমন ধারণা করা হয় নাই বলিয়া উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেওয়া হইল। অধিকন্তু এই পরামর্শ প্রদানের পিছনে আরও একটি উদ্দেশ্য হইল; যাহাতে মানুষ এই ধরনের গ্রন্থের রচনায় আমাকে একক মনে না করে।

এই গ্রন্থের নাম রাখিলাম, "আলমাসালেহুল আকলিয়া লিল আহকামিন নাকলিয়া" আল্লাহ পাক যেন এই গ্রন্থকে এই বিষয়ে উপকারী এবং আহকামের ক্ষেত্রে সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ দূরীকারক বানাইয়া দেন।

নিবেদক

আশরাফ আলী (উফিয়া আনহু)

প্রথম অধ্যায় / পবিত্রতা

প্রথম পরিচ্ছেদ / ওযু

ওযূর রহস্যসমূহ

পবিত্রতার চারটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নাপাক ও অপবিত্র জিনিস থেকে পবিত্র ও মুক্ত করা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের নাফরমানী ও গোনাহ করা হইতে দৈহিক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করা।

তৃতীয়তঃ বদ চরিত্র ও বদ চিন্তা হইতে অন্তর মুক্ত রাখা।

চতুর্থতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু হইতে অন্তর খালি ও মুক্ত রাখা।

সুতরাং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় অন্তর বাতিল আকিদা হইতে পবিত্র না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী।

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَ نِصْفُ الْاِيْمَانِ *

"পবিত্রতা ঈমানের অংশ এবং অর্ধাংশ"

তাহার জন্য প্রযোজ্য হইবে না। কেননা ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত খারাপ ধারণা ও বদ আকিদা হইতে অন্তর পবিত্র না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার পবিত্রতা অপূর্ণ।

পবিত্রতা ঈমানের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটি অবস্থা। আর প্রত্যেক অবস্থার জন্য বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নিম্নস্তর অতিক্রম করিবে না সে উচ্চস্তরে পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বদ চরিত্র হইতে অন্তর পরিবর্তীত করিয়া প্রশংসিত এবং ভাল ভাল গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতার উচ্চশিখরে পৌঁছিতে পারে না। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী হইতে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ মুক্ত রাখিয়া আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রস্তুত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্তরে (তৃতীয় স্তর)

পৌঁছা সম্ভব নয়। আর যে ব্যক্তি স্বীয় মূল্যবান সময়কে শুধু শৌচকার্য, হাত মুখ পা ধৌত করার এবং পোশাক পরিচ্ছদের সংশোধন ও বাহ্যিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় আর পবিত্র পানি অন্বেষণে ব্যয় করে অথচ অন্তরের পবিত্রতার প্রতি খেয়াল করে না তাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় ও মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগে জর্জরিত; বরং বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পবিত্রতা অন্তরের পবিত্রতা প্রকাশ করিবার জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। হাত, পা, মুখমণ্ডল প্রভৃতি ধৌত করা হয় অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্য। কেননা আমাদের বাহ্যিক কথাবার্তা, কাজকর্ম, চালচলন প্রভৃতির প্রভাব অবশ্যই আমাদের অন্তরের উপর পড়িয়া থাকে।

বিষয়টি অন্যভাবেও বুঝা যাইতে পারে যে, আমাদের ভিতরে যে অবস্থা বিরাজ করিতেছে বাহ্যিক চালচলন ইহার আয়না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার কোন প্রয়োজন নাই বরং ইহার উদ্দেশ্য হইল বাহ্যিক পবিত্রতার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাও জরুরী।

খোদায়ী আহকামের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ার হেকমত

আল্লাহ পাক ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন আর ঔষধের উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলীও বিভিন্ন হয়। ইহা একটি সর্বজনবিদিত বাস্তব। অনুরূপভাবে খোদায়ী আহকামের মধ্যেও বিভিন্ন হেকমত ও রহস্য গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। যেমন– বৃক্ষের এক এক শিকড়ে বা অন্য কোন ঔষধে শত শত গুণ এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এমনকি একটি মাত্র ঔষধেই অনেক সময় কয়েকটি রোগ সারিয়া যায়। সুতরাং উল্লিখিত বিধান মোতাবেক আহকামের মধ্যেও শত শত হেকমত বিদ্যমান থাকা সঙ্গত। ওযুও একটি হুকুম। ইহার মধ্যেও একাধিক রহস্য বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। তাই এখানে ওযু সম্পর্কে যতগুলি রহস্য বর্ণনা করা হইবে ইহাদের সবগুলিই ওযুর মধ্যে পাওয়া যায়। বরং ইহার আরও অনেক রহস্য রহিয়া গিয়াছে, যাহা উল্লেখ করা হয় নাই। অনুরূপভাবে অন্যান্য আহকামের রহস্য বর্ণনা করিতে গিয়া আমরা যতগুলি রহস্য বর্ণনা করিব ইহা ছাড়াও আরও অনেক রহস্য থাকিয়া যাইবে, যাহা পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান পৌঁছে নাই।

ওযুর প্রথম রহস্যঃ গাফলতি বর্জন করা

আমরা এখন কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদীছ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক হইতে ওযুর রহস্যগুলি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিব। তবে কুরআন, হাদীছ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক হইতে সরাসরি উদ্ধৃতি না দিয়া ইহাদের থেকে অর্জিত বিষয়বস্তুর সারকথাটুকু উল্লেখ করিব। ওযুর বিভিন্ন রহস্যের মধ্যে এক রহস্য এই যে, ওযু মানুষকে তাহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গোনাহ এবং গাফলতি বর্জন করার জন্য সতর্ক করিয়া দেয়। যদি ওযু ব্যতীত নামায পড়া শুরু হইত তাহা হইলে মানুষ আরও অধিক গাফলতির ফান্দে আবদ্ধ হইয়া পড়িত এবং অসতর্ক অবস্থায়ই নামায পড়া শুরু করিত। আর পার্থিব চিন্তা ফিকির ও ব্যস্ততার শিকার হইয়া নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া পড়িত। সুতরাং গাফলতির নেশামুক্ত করিবার জন্য ওযুর প্রচলন করা হইয়াছে, যাহাতে বান্দা সতর্ক অবস্থায় স্বীয় অন্তরকে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার সামনে খাড়া হইতে পারে।

দ্বিতীয় রহস্যঃ বিষাক্ত উপাদানসমূহের ক্ষতি হইতে রেহাই

চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, মানবদেহের অভ্যন্তর হইতে বিষাক্ত পদার্থসমূহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শেষ প্রান্তে আসিয়া সমবেত হয়। যেমন, হাত, পা, মুখ, মাথা প্রভৃতি অঙ্গের শেষ প্রান্তে আসিয়া থামিয়া যায়। তন্মধ্যে অনেক বিষাক্ত উপাদান ফোঁড়া, দম্বল, খুঁজলি, পাঁচড়া প্রভৃতির আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ফলে এই বিষাক্ত উপাদানগুলি ধ্বংশ হইতে থাকে। অথবা পানির প্রভাবে এইসব উপাদানের বিষাক্ত উত্তেজনা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে অথবা ধৌত করার কারণে ইহাদের নির্গমন পথ উম্মুক্ত হইয়া যায় বলিয়া বাহির হইয়া পড়ে। (সুতরাং বিভিন্ন চর্মরোগ হইতে রেহাই পাওয়া যায়।)

তৃতীয় রহস্যঃ– আল্লাহ পাকের ভালবাসা অর্জন

আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও ইবাদতের নিয়ত করিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে পবিত্রতা অর্জনকারী আল্লাহ পাকের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ পাক বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

আল্লাহ পাক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিকের পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জনকারীদিগকে মহাব্বত করেন।

অতএব, যে গুণের দ্বারা আল্লাহ পাকের মহব্বত অর্জন করার ও প্রিয়ভাজন হওয়ার মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য হয় সেইগুণের দ্বারা গুণান্বিত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

চতুর্থ রহস্যঃ— ওযুর মাধ্যমে ফিরিশতা—স্বভাব পশু—স্বভাবের উপর প্রাধান্য লাভ করে

কাহারও মধ্যে যখন পাক পবিত্র থাকার গুণটি স্থায়ী হইয়া পড়ে তখন তাহার মধ্যে যে ফিরিশতা–স্বভাব রহিয়াছে, উহার নূরের একটি অংশ সর্বদার জন্য তাহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। আর তাহার মধ্যে বিদ্যমান পশুত্ব স্বভাবের অন্ধকার তলাইয়া যায়।

পঞ্চম রহস্যঃ— বুদ্ধি বৃদ্ধি

পবিত্রতার দ্বারা স্বভাবের মধ্যে বুদ্ধির উপাদান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কারণ ওযুর দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ধৌত হওয়ার পর প্রতিটি লোম কূপের উপর হইতে প্রতিবন্ধকতা দূর হইয়া যায়। ফলে উহা খুলিয়া যায় আর দেহাভ্যন্তর হইতে অপবিত্র ময়লা বাহির হইয়া পড়ে আর নির্মল বায়ূ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে। ফলে মস্তিষ্কের শক্তি প্রখর হইয়া বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইতে থাকে। আর বুদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করিলে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ হয়। ফলে তাঁহার নৈকট্য অর্জনও পূর্ণ হয়।

ষষ্ঠ রহস্যঃ— ওযু নূর প্রসন্নতা ফিরিয়া আসার উপায়

গোনাহ এবং অলসতার কারণে অন্তরের যে নূর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে প্রসন্নতা দূরীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, ওযু করার পর উহা আবার ফিরিয়া আসে। আর আজকের ওযুর ফলে অন্তরে অর্জিত নূর কিয়ামতের দিবসে ওযুর অঙ্গসমূহের উপর উজ্জ্বল ভাবে চমকিতে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

إِنَّ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ *

কিয়ামতের দিনে যখন আমার উম্মত ময়দানে আসিবে তখন ওযুর নিদর্শন হিসাবে তাহাদের হাত, পা ও মুখমণ্ডল জ্যোতিময় হইয়া উঠিবে। এইজন্য তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় জ্যোতি বৃদ্ধি করিতে শক্তি রাখ সে যেন তাহা করে। (বোখারী, মুসলিম)

অন্য হাদীছে আছে যে–

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ *

দেহের যতটুকু স্থান পর্যন্ত ওযুর পানি পৌঁছিবে মুমিনের ততটুকু স্থান পর্যন্ত বেহেশতের অলংকার পরিধান করানো হইবে। (মুসলিম)

সপ্তম রহস্য ঃ—ওযুর দ্বারা ফিরিশতাদের নৈকট্য অর্জিত হয়

ওযুর কারণে মানুষ ফিরিশতাদের নৈকট্য ও সাহচর্য লাভ করে। সুতরাং সে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার মর্যাদা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। কারণ পবিত্রতার প্রভাবে শয়তান মানুষ হইতে দূরে সরিয়া যায়। (অতএব আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ সুগম হয়।)

অষ্টম রহস্যঃ— আল্লাহ পাকের বিশেষ নিদর্শনের মধ্যে পবিত্র বদনে প্রবেশ করা

দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের যেসব নিদর্শন রহিয়াছে তন্মধ্যে নামায একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আল্লাহর এই নিদর্শনে প্রবেশ করার জন্য ওযু করাকে অপরিহার্য শর্ত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ ওযু নামাযের চাবি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

নবম রহস্য— স্ব—অবস্থা পেশ করা

স্বীয় অবস্থা জানানের জন্য এবং স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের আবেদন করার জন্য এবং রাজকীয় বিধান ও নির্দেশ শুনার জন্য প্রজাদের রাজ দরবারে যাইতে হয়। সেখানে উপস্থিত হওয়ার সময় রাজদরবারের সম্মান সূচক এবং আদব প্রদর্শনমূলক অনেক কাজ করিতে হয়। এই সবকিছু আবেদনেরই শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত।

স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলে আবেদন করার জন্য মুখের প্রয়োজন আবার রাজকীয় বিধান শুনার জন্য কর্ণের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে রাজদরবারে হাযির হওয়ার জন্য হাত, মুখ, পা প্রভৃতি অঙ্গ ধৌত করা এবং পোশাক পরিচ্ছদ সংশোধন করা একান্ত জরুরী। কেননা হাত, মুখ ও পা ধৌত করা এবং পোশাক পরিচ্ছদ সংশোধন করিয়া দরবারে যাওয়া দরবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

অনুরূপভাবে আমির ওমরাহ এবং রাজা বাদশাহদের সামনে হাযির হওয়ার সময় অথবা কোন ভাল বা পবিত্র কাজ করার ইচ্ছা করিলে ওযুর অঙ্গগুলি ধৌত করিয়া লইতে হয়। কেননা এইসব অঙ্গ খোলা থাকার কারণে অধিকাংশ সময় ইহাতে ধূলিবালি ও ময়লা লাগিয়া থাকে, তাই এইসব অঙ্গ ধৌত করিতে হয়। অধিকন্তু একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময়ও এই অঙ্গগুলি দৃষ্টির সামনে পড়ে।

নামাযের জন্য ওযু করাও অনুরূপ। নামাযে যাওয়ার অর্থ হইল, মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া। তাঁর কাছে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের আবেদন করা এবং স্বীয় অবস্থা তাঁহার সামনে পেশ করা। সুতরাং নামাযের পূর্বে ওযু করা এই মহান দরবারের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করা।

দশম রহস্য– ওযুর দ্বারা প্রধান প্রধান অঙ্গগুলিতে শক্তি অর্জন হওয়া এবং এইগুলি সজাগ হওয়া

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, হাত পা ধৌত করার আর মুখমণ্ডল ও মাথার উপরে পানি ছিটানের ফলে দেহ ও মনের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে এবং প্রধান প্রধান অঙ্গগুলিতে শক্তি সঞ্চার হয়। আর এইগুলি অসতর্ক অবস্থা হইতে সজাগ হইয়া উঠে। ইহার দ্বারা গাফলতি, ঘুম এবং চরম পর্যায়ের বেহুঁশী দূরীভূত হয়। সুদক্ষ চিকিৎসকদের ব্যবস্থা–পত্রের দ্বারাও এই অভিজ্ঞতার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা কোন ব্যক্তি যদি চৈতন্য হারাইয়া ফেলে বা তাহার অধিক দাস্ত হয় অথবা তাহাকে সিঙ্গা লাগানো হয়– এমতাবস্থায় চিকিৎসকগণ উল্লিখিত অঙ্গসমূহের উপর পানি ঢালার নির্দেশ দেন।

আল্লামা কারশী স্বরচিত 'মোজেয' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন এবং অন্যান্য

চিকিৎসকগণও লিখিয়াছেন যে, "মুখ, হাত এবং পায়ের উপর পানি ছিটানো দেহের মৌলিক ও স্বাভাবিক তাপকে তাজা ও শক্তিশালী করে।" আর উষ্ণতার ও গ্রীষ্মের কষ্টের কারণে অচৈতন্য অবস্থায় এই সব অঙ্গে পানি ছিটানো খুব উপকারী। এই ভিত্তিতে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে স্বীয় দেহের ক্লান্তি, উদাসীন, অলসতাভাব, মলিনতা প্রভৃত্তি ওযুর মাধ্যমে দূরীভূত করার জন্য। যাহাতে আল্লাহ পাকের সামনে খাঁড়া হওয়ার যোগ্য হইতে পারে। কেননা, আল্লাহ তো সর্বদা সজাগ ও হুঁশিয়ার। যেমন, কুরআনে বলা হইয়াছে لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ * আল্লাহ পাকের তন্দ্রা ও নিদ্রা আসে না। সুতরাং অসতর্ক ও ক্লান্ত অলস ব্যক্তি তাঁহার দরবারে খাড়া হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না। তাই ওযুর মাধ্যমে ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূর করিয়া সতর্ক হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়।

অসতর্ক ক্লান্ত অবস্থায় আল্লাহর সামনে খাড়া হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না বলিয়া নেশাগ্রস্থ ও বেহুঁশ অবস্থায় নামায পড়া বৈধ নহে। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكَارٰى *

তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যাইও না।

কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন হাকিম বাদশাহের সামনে যাওয়ার অনুমতি পায় না। যখন কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন হাকিমের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি পায় না, তখন যে ব্যক্তি নিজেকে নেশাগ্রস্ত ও গাফেল ব্যক্তির ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে, সে কি করিয়া সকল হাকীমের হাকীম আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার মর্যাদা লাভের যোগ্য হইতে পারে? নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া নিষেধ করার কারণ হইল যে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝিতে পারে না যে তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইতেছে আর সে অন্তর দিয়া কি চিন্তা করিতেছে। এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন– حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ এমন অবস্থায় নামায পড় যে, তোমরা কি বলিতেছ তাহা যেন তোমাদের অন্তর জানিতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের মুখ দিয়া যে সকল শব্দ বাহির হইতেছে তোমাদের অন্তর সেগুলি সম্পর্কে অবগত থাকা একান্ত জরুরী।

ওযু সমাপ্ত করিয়া তাওবার দোয়া পাঠ করার রহস্য

ওযুর মধ্যে সাত অঙ্গ ধৌত করা প্রকারান্তে সাত প্রকার গোনাহ পরিত্যাগ করার দিকে ইঙ্গিত, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার পন্থা, ভিতর বাহির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য আবেদন এবং স্বীয় অবস্থার মাধ্যমে খোদার কাছে দোয়া করা। ইহার পর স্বীয় জবান দ্বারা দোয়া করা আল্লাহর রহমত ও দয়া স্বীয় অভিমুখী করার উপযুক্ত পন্থা ও আপন উদ্দেশ্য হাসিলের সুদৃঢ় উপায়। ওযু করার ফলে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পানি দ্বারা পবিত্র হইয়া যাওয়ার পর অন্তরও পাক্ সাফ হইয়া যাওয়া মানুষের স্বভাবগত চাহিদা। কিন্তু অন্তর পাক সাফ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাহারও হাত নাই। তাই এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁহারই সামনে হাত পাতিতে হয়। এই নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

হে আল্লাহ! আমাকে তাওবা করনেওয়ালা এবং পবিত্র অন্তরবিশিষ্ট লোকদের দলভুক্ত করিয়া দিন।

ওযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে হইবে কেন?

ওযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করিবার যে ধারাবাহিকতা কুরআনে পাকে উল্লেখ করা হইয়াছে উহার বিপরীত করা উচিত নহে। কেননা কুরআনে পাকে অঙ্গসমূহ ধৌত করার যে ধারাবাহিকতা উল্লেখ করা হইয়াছে মানুষের থেকে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা ও গোনাহের প্রকাশ ইহাদের ঐ ধারাবাহিকতা অনুসারেই হইয়া থাকে। তাই কুরআনে উল্লিখিত ধারাবাহিকতা অনুসারে ওযুর অঙ্গগুলি ধৌত করা **এই সকল অঙ্গগুলিকে** গোনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী থেকে ধৌত করার এবং ইহাদিগকে গোনাহ থেকে তাওবা করানের ইঙ্গিত বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ, মানুষের যে অঙ্গ দ্বারা প্রথমে গোনাহ হয় উহাকে সর্বপ্রথম ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর ধৌত করার দ্বারা এই অঙ্গের গোনাহ পরিত্যাগ করা এবং এই অঙ্গের তাওবা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মুখমণ্ডল সর্বপ্রথম ধৌত করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়াছেন।

মুখমণ্ডলে মুখ, নাক, চক্ষু প্রভৃতি রহিয়াছে। মুখমণ্ডল ধৌত করিতে গিয়া প্রথমে কুলী করার দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা হয়। ইহার দ্বারা জিহ্বার তাওবার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম জিহ্বার তাওবা করানের কারণ হইল এই যে, মানুষের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে জিহ্বা আল্লাহর হুকুম সর্বাধিক লংঘন করিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَكْثَرُ خَطَايَا اِبْنِ اٰدَمَ فِي لِسَانِه *

বনী আদমের অধিকাংশ গোনাহ তাহার জিহ্বার মাধ্যমে হইয়া থাকে। যেমন– কুফুরী কথা, গীবত, চোগলখুরী, গালিগালাজ এবং অন্যান্য শত শত অনর্থক বেফায়দা কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে।

অতঃপর পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা হয়। ইহা যেসব জিনিসের ঘ্রাণ লওয়া নিষিদ্ধ ঐসব জিনিসের ঘ্রাণ লওয়া হইতে এবং গর্ব ও অহংকারের চিন্তা ফিকির হইতে তাওবা করিবার আলামত।

অতঃপর চক্ষুদ্বয় এবং কপালসহ মুখমণ্ডলের সবকিছু ধৌত করিতে হয়। ইহা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া যেসব গোনাহ করে তাহা এবং চক্ষুদ্বয়ের কুদৃষ্টি বর্জন করার দিকে ইঙ্গিত করা হইতেছে। অতঃপর উভয় হাত ধৌত করিতে হয়। ইহার দ্বারা হাতেকৃত গোনাহসমূহ বর্জন করার দিকে ইঙ্গিত করা হইতেছে। মুখমণ্ডল ধৌত করার পর হাত ধৌত করার নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষ কথা বলার এবং চক্ষুদ্বয় দ্বারা দেখার পর হাতদ্বারা ধরে বা ছাড়ে। অর্থাৎ মুখমণ্ডলের পরে হাতের কাজ শুরু হয়। তাই এইরূপ করা হইয়াছে।

অতঃপর মাথা মসেহ করিতে হয়। কিন্তু মাথা ধৌত করা হয় না। কেননা মাথা নিজে সরাসরি কোন গোনাহে লিপ্ত হয় না। তবে জিহ্বা এবং চোখের অধীনে থাকিয়া গোনাহে লিপ্ত হয়। এখন গোনাহের দিকে দৃষ্টি দিলে মাথা ধৌত করিতে হয় আর সরাসরি গোনাহে লিপ্ত হয় না বলিয়া ধৌত না করা উচিত। উভয় দিকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহার জন্য এমন এক নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহা ধৌত করা আর না করা উভয়ের মধ্যভাগে হয়। তাহা হইল মসেহ করা।

অতঃপর কর্ণ মসেহ করিতে হয়। কেননা অধিকাংশ সময় মানুষের কর্ণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কিছুর আওয়াজ আসিয়া পড়ে। খারাপ কথা শ্রবণ করা তো গোনাহ। এই হিসাবে ধৌত করা প্রয়োজন। আবার যেহেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোনাহে লিপ্ত হইতে হয়। তাই ধৌত না করা উচিত। উভয় দিকের প্রতি খেয়াল রাখিয়া ধৌত করা আর ধৌত না করা উভয়ের মধ্যভাগের নির্দেশ দেওয়া হইল। তাহা হইল মসেহ করা। গ্রীবাদেশ মসেহ করারও অনুরূপ রহস্য রহিয়াছে। মাথা, কান ও গ্রীবাদেশ মসেহ করার দ্বারা ঔদ্ধত্ব এবং হক কথা না শুনার বদ আমল হইতে তাওবা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উল্লিখিত অঙ্গসমূহের মসেহ করিবার দ্বিতীয় আর একটি কারণ ইহাও বলা যায় যে, যদি এই সব অঙ্গ ধৌত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইত তাহা হইলে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হইত। মানুষ খুব মারাত্মক কষ্টে নিপতিত হইত। কারণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবার জন্য যে ব্যক্তির পাঁচবারই ওযু করার প্রয়োজন হয়। সে বাধ্য হইয়া প্রতিদিন পাঁচবার মাথায় পানি ঢালিত। আর ইহা তাহার জন্য নিশ্চিত অসুবিধার সৃষ্টি করিত। অথচ আল্লাহ পাক নিজেই কুরআনে পাকে ইরশাদ করিয়াছেন যে,

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ *

আল্লাহ পাক তোমাদিগকে কোন অসুবিধায় ফেলিতে চান না।

অতঃপর পদদ্বয় ধৌত করিতে হয়। কেননা চোখ দেখে, মুখ কথা বলে, হাত ধরে, কর্ণ শ্রবণ করে এইসব কিছুর পর পা চলিতে থাকে। এইজন্য সর্বশেষে পা ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ আল্লাহ পাকের হুকুমের বিরোধিতা পায়ের দ্বারা সকলের শেষে হয়। তাই ইহার তাওবার পালাও সকলের শেষে। তাওবার তিনটি রোকন ১। কৃত গোনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া। ২। গোনাহ বর্জন করা। ৩। ভবিষ্যতে গোনাহ না করার জন্য পাকাপোক্ত নিয়ত করা। ওযুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করার দ্বারা তাওবার উল্লিখিত অংশত্রয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পবিত্রতা অর্জনের রহস্য (সংক্ষিপ্তভাবে)

পবিত্রতা ছোট হউক যেমন– ওযু করা, আর বড় হউক, যেমন– গোসল

করা উভয়টিই অর্জন করার উদ্দেশ্য হইল অন্তর আলোকিত হওয়া, মনের মধ্যে প্রফুল্লতা অর্জিত হওয়া, খারাপ চিন্তা ফিকির দূর হওয়া এবং এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল ভাবনা এবং পেরেশানী মনের মধ্যে না আসা। সুতরাং পবিত্রতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হইল অন্তরের আলো, মনের প্রফুল্লতা, এবং চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হইয়া চিত্তের প্রশান্তি লাভ।

মাথা এবং কান মসেহ করার জন্য পৃথকভাবে নতুন পানি লওয়ার রহস্য

মাথা ও কান মসেহ করিবার জন্য পৃথকভাবে নতুন পানি লওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, এই দুই অঙ্গের তাওবা মুখমণ্ডল ও হাতের তাওবার অধীন নয়। ইহাদেরও পৃথক তাওবা রহিয়াছে। এমন নহে যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তাওবার দ্বারা ইহাদের তাওবা সারিয়া গিয়াছে।

মাটি এবং পানি এই দুই বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ হওয়ার ভেদ

মাটি এবং পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ হওয়া সহজ সরল স্বভাব ও নির্মল বিবেকের চাহিদা। কারণঃ ১। আল্লাহ পাক পানি ও মাটির মধ্যে স্বভাবগতভাবে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কায়েম করিয়াছেন। এককে অপরের ভ্রাতা বানাইয়াছেন। অনুরূপভাবে শরয়ী বিধান কায়েম করার ক্ষেত্রে এককে অপরের ভ্রাতা নির্ধারণ করিয়াছেন। এই জন্যই উভয়ের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ করিয়াছেন। যেহেতু হযরত আদম (আঃ) ও তাঁহার সন্তানদিগকে আল্লাহ পাক মাটি ও পানি দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন; যেন আমাদের পিতামাতা ও তাঁহাদের সন্তানাদি মাটি ও পানি হইতেই জন্ম লইয়াছে, সেহেতু তাঁহাদের দেহের পবিত্রতার জন্য মাটি ও পানিকে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

২। আল্লাহ পাক প্রতিটি প্রাণীর জীবন পানি ও মাটির উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন। মানুষ, পশুপক্ষী সকলের সর্বপ্রকার খাদ্য এবং জীবন ধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই বস্তুদ্বয় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ এই দুইটি বস্তু ব্যাপকভাবে সর্বস্থানে পাওয়া যায়। তাই বস্তুদ্বয়কে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে ধনী গরীব প্রত্যেকেই কোন না কোন একটি প্রয়োজনের সময় পাইতে পারে।

৩। মাটি দ্বারা মুখ মাখা আল্লাহ পাকের খুব পছন্দনীয়। যেহেতু স্বভাবগতভাবে বস্তুদ্বয়ের সম্পর্ক খুব মজবুত ও সুদৃঢ়। তাই শরয়ী বিধানগতভাবে তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক কায়েম করিয়া দেওয়া খুব উপযোগী হইয়াছে।

ওযু করার পর অতিরিক্ত পানি পান করার রহস্য

ওযু করার পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করার রহস্য এই যে, ওযু করনেওয়ালা স্বীয় বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর পানি ঢালিয়া বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ হইতে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। অতঃপর পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করিয়া এইদিকে ইঙ্গিত করে, হে আমার খোদা! আপনি যেভাবে আমার বাহ্যিক পাক সাফ করিয়াছেন অনুরূপভাবে আমার ভিতরও পাক সাফ করিয়া দিন।

ওযুর জন্য সাতটি অঙ্গ খাছ করার কারণ

১। মানুষের দৈহিক গঠনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে সাতটি অঙ্গ এমন রহিয়াছে যে, শরীয়তের সমস্ত বিধানগুলি আদায় করা ইহাদের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের প্রত্যেকের দুইটি দিক এবং ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুই ধরনের শক্তি বিধ্যমান রহিয়াছে। অঙ্গ সাতটি হইল জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্ক, (অবশ্য নাক ইহার অন্তর্ভুক্ত।) হাত, পা এবং লজ্জাস্থান।[১] ইহাদের সাথে শুধু শরীয়তের বিধানগুলি সম্পর্কিত নয় বরং ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের সমস্যাগুলি পর্যন্ত সম্পর্কিত। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুইটি দিক ও দুই ধরনের শক্তি থাকার অর্থ, ইহাদের মাধ্যমে গোনাহ করিয়া মানুষ জাহান্নামের দিকে ধাবিত হইতে পারে আবার ইহাদের মাধ্যমেই নেক আমল করিয়া বেহেশত লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে। যেহেতু এই

নোটঃ ১

ওযু করার সময় লজ্জাস্থান ধৌত করিতে হয় না। কিন্তু ওযু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত দেহ সর্বপ্রকার হাকিকী নাপাকী হইতে মুক্ত হওয়া। আর এই প্রকার নাপাকীর সম্পর্ক লজ্জাস্থানের সাথে অধিক। এই হিসাবে লজ্জাস্থানও ওযুর অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

সাতটি অঙ্গ মানুষকে জাহান্নামের পথে ঠেলিয়া দেয়, তাই জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই সাতটি অঙ্গ ধৌত করার মাধ্যমে ইহাদের দ্বারা কৃত গোনাহ হইতে তাওবা করার আমল চালু করা হইয়াছে। তাই এই সাতটি অঙ্গ ওযুর জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে।

সাত অঙ্গের দ্বারা গোনাহের কার্য না করিয়া নেক আমল করিলে বেহেশত লাভ হইবে। বেহেশত আটটি। আর অঙ্গ সাতটি। সাত অঙ্গের দ্বারা নেক আমলের বিনিময়ে আল্লাহ পাক সাতটি বেহেশত দান করিবেন। আর অবশিষ্ট একটি বেহেশত দান করিবেন পুরস্কার হিসাবে। কারণ মেহেরবান দাতার তরীকা হইল যে, তিনি স্বীয় সন্তুষ্টি ও খুশী প্রকাশ করার সময় প্রতিশ্রুতি পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক দিয়া থাকেন।

২। অপরাধ ও গোনাহ মৌলিকভাবে সাত প্রকার। ওযুর মধ্যে সাত অঙ্গ ধৌত করার দ্বারা এই সাত প্রকার গোনাহ হইতে তাওবা করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন কুরআনে আসিয়াছে-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

"আল্লাহ পাক তাওবাকারীদিগকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে ভালবাসেন।" এই আয়াতে প্রত্যেক পবিত্রতা অর্জনকারীকে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতার এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার ও গোনাহ বর্জন করার পথ দেখানো হইয়াছে।

সুতরাং ওযুর মধ্যে সপ্ত অঙ্গ ধৌত করার জন্য খাছ করার দ্বারা উল্লিখিত সাত প্রকার গোনাহ ধৌত করা এবং ইহাদের থেকে হাত গুটানের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর ইহার দ্বারা মানুষ জাহান্নামের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করিয়া বেহেশতে প্রবেশের যোগ্য হয়। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَة يَدْخُلُ مِن اَيها شَاءَ

তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন ওযু করে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযু করে

অতঃপর পরে এই দোয়া পাঠ করে, হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত করুন। তখন তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া যায়। সে যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা করে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারে।

অত্র হাদ্বীছ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ওযু বৈধ হওয়ার বিভিন্ন রহস্যের মধ্যে ওযুর মাধ্যমে তাওবা করা এবং অন্তর পরিষ্কার করাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ওযুর মধ্যে যে সাতটি অঙ্গ ধৌত করিতে হয় ইহারা হয় মানুষের জন্য জাহান্নামের গর্তের দিকে রাস্তা অথবা বেহেশতের দরজার দিকে রাস্তা। যেমন কবি বলেন–

راہ جنت نارداین اعضا ھے تسین + ھر چه کارن بدروي بررا ئے تست

তোমার এই সব অঙ্গগুলি জাহান্নাম এবং জান্নাতের রাস্তা। এখন যাহা কিছু বপন কর আর কাট তাহা তোমার অভিমত।

৩। আল্লাহ পাক মানুষকে এমন এক স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, মানুষ চক্ষু দ্বারা যাহা দেখে, কান দ্বারা যাহা শুনে, নাসিকা দ্বারা যাহার ঘ্রাণ লয়, জিহ্বা দ্বারা যাহার স্বাদ গ্রহণ করে, হাত দ্বারা যাহা স্পর্শ করে, উহার প্রভাব তাহার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে। তাহার মধ্যে কোন খেয়াল বা ধারণা সৃষ্টি হইলে উহার প্রভাব তাহার চরিত্রের উপর পড়ে।

মানুষের অন্তরের ভিতর হইতে যেসব কথা বা চিন্তা বাহির হইয়া আসে তাহা বাহির হইতে তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট কথা ও চিন্তা অপেক্ষা কম বরং ইহা এইভাবে বলা যায় যে, তাহার অন্তর হইতে ঐসব জিনিস বাহির হইয়া আসে যাহা বাহির হইতে তাহার অন্তরে প্রবেশ করে। মোটকথা, বাহিরের প্রত্যেক জিনিস তাহার অন্তরে প্রভাব ফেলিয়া থাকে। সুতরাং ওযুর মধ্যে সাতটি অঙ্গ ধৌত করিতে হয়। আর সাত অঙ্গ ধৌত করার প্রভাবও তাহার অন্তরে পড়িয়া থাকে। অঙ্গ সাতটি ধৌত করার দ্বারা তাহার মধ্যে আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ হয়। অনুরূপভাবে তাহার অন্তরেও ইহার প্রভাব পড়িয়া থাকে।

প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করিয়া ধৌত করিবার রহস্য

১। ইতিপূর্বে উল্লিখিত দোয়া হইতে বুঝা গিয়াছে যে, ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার দ্বারা উহার গোনাহ হইতে তাওবা করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়। তাওবার মূল অংশ তিনটি। যেমনঃ– গোনাহ বর্জন করা, কৃত গোনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতে গোনাহ বর্জন করিবার পাকাপোক্ত নিয়ত করা। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করার দ্বারা তাওবার তিন অংশ হইতে তাওবা করা বুঝায়।

২। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবারই ধৌত করা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কারণ তিনবারের কম ধৌত করিলে অন্তরে ইহার পুরাপুরি প্রভাব পড়ে না বরং তিনবারের কম ধৌত করা অলসতার অন্তর্ভুক্ত। আবার তিনবারের অধিক ধৌত করা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই ধৌত করার এক নির্ধারিত সীমা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় যেসব মানুষ কোন কার্য পুরা হইয়া যাওয়ার পরও অপূর্ণতার সন্দেহের রোগে আক্রান্ত, তাহারা অঙ্গসমূহ ধৌত করিবার কাজে সারাদিন ব্যয় করিয়া দিবে এমনকি নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত চলিয়া যাইবে তবু তাহারা মনে করিবে যে, তাহাদের ওযু পুরা হয় নাই। এইজন্যই প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করিবার সীমা তিনবার নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর তিনবার ধৌত করার মান যখন এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওযুর মধ্যে কি অপচয় আছে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, نَعَمْ : وَلَوْ كُنْتَ عَلٰى ضَفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ হ্যাঁ, ওযুতেও অপচয় আছে যদিও প্রবাহিত নহরের কিনারায় বসিয়াও ওযু কর। তবে কোন কোন স্থান এমনও রহিয়াছে যেখানে অঙ্গসমূহের উপর বার বার পানি ঢালিলেও পানির অপচয় হইবে না সত্য কিন্তু ওযু করনেওয়ালার সময়ের অপচয় অবশ্যই হইবে। আর সময়ের অপচয় করা তো মারাত্মক অপচয়।

মিসওয়াক করার (দাঁত মাজার) রহস্য

১। দাঁত পরিষ্কার করা এবং উজ্জ্বল করা সাধারণভাবে বড় উপকারী কাজ। সাথে সাথে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যখন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কোন দরবারে হাযির হইতে হয় তখন দরবারে হাযির হওয়ার পূর্বে বাহ্যিক অবয়ব

পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃত্তি সজ্জিত করা, দাঁত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা একান্ত জরুরী। কেননা কথাবার্তা বলার সময় যদি অপরিষ্কার দাঁতের হলুদ বর্ণ এবং ময়লা দৃষ্টিতে পড়ে তাহা হইলে নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বভাবে অবশ্যই ঘৃণার সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহ পাকের দরবার অপেক্ষা কাহার দরবার অধিক মর্যাদাশীল হইতে পারে? সুতরাং আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় এই দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া জরুরী। কেননা إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ * আল্লাহ পাক সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। সুতরাং দাঁতের ময়লা আর মুখের দুর্গন্ধ তিনি কিভাবে পছন্দ করিতে পারেন?

ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ট ইবাদত নামায। ইহা আদায় করিবার জন্য যেভাবে অন্যান্য অপবিত্রতা ও ময়লা হইতে পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় তেমনিভাবে দাঁতের ময়লা এবং দাঁতের মাড়ির দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা দূর করিয়া নামাযে উপস্থিত হওয়া উত্তম। আর এই উদ্দেশ্যেই নামাযের পূর্বে মেসওয়াক ব্যবহার করা হয়। আর নামাযের মধ্যে যে সকল বিষয় পালন করা হয় উহাতে দৈহিক উপকার ব্যতীতও পরকালীন উপকার অর্থাৎ সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং মিসওয়াক করার মধ্যে সওয়াব লাভ হয়।

২। যদি কেহ অনেকদিন পর্যন্ত দাঁত না মাজে তখন আস্তে আস্তে খাদ্যের অবশিষ্ট অংশগুলি দাঁতের গোড়ায় জমা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লার সৃষ্টি হয়। পরে ইহা পচিয়া পোঁজের সৃষ্টি করে। মুখ দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি যখন মসজিদে গিয়া নামাযের কাতারে খাঁড়া হয়। তখন তাহার কারণে অন্যান্য নামাযীরা ও পবিত্র ফিরিশতারা কষ্ট পাইতে থাকে। ইহা আল্লাহর কাছে এক অপছন্দনীয় কাজ যেমন। তেমনি এবং মানুষের কাছেও অপছন্দনীয় কাজ।

আল্লাহর নামে ওযু শুরু করার ভেদঃ—

যেহেতু আল্লাহ পাকের নির্দেশেই নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন নির্ধারিত হইয়াছে তাই এই পবিত্রতা অর্জনের কাজ আল্লাহর নামে ও তাঁহার উদ্দেশ্যেই শুরু হওয়া জরুরী, যাহাতে এই কার্যে সওয়াব অর্জিত হয়। হাদীছে পাকে

আসিয়াছে। إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ নিয়তের দ্বারা আমলের সওয়াব পাওয়া যায়।

কবি বলেন–

سید الاعمال بالنیات گفت + نیت خیرت بسے گلها شگفت

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিয়তের দ্বারাই সমস্ত আমলের সওয়াব মিলে; এই জন্য তোমার ভাল নিয়তে অনেক ফুল ফুটাইয়া দিয়াছে।

কেননা যদি শুধু অভ্যাস হিসাবে অসতর্ক অবস্থায় ওযু করা হয়, আর ইহার দ্বারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ মান্য করা হইতেছে এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হইতেছে এমন বিশ্বাস না করা হয় তাহা হইলে এই ওযু করার দ্বারা কোন সওয়াব হইবে না। এই জন্যই আল্লাহর নাম লইয়া ওযু করা সাব্যস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে নামায, ইবাদত, আল্লাহর নৈকট্য, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়া প্রভৃতি খেয়াল অন্তরে পয়দা হয়। আর ওযু করনেওয়ালা অসতর্কতার পর্দা ছিন্ন করিয়া সতর্ক হইয়া উঠে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন –

لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ *

যে ব্যক্তি ওযু করার সময় আল্লাহর নাম লয় নাই তাহার ওযু হয় নাই।

(ইবনে মাজা)

মুখ, হাত, পা তিনবার ধৌত করা হয় অথচ মাথা এবং কর্ণ তিনবার মসেহ করা বৈধ নহে ইহার কারণ কি?

প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য অঙ্গগুলি যেমন তিনবার করিয়া ধৌত করা সাব্যস্ত করা হইয়াছে তেমনিভাবে মাথা এবং কানও তিনবার করিয়া মসেহ করা সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনবার মসেহ করার ফলে মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিবে বিধায় দুইবার হ্রাস করিয়া দিয়া মাত্র একবার মসেহ করা অবশিষ্ট রাখা হইয়াছে। (শরহে মুসনাদে ইমাম আযম ২১৯ এবং ২৮০ পৃষ্ঠা)

মাথা ও কর্ণ বাদে ওযুর অন্যান্য অঙ্গগুলি ধৌত করা হয়। কিন্তু এই দুই

অঙ্গ ধৌত করা হয় না বরং মসেহ করা হয়। এই অঙ্গদ্বয়ও ধৌত করা হইলে মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিত। এখন যদি মসেহ করিতে গিয়াও তিনবার মসেহ করিতে হয়। তাহা হইলে যে অসুবিধার কারণে ইহাদের ধৌত করার হুকুম রহিত করা হইল সে অসুবিধা তো দূরীভূত হইল না। কেননা যে অঙ্গটি ভিজা হাত দ্বারা তিনবার মসেহ করা হইবে উহা ভিজিয়া যাওয়ার মত হইয়া যাইবে। আর শীতপ্রধান দেশে মাথা এবং কর্ণকে শীতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুতরাং এমন দেশে বসবাসকারী লোকেরা যদি প্রতিদিন পাঁচবার এইভাবে মাথা ও কর্ণ ভিজায় তাহা হইলে ইহাতো তাহাদের জন্য ধ্বংসের মারাত্মক রোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণে সতর্কতা স্বরূপ এবং সম্ভাবনাময় ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথা এবং কর্ণ একবার করিয়া মসেহ করা সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

ওযুর মধ্যে প্রত্যেক ডান অঙ্গকে প্রথমে ধৌত করিবার কারণ ইসতিনজা ও নাক সাফ করিতে বাম হাত খাছ করার রহস্য

১। প্রত্যেক অঙ্গের ডান অংশ বাম অংশের উপর মর্যাদা রাখে। কবি বলেন–

کنیم دارد فضیلت یمین بریسار *

বাম হাতের উপর ডান হাত মর্যাদা রাখে। আর বিধান হইল যে, মর্যাদাসম্পন্ন কর্ম প্রথমে মর্যাদাশীলের দ্বারা সম্পাদন করানো। ওযুর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ ধৌত করা মর্যাদাসম্পন্ন কর্ম। সুতরাং প্রত্যেক অঙ্গের ডান অংশ প্রথমে ধৌত করাই বিধানসম্মত। অতএব যে অঙ্গের উভয় দিক কাজে ব্যবহার করা হয়, উহার মধ্যে ডান দিক প্রথমে ব্যবহার করা বিধান। আর যদি অঙ্গের মাত্র একদিক ব্যবহার করিতে হয় আর কাজগুলি প্রশংসনীয় ও পবিত্র কাজ হয় তাহা হইলে শুধু ডান দিকটি ব্যবহার করা উচিত। আল্লাহ পাকের কাছেও এই নিয়মই চালু রহিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন–

وَ يُـؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ *

আল্লাহ পাক মর্যাদাশীল জিনিসকে ইহার মর্যাদা দান করিয়া থাকেন।

২। ন্যায়পরায়ণতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা যাহার উদ্দেশ্য হয় সে যেন

প্রত্যেক জিনিসের হক আদায় করে। খানা–পিনা এবং পবিত্র জিনিসের জন্য ডান হাত ব্যবহার করে আর নাপাকী ও অপবিত্রতা দূর করার জন্য বাম হাত নির্ধারণ করে। বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ ইবনে মাজাতে রহিয়াছে–

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِيْ الطُّهُوْرِ

وَ تَرَجُّلِهٖ اِذَا تَرَجَّلَ وَ فِيْ انْتِعَالِهٖ اِذَا انْتَعَلَ *

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করা, মাথা চিরনী করার সময় এবং যখন জুতা পরিধান করিতেন তখন জুতা পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে করা পছন্দ করিতেন। শারেহ হিন্দী বলেন যে, এই সব কার্য ডানদিক থেকে শুরু করার কারণ হইল যে, এই সব কার্য মর্যাদাসম্পন্ন কার্য।

ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সঙ্গত বা অসঙ্গত যে কোন কাজই হউক না কেন প্রত্যেকটি কাজের প্রভাব মানুষের অন্তরে পড়িয়া থাকে। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, কোন কাজ সঠিকভাবে না করিয়া বেঠিকভাবে করা হইলে ইহার প্রভাবও অন্তরে অনুরূপভাবেই পড়িবে। এই কারণেই ডান হাতে ইসতিনজা এবং নাক পরিষ্কার করা আর কোন অসুবিধা ব্যতীত বাম হাতে পানাহার করা পেরেশানী এবং অন্তর শক্ত হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ওযুর মধ্যে হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করার ভেদঃ–

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের অভিমত অনুযায়ী দিল ও কলিজার রক্ত পরিষ্কার করিতে এবং ইহাদের শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হাত ধৌত করা খুব কার্যকরী ব্যবস্থা। হাতের মধ্যে যতগুলি রগ রহিয়াছে– ইহাদের সবগুলিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে দিল ও কলিজা পর্যন্ত পৌছিয়াছে। দিল ও কলিজা তখন পরিপূর্ণ এবং সুন্দরভাবে উল্লিখিত উপকারে উপকৃত হইবে যখন হাতের সবগুলি রগ ধৌত করা হইবে।

যে রগগুলি দিল ও কলিজা পর্যন্ত পৌছিয়াছে ইহাদের কতক হাতের আঙ্গুলি হইতে কতক হাতের তালু হইতে কতক হাতের কব্জি হইতে আর কতক হাতের কনুই হইতে শুরু হইয়াছে। এইজন্যই কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত

করা নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহাতে সবগুলি রগ ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হইল যে– হাত এবং মুখমণ্ডল ধৌত করার দ্বারা দিল এবং কলিজা শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহাতে ছড়ানো বিভিন্ন রগের মাধ্যমে পানির প্রভাব মানবদেহের অভ্যন্তর ভাগে পৌঁছিয়া থাকে। এইজন্য কুরআনে করীমে বলা হইয়াছে– وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ওযুতে তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর।

অস্ত্রোপাচারে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ খুব ভালভাবেই অবগত আছেন যে, দিলের বা কলিজার বা কোন চর্ম রোগের চিকিৎসার জন্য এবং রক্ত পরিষ্কার করার জন্য যদি কখনও বাহুতে বিস্তৃত মোটা রগটি হইতে রক্ত বাহির করিতে হয় তাহা হইলে কনুইয়ের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে সিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিয়া আনা হয়। কেননা এই স্থানে এই রগটি সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু দিল এবং কলিজা ব্যতীতও দেহের সর্বাঙ্গে ইহার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা এই জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে, যাহাতে এই রগটির মাধ্যমে পানির পরিপূর্ণ প্রভাব দেহাভ্যন্তরে পৌঁছে।

২। ওযুর মধ্যে মানব–দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ধৌত করা নির্ধারণ করা হইয়াছে। আবার হাত ধৌত করিতে গিয়া কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা নির্ধারণ করা হইয়াছে। কারণ ইহা অপেক্ষা কম অংশ ধৌত করিলে ইহার প্রভাব মানব মনে কোন অনুভূতির সৃষ্টি করে না। কেননা কনুই অপেক্ষা কম অংশ অপরিপূর্ণ অঙ্গ।

ওযুর মধ্যে নাক পরিষ্কার করার হেকমত

১। প্রত্যেক ধর্মানুসারী লোকেরাই নাকের শ্লৈষ্মিক তরল পর্দাথকে নাক হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়া দেওয়াকে পছন্দ করে। যদি নাকের ভিতর হইতে ইহাকে ধৌত না করা হয় তাহা হইলে এইগুলি নাকের ভিতর শুকাইয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হইবে। ফলে মস্তিষ্কের উপর ইহার খারাপ প্রভাব পড়িবে। অনেকক্ষেত্রে মানবজীবন ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

২। অধিকন্তু আরবী পরিভাষায় নাক শব্দটি ইযযৃত সম্মানের অর্থে ব্যবহার

করা হইয়া থাকে। যখন তাহারা কাহারও জন্য বদদোয়া করে তখন বলে ارغم الله انفه। আল্লাহ তাহার নাক মাটি মিশ্রিত করুক। এই বদদোয়া দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ পাক যেন তাহাকে ইযযৃত ও সম্মানের স্থান হইতে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার স্থানে নামাইয়া আনেন। সুতরাং ওযুর মধ্যে নাক ধৌত করার দ্বারা স্বীয় অহংকার ও গর্ব পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে নিজেকে ছোট্ট করিয়া প্রকাশ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়।

ওযুর মধ্যে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করার রহস্য

১। পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত পদদ্বয় ধৌত করিবার রহস্য এই যে, অনেকগুলি রগ পা হইতে শুরু করিয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইহাদের কয়েকটি পায়ের আঙ্গুল হইতে আর কয়েকটি পায়ের গিঁঠের নীচ হইতে উপরের দিকে উঠিয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত পদদ্বয় ধৌত করিলে উল্লিখিত সকল রগগুলি পানির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া যায়। আর পানির এই প্রভাব রগের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে ফলে মস্তিষ্কের ভিতর উৎপন্ন অনিষ্টকর উত্তাপ ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। এই কারণেই পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ তোমাদের পাগুলি গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত কর।

২। যেহেতু অধিকাংশ সময় পা গিঁঠ পর্যন্ত খোলা থাকে। ফলে কষ্টদায়ক বিভিন্ন জীবাণু ইহার উপর পতিত হয়। অধিকন্তু ধূলিবালিও লাগিয়া থাকে। তাই ইহাদের ক্ষতি হইতে মুক্ত করিবার জন্য গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৩। ওযুর মধ্যে যেসব অঙ্গ ধৌত করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে ঐসব পূর্ণ অঙ্গ ধৌত করা নির্ধারণ করা হইয়াছে। গিঁঠ ব্যতীত পা অপূর্ণ অঙ্গ। তাই গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে পরিপূর্ণ অঙ্গের প্রভাব দেহের উপর পড়ে।

পায়ে মোজা না থাকা অবস্থায় ওযুর মধ্যে পা ধৌত করিবারভেদ আর মোজা পায়ে সর্বদা না রাখার রহস্য

পায়ের বাহ্যিক অবস্থার চাহিদা হইল যে, যখন পায়ের উপর মোজা না

থাকে এবং পা খালি থাকে তখন উহা ধৌত করা অপরিহার্য। কেননা খালি পায়ের উপর ধূলিবালি ও নানা প্রকার জীবাণু জমা হইতে থাকে। এই জন্য পায়ে মোজা না থাকা অবস্থায় পা ধৌত করা ফরয। ইতিপূর্বে আমরা লিখিয়াছিঃ–দেহের বিভিন্ন পার্শ্বের বিভিন্ন অঙ্গগুলি ধৌত করিবার নির্দেশ এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশের বিষাক্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া দেহের কিনারায় আসিয়া সমবেত হয়। অতঃপর এই বিষাক্ত পদার্থগুলি উত্তেজিত হইয়া বিভিন্ন মারাত্মক রোগের আকৃতিতে প্রকাশ হইতে থাকে। আর অঙ্গগুলি ধৌত করার ফলে উত্তেজক বিষাক্ত পদার্থগুলি স্বীয় ক্ষমতা হারাইয়া ধ্বংস হইয়া যায় অথবা লোমকুপের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা বাহির হইয়া আসে। কিন্তু যদি দেহের খোলা অঙ্গগুলি ধৌত না করা হয় তাহা হইলে ধুলিবালির দ্বারা এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়। আর ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ার কারণে বিষাক্ত পদার্থগুলি বাহিরে আসিতে পারে না বিধায় পুনরায় দেহাভ্যন্তরের দিকে যাইতে থাকে। ফলে ইহা বিভিন্ন প্রকার ব্যথা ও কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। তাই পায়ে মোজা না থাকা অবস্থায় পা ধৌত করা নির্ধারণ করা হইয়াছে। যাহাতে পা খোলা থাকা অবস্থায় যে সকল ধূলাবালি ও জীবাণু পায়ের উপর জমা হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া যায়।

পায়ে সর্বদা মোজা রাখার অনুমতি নাই; যাহাতে দেহাভ্যন্তর হইতে যেসব বিষাক্ত পদার্থ পায়ের চামড়ার পিছনে আসিয়া একত্রিত হয় সেগুলি পায়ে মোজা না থাকা অবস্থায় বাহির হইয়া আসিতে পারে। কিন্তু পায়ে যদি সর্বদা মোজা লাগানো থাকে তাহা হইলে পা ধৌত করা যায় না। ফলে উল্লিখিত ফায়দাও হাসিল হয় না। অর্থাৎ পায়ের চামড়ার কাছে সমবেত বিষাক্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া আসিতে পারে না। অধিকন্তু সামান্য পানি লইয়া পা মসেহ করার দ্বারাও এই ফায়দা পাওয়া যায় না। তাই বাধ্য হইয়া পা ধৌত করিতে হয় তাই মাঝে মাঝে মোজা খুলিয়া পা ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই মোজা পরিধান করিয়া থাকার সর্বাধিক সময় তিনদিন তিন রাত্র নির্ধারণ করা হইয়াছে। এমনকি সফর অবস্থায় নহে এমন ব্যক্তির জন্য একরাত্র ও একদিনের অধিক মোজা পায়ে রাখার অনুমতি নাই। যাহাতে মাঝে মাঝে পা ধৌত করা যায়।

অধিকন্তু ওযুর অঙ্গ মসেহ করার দ্বারা শুধু আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা ও তাওবা করার কথা বুঝায়। কিন্তু ধৌত করার মধ্যে তাওবা ব্যতীতও মস্তিষ্ক শক্তিশালী করা, চামড়ার উপরের অংশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং লোমকুপের মুখ পরিষ্কার করাও উদ্দেশ্য হয়। মোটকথা; যদি পা মসেহ করার হুকুমই নির্ধারিত হইত তাহা হইলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকিত।

আত্মিক পবিত্রতা সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা

অপছন্দনীয় ও খারাপ অভ্যাস এবং ভিত্তিহীন ধারণাসমূহ হইতে পবিত্র ও মুক্ত থাকার শিক্ষা প্রদান করা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা অমুলক ধারণা এবং খারাপ ও ঘৃণিত আমল ও অভ্যাস মানবজীবনকে এমনভাবে কলুষিত করিয়া দেয় যেন অপবিত্র ময়লা দ্বারা মানবদেহ নাপাক হইয়া যায়। এই জন্য ইসলাম এই সবকিছু হইতে পবিত্র ও মুক্ত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছে।

অনুরূপভাবে অবৈধ স্থানে স্বীয় প্রবৃত্তির ব্যবহারও আত্মিক লোভে লিপ্ত হওয়া এবং নিজেকে বড় মনে করা হইতে পবিত্র ও মুক্ত থাকাও আত্মিক পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। ফলে সে অন্যান্যদের কাতারে শামিল হইয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার ও অন্যান্যদের অধিকার সমান। ছোট হউক বা বড় হউক সকলের অধিকার সমান। অনুরূপভাবে কাহারও অধিকার নষ্ট না করাও আত্মিক পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক পবিত্রতার মধ্যে আত্মিক বা আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ছোট পবিত্রতা এবং বড় পবিত্রতা উভয়টি সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

হাতের পবিত্রতা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ মোতাবেক "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।" সুতরাং পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্য এবং পবিত্রতা কি কি চাহিদা করিতেছে– এইসব কিছু অনুধাবন করিয়া পবিত্রতার মর্যাদার হক আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। অতএব হাত দ্বারা কোন অবৈধ জিনিস ধরা বা কোন অবৈধ জিনিস হাতে লওয়া থেকে সর্বদা পবিত্র ও মুক্ত থাকিতে হইবে। কারণ ইহার দ্বারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা হয়। অনুরূপ হাত

দ্বারা না–হকভাবে কাহাকেও মারা যাইবে না কাহারও সম্পদ গোপন করা যাইবে না। আবার কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি করার জন্য হাত বাড়ানো যাইবে না। এক হাদীছে এইদিকে ইঙ্গিতও রহিয়াছে।

اَلْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَ يَدِهٖ *

ঐ ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুসলমান যাহার মুখ ও হাত হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ রহিয়াছে।

মুখের পবিত্রতা

মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য যখন মুখে পানি প্রবিষ্ট করে তখন হারাম বস্তু আহার করা এবং মুখ দিয়া হারাম কথা বাহির করা হইতে পবিত্র থাকার কথাটি যেন খেয়ালে থাকে। অর্থাৎ এমন বস্তু না খাওয়ার জন্য এবং এমন কথা মুখ থেকে বাহির না করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়, যাহা দ্বারা মুখ রূহানী অপবিত্রতায় ময়লাযুক্ত হইয়া লানত পাওয়ার যোগ্য হইয়া যায় বরং এমন কথা বলার জন্য আর এমন খাদ্য আহার করার জন্য প্রস্তুত থাকে যাহা দ্বারা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সওয়াব লাভ হয় এবং ফিরিশতাদের কাছে প্রশংসা যোগ্য হয়।

নাকের পবিত্রতা

নাক পবিত্র করিবার জন্য যখন নাকে পানি প্রবিষ্ট করে তখন যেন উত্তম ও ভাল জিনিসের সুগন্ধ লওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। আর খারাপ জিনিসের দুর্গন্ধ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দেয়। নাক পবিত্র করার সময় কলুষ থেকে এবং নিজেকে বড় মনে করা থেকে পবিত্র থাকার প্রতি সতর্ক খেয়াল রাখে। কেননা দোষ করা ও নিজকে বড় মনে করা মানুষের মধ্যে উচ্চমর্যাদা লাভের এবং অহংকারের চাহিদা জন্ম দেয়। আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতার ধারণা ও উপাদান সৃষ্টি করে।

চেহারায় পবিত্রতা

মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার আশা আকাঙ্খা হইতে এবং অন্যের সাথে অন্তর লাগানো হইতে

ফিরিয়া থাকিবে এবং যে আমলের রূখ আল্লাহর দিকে নয় এমন আমল বন্ধ করিয়া দিবে। স্বীয় মুখমণ্ডলের উপর লজ্জা শরমের পানি প্রবাহিত করিবে এবং লজ্জাহীনতা ও বেহায়ায়ীর দ্বারা আল্লাহ পাকও মানুষের সম্মুখ হইতে লজ্জা শরমের পর্দা উঠাইয়া দিবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে ইয্যত সম্মান ব্যয় করিবে না।

গ্রীবাদেশের পবিত্রতা

গ্রীবাদেশ মসেহ করিবার সময় লোভ লালসা, নফসের খাহেশাত হইতে স্বীয় গ্রীবাদেশ মুক্ত করার জন্য আল্লাহ পাকের ফরমাবরদারী ও আনুগত্যের হক আদায় করার জন্য এবং ধৃষ্টতা ও দম্ভ করার চিন্তা বর্জন করার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়া পড়িবে, যাহাতে এই সব জিনিসের আবেষ্টনী হইতে স্বীয় গ্রীবাদেশ মুক্ত করিতে পারে। কারণ আল্লাহ পাকের দরবারে নিজকে হাযির করার পথে এইসব জিনিস প্রতিবন্ধক।

পিঠের পবিত্রতা

পিঠ ধৌত করিবার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি নির্ভর করা হইতে এবং হকবাদী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির গীবত করা হইতে বিরত থাকাকে মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবে।

বক্ষদেশের পবিত্রতা

বক্ষদেশ ধৌত করার সময় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাহাদিগকে প্রতারণা ও ধোকা দেওয়ার মনোভাব বর্জন করিবে।

পেটের পবিত্রতা

পেট ধৌত করার সময় হারাম এবং সন্দেহযুক্ত পানাহার থেকে পেট মুক্ত রাখাকে মুল লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবে আর এই ধরণের অপবিত্র জিনিস হইতে পেট পাক রাখিবে।

লজ্জাস্থান ও উরুর পবিত্রতা

লজ্জাস্থান ও উরু ধৌত করার সময় সর্ব প্রকার নিষিদ্ধ বিষয়ের জন্য উঠাবসা করা হইতে নিজকে দূরে রাখিবে।

পায়ের পবিত্রতা

পা ধৌত করার সময় লোভ–লালসা ও কুপ্রবৃত্তির দিকে চলা থেকে এবং যেসব জিনিস দ্বীন এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য ক্ষতিকর এমন জিনিসের দিকে চলা থেকে স্বীয় পদদ্বয়কে দূরে রাখিবে। কবি বলেন–

خدا را براں بندہ بخشا ئشے است + کہ خلق از وجودش در آسا ئشے است

আল্লাহ পাকের খাছ বখশিশ ঐ বান্দার উপর রহিয়াছে, যাহার বর্তমানে আল্লাহর সৃষ্টি আরামে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ /তায়াম্মুম

তায়াম্মুমকে ওযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত করার রহস্য

বান্দার জন্য কোন আমল কঠিন হইয়া পড়িলে তাহা সোজা ও সহজ করিয়া দেওয়া আল্লাহ পাকের নীতি। সহজ করার উত্তম পন্থা হইল যে, আমলটি বান্দার জন্য কষ্টকর তাহা উঠাইয়া দিয়া উহার স্থানে অন্য একটি আমল স্থলাভিষিক্ত করিয়া দেওয়া, যাহাতে বান্দার অন্তর অস্থির না হইয়া পড়ে। কারণ সে যে আমলটি খুব গুরুত্ব সহকারে করিতেছিল তাহা হঠাৎ করিয়া বর্জণ করার দ্বারা তাহার অন্তর অস্থির হইয়া পড়িবে। তবে যদি ইহার স্থলাভিষিক্ত কোন আমল থাকে তাহা হইলে এই অবস্থা পয়দা হইবে না।

সুতরাং ওযু ও গোসল করা কষ্টকর হইয়া পড়িলে ইহাদের স্থলাভিষিক্ত কোন আমল না থাকিলে বান্দার মধ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইবে। আর পবিত্রতা বর্জর করার অভ্যাসী হইয়া যাইবে। এইসব দিক বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনের সময় তায়াম্মুমকে ওযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করা হইয়াছে।

নোটঃ

উল্লিখিত বিভিন্ন অঙ্গের পবিত্রতা অর্জনের সময় যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার বা যেসব জিনিস করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এইসব অঙ্গের পবিত্রতা অর্জনের দ্বারা এইসব বিষয় বা জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করা হইতেছে।

মোটকথা, পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার সাথে তায়াম্মুমের সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া তায়াম্মুমকেও এক প্রকার পবিত্রতা হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম আর গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের মধ্যে পার্থক্য না থাকার কারণ

এই সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রঃ) লিখিয়াছেন শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তি আর বেওযু ব্যক্তির তায়াম্মুম এক ধরণের হওয়ার পিছনে যে কারণ রহিয়াছে তাহা হইল এই যে, বেওযু ব্যক্তি তায়াম্মুমের জন্য হাত ও মুখ মসেহ করে। এই দুই অঙ্গ মসেহ করিবার পর অপর দুই অঙ্গের মসেহ করার নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তি উল্লিখিত অঙ্গদ্বয় মসেহ করিবার পর তাহার অবশিষ্ট দেহ মসেহ করা রহিত হইয়া যাওয়া আরও অধিক যুক্তিপূর্ণ। কেননা গোসলের পরিবর্তে সমুদয় দেহ মসেহ করা তাহার জন্য আরও কষ্টকর বিষয়। আর তায়াম্মুম বৈধ করা হইয়াছে মানুষকে কষ্ট ও অসুবিধা হইতে রেহাই দেওয়ার জন্য। সুতরাং পূর্ণ দেহ মসেহ করা তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাই ইহাতে অধিক সহজতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বেওযু ব্যক্তির জন্য যে যে অঙ্গ মসেহ করিলে পবিত্রতা অর্জিত হয় শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তির পবিত্রতার জন্যও ঐ সকল মসেহ করাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু এই ব্যক্তির পূর্ণ দেহ মাটি মিশ্রিত করার ফলে সৃষ্টির সেরা মানুষ ধূলি বালি মিশ্রিত হওয়ার দিক দিয়া পশুর সাথে তুল্য হইয়া যায়।

মোটকথা, শরীয়ত যে আমলটি যেভাবে নির্ধারণ করিয়াছে সৌন্দর্য্য, শ্রী এবং ইনসাফের দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না।

তায়াম্মুমের জন্য শুধু মাটি নির্ধারণ করা হইয়াছে কেন?

এই প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ "এলামুল মুকীনীন আন রাব্বিল আলামীনে" যে সকল উত্তর প্রদান করিয়াছেন উহার সারকথা এখানে লিখিয়া দেওয়া হইল।

প্রশ্নঃ–একদিক দিয়া দেখিলে তায়াম্মুম বিবেক পরিপন্থী। কেননা মাটি দ্বারা দেহ অপরিচ্ছন্ন হয়। ইহা ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করিতে পারে না এবং দেহ ও কাপড় পবিত্র করিতে পারে না।

উত্তরঃ– আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস পানি ও মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের শরীয়তেরও এই দুই মৌলিক বস্তু হিসাবে গণ্য। এই বস্তদ্বয়ের সাহায্যেই আমাদের লালন–পালন হয়। ইহাদের দ্বারাই আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, আমাদের দেহে শক্তি অর্জনের ব্যবস্থা হয়। আর প্রতিনিয়ত আমরা এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যেহেতু আল্লাহ পাক পানি মাটিকে আমাদের লালন–পালন, পানাহার এবং আমাদের দেহে শক্তি অর্জনের মাধ্যম নির্ধারণ করিয়াছেন, তাই এই বস্তুদ্বয়কে আমাদের পাক পবিত্রতা অর্জনের এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণেরও মাধ্যম নির্ধারিত করিয়াছেন। কারণ আমাদের জীবনের উপর মাটি ও পানির বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। কেননা মাটিই ঐ মৌলিক বস্তু যাহা দ্বারা বনী আদমের দেহ সৃষ্টি হয়। আর পানি প্রত্যেক জিনিসের জীবনের উপায়।

সারকথা– বিশ্ব নিখিলের সমস্ত কিছুর মৌলিক উপাদান মাটি আর পানি। এই দুইটি বস্তু দ্বারা আল্লাহ পাক সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু আমার সৃজন, দেহে শক্তির সঞ্চার এবং লালন–পালন মাটি এবং পানি দ্বারা হইয়াছে আর হইতেছে, তাই দৈহিক এবং রূহানী পবিত্রতার জন্যও এই দুই বস্তুকেই নির্ধারণ করা হইয়াছে।

অপবিত্রতা ও ময়লা দূর করিবার জন্য সাধারণভাবে পানির ব্যবহারই সর্বাধিক। আর অসুস্থতার অবস্থায় এবং পানি না থাকা অবস্থায় অসুবিধা দেখা দিলে পানির সাথী মাটিকে পানির স্থলাভিষিক্ত করাই সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ।

২। তায়াম্মুমের জন্য ভূপৃষ্ঠ এই জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ সর্বস্থানে সর্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এই জিনিসই মানুষের অসুবিধা দূর করিবার যোগ্যতা রাখে।

৩। মুখমণ্ডল মাটি মিশ্রিত করা বিনয়, নম্রতা, বশ্যতা ও অসামর্থ্যের দলীল। বান্দার এই অবস্থা আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। সুতরাং তায়াম্মুম করিতে

গিয়া মাটি ব্যবহার করার মধ্যে বান্দার বিনয়, বশ্যতা ও অসামর্থ্যের প্রকাশ হয়। আর বান্দার মধ্যে এই অবস্থা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য খুব উপযোগী। এই জন্যই সিজদা করার সময় নামাযীর মুখ মাটি হইতে পৃথক না রাখা খুব পছন্দনীয় ও মুস্তাহাব কাজ।

তায়াম্মুমে মাত্র দুই অঙ্গ মসেহ করিবার কারণ এবং মাথা ও পায়ের উপর মসেহ বৈধ না হওয়ার ভেদঃ–

১। তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল এবং হাত এই দুই অঙ্গ মসেহ করার জন্য খাছ হওয়ার আর মাথা এবং পায়ে মসেহ বৈধ না হওয়ার কারণ, মাথার উপর মাটি রাখা অপছন্দনীয় ও খারাপ বিষয় বলিয়া গণ্য। কেননা বিপাদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সময় মাথার উপর মাটি লাগানো সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এই সবদিকে দৃষ্টি রাখিয়া তায়াম্মুমে মাথা মসেহ করা বৈধ করা হয় নাই। কারণ মাথার মধ্যে মাটি লাগানো আল্লাহর নিকট খারাপ ও অপছন্দনীয়। অনুরূপভাবে মানুষের কাছেও। তায়াম্মুম করার সময় পায়ের উপর মসেহ করার হুকুম দেওয়া হয় নাই। কারণ পায়ের উপর এমনিতেই ধূলিবালি পড়িয়া থাকে। সুতরাং এখনও যদি আবার পায়ের উপর মাটি দ্বারা মসেহ করিবার হুকুম দেওয়া হয়, তাহা হইলে তায়াম্মুমকারীর জন্য নতুন কিছু হইল না। আর নতুন কিছু না হইলে সে এই দিকে সতর্কও হইবে না। কেননা হুকুম দেওয়ার বিধান হইল যে, এমন জিনিসের হুকুম দেওয়া যাহা পূর্বে বিদ্যমান না থাকে। তাহা হইলে সে ইহা আমল করাতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিবে। উল্লিখিত কারণটি আল্লামা ইবনে কাইয়েম জওযী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

২। অযুর অঙ্গ চারটি। তন্মধ্যে দুইটি অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় সর্বাবস্থায় ধৌত করিতে হয়। অপর দুইটি অঙ্গ এইরূপ নহে। মাথা তো কখনও ধৌত করিতে হয় না; বরং সর্বাবস্থায় মসেহ করিতে হয়। আর পা কখনও ধৌত করিতে হয় আবার কখনও মসেহ করিতে হয়। পায়ে মোজা থাকা অবস্থায় পা মসেহ করিতে হয়। সুতরাং যে দুই অঙ্গ সর্বদা ধৌত করিতে হয় তাহা মসেহ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর যে দুই অঙ্গে মসেহ করা যায় তাহা তায়াম্মুমে মসেহ করার হুকুম হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বিষয়টি সহজতর হয়। সুতরাং যে অঙ্গ ধৌত করা হয় উহাতে সাবলীলতা সৃষ্টি করার

জন্য যখন উহা মসেহ করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে তখন যে অঙ্গ মসেহ করিতে হয় উহাতে মসেহ করার হুকুম না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় যদি অবশিষ্ট এই অঙ্গেও মসেহ করার হুকুম জারী করা হয় তাহা হইলে সাবলীলতা সৃষ্টির হেকমত বিদ্যমান থাকে না। আর এই হেকমত বিদ্যমান না থাকা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ / গোসল

ঋতুমতী এবং শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ নিষেধ হওয়ার কারণ

ঋতুমতী ও শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তির মসজিদের ভিতরে যাওয়া বৈধ নহে। কারণ মসজিদ নামায পড়ার ও আল্লাহর যিকির করার স্থান। অধিকন্তু ইহা যমীনে আল্লাহর একটি নিদর্শন। কাবা শরীফের নমুনা। এইজন্য এই প্রকারের অপবিত্র অবস্থায় ইহার ভিতর প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। কুরআনে পাকে আসিয়াছে–

وَ مَن يُّعَظم شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ *

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শণগুলোকে সম্মান করে। সুতরাং ইহা অন্তরের তাকওয়া।

যে ঘরে কুকুর বা শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তি বা ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা না আসার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন–

لَا يَدْخُلُ الْمَلَآئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَ لَا كَلْبٌ وَ لَا جُنُبٌ *

ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে ছবি, কুকুর এবং শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তি থাকে।

ফিরিশতা এইসবকে ঘৃণা করে। ফিরিশতা পবিত্র হয়। বাহ্যিক ও আত্মিক

অপবিত্রতা যেমন, প্রতিমা পূজা এবং ইহার সূচনা যেমন, প্রাণীর ছবি প্রভৃতির প্রতি ফিরিশতার ঘৃণা থাকে। আর উভয় প্রকার অপবিত্রতা এবং প্রাণীর ছবি এই সবকিছু ফিরিশতার গুণের পরিপন্থী। সুতরাং ইহাদের ঘরে থাকা অবস্থায় ফিরিশতা ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ পরস্পর বিপরীত দুইটি জিনিস একত্রিত হইতে পারে না।

কাফের মুসলমান হওয়ার সময় গোসল করার কারণ

এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন। অন্য এক নও মুসলিমকে বলিলেন, তোমার উপর হইতে কুফুরীর নিদর্শন দূরীভূত কর। অর্থাৎ মাথা মুণ্ডাইয়া ফেল। ইহাতে রহস্য হইল, এই ব্যক্তি একটি মন্দ জিনিস হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইহা যাহাতে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশিত হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহাকে গোসল করানের দ্বারা সতর্ক করা হইতেছে যে, এই ব্যক্তি যেভাবে তাহার দেহের বাহ্যিক অংশ ধৌত করিয়াছে অনুরূপভাবে যেন তাহার ভিতরকেও সর্বপ্রকার বাতিল আকিদা হইতে ধৌত করিয়া ফেলে।

ঋতুস্রাব হইতে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করা ওয়াজিব কেন?

নারীদের ঋতুকালে নির্গত রক্তকে আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে নাপাক বলিয়াছেন। সুতরাং যে নাপাক জিনিস বার বার দেহের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় উহা দ্বারা দেহমনও নাপাক হইয়া যায়। অধিকন্তু রক্ত নির্গত হওয়ার কারণে ছোট ছোট শিরা উপশিরা ও ধমনীগুলি দুর্বল হইতে থাকে। গোসল করার দ্বারা এই নারীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জিত হইয়া থাকে। আর তাহার দুর্বল শিরা উপশিরা ও ধমনীগুলি তাজা ও সতেজ হইতে থাকে। এইভাবে তাহার দেহে পূর্বশক্তি ফিরিয়া আসে। এই অপবিত্রতার কারণেই আল্লাহ পাক ঋতুমতী নারী সম্পর্কে কুরআনে পাকে বলিয়াছেনঃ

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ *

ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে তোমরা নারীদের থেকে পৃথক থাক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পবিত্র না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কাছেও যাইও না। অর্থাৎ সহবাস করিও না।

শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তি এবং ঋতুমতী নারীর জন্য কুরআনে করীম তিলাওয়াত করা এবং নামায পড়া জায়েয না হওয়ার কারণ

শুক্রক্ষরণের ফলে অপবিত্রতা ও ঋতুস্রাব এমন দুইটি অবস্থা যাহা আল্লাহর নৈকট্যের পথে বাধা স্বরূপ। আর ইহারা নাপাকী মিশ্রিত অবস্থা। পক্ষান্তরে নামায পড়া ও কুরআন তিলাওয়াত করা আল্লাহর সাথে কথোপকথন করা। আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মর্যাদা মানুষ তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে সর্বপ্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়। কেননা আল্লাহ পাক পবিত্র। তিনি অপবিত্রতাকে ঘৃণা করেন।

বীর্য স্খলনের ফলে গোসল করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ আর পায়খানা প্রস্রাবের পর গোসল ওয়াজিব না হওয়ার ভেদ

১। বীর্য স্খলনের পর গোসল অপরিহার্য হওয়া আর পায়খানা প্রস্রাবের পর অপরিহার্য না হওয়া ইসলামী শরীয়তের সৌন্দর্যের দলীল এবং আল্লাহ পাকের রহমত ও হেকমত। কেননা বীর্য দেহের প্রত্যেকটি অংশ হইতে বাহির হইয়া আসে। কুরআনে পাকে বীর্যকে 'সুলালা' বলা হইয়াছে। যেমন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ *

"আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

সুরাহ নামক অভিধানে "সুলালা" শব্দের অর্থ লিখা হইয়াছে যে, কোন এক বস্তু হইতে (সারপদার্থ হিসাবে) যাহা বাহির হইয়া আসে এবং পুরুষের পিঠের তরল পদার্থ। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বীর্য দেহের সমুদয় অংশের নির্যাস যাহা দেহ হইতে রওয়ানা হইয়া শেষ পর্যন্ত পীঠের রাস্তা দিয়া নীচে নামিয়া আসে এবং পুরুষাঙ্গের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহা নির্গত হওয়ার ফলে দেহ খুব দুর্বল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে পায়খানা প্রস্রাব খাদ্যের অসার অতিরিক্ত পদার্থ। ইহা পাকস্থলীর বৃহদান্ত্র ও মুত্রাশয়ে জমা হয়। বীর্য নির্গত হওয়ার ফলে দেহে যে দুর্বলতা দেখা দেয়, পায়খানা প্রস্রাব নির্গত হওয়ার ফলে তদাপেক্ষা অনেক কম দুর্বলতা দেখা দেয়। তাই বীর্য নির্গত

হওয়ার দুর্বলতাকে দূর করার জন্য সর্বাঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর পায়খানা প্রস্রাব নির্গত হওয়ার দুর্বলতা নগণ্য বলিয়া সমস্ত অঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই।

২। বীর্য স্খলনের ফলে দেহে অবসন্নতা, ক্লান্তি, দুর্বলতা এবং অক্ষমতা দেখা দেয়। আর গোসল করার দ্বারা অন্তরে শক্তি, প্রশান্তি উৎফুল্লতার সঞ্চার হয়। আর দেহের অবসন্নতা দূর হইয়া সতেজতা পয়দা হয়। তাই হযরত আবু যর (রাঃ) বলিয়াছেন, "বীর্য স্খলনের পর গোসল করার পরে মনে হয় যে, যেন মাথার উপর হইতে একটি পাহাড় সরিয়া গিয়াছে। নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট প্রতিটি মানুষ তাহার এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে।

বীর্যক্ষরণের ফলে অপবিত্রতার কারণে মানুষ পবিত্র আত্মাসমূহ অর্থাৎ ফিরিশতাদের থেকে দূরে সরিয়া পড়ে। আর গোসল করিয়া লওয়ার পর এই দুরত্ব হ্রাস পাইয়া নৈকট্য অর্জিত হইতে থাকে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম হইতে বর্ণিত আছে যে, 'মানুষ ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার আত্মা আকাশের দিকে আরোহণ করিতে থাকে। যদি সে পবিত্র হয় তাহা হইলে তাহার আত্মা সিজদা করার অনুমতি পায়। আর যদি বীর্যক্ষরণের ফলে অপবিত্র হয় তাহা হইলে তাহার আত্মা সিজদা করার অনুমতি পায় না। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "বীর্যক্ষরণের ফলে অপবিত্র ব্যক্তি নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে যেন ওযু করিয়া লয়।"

৪। সহবাস শেষ করার পর মানুষ তাহার অন্তরে এক প্রকার সংকীর্ণতা ও সংকোচ অনুভব করে। ফলে তাহার মধ্যে সংকীর্ণতা ও বিষণ্নতার ভাব পয়দা হয়। নিজেকে সংকোচিত ও লজ্জিত পাইতে থাকে। এই উভয় প্রকার অপবিত্রতা দূর করিবার জন্য সে স্বীয় দেহ মলিয়া মলিয়া গোসল করিতে থাকে। গোসল সমাপ্ত করিয়া ভাল ভাল পবিত্র কাপড় পরিধান করে। সুগন্ধি ব্যবহার করে। তখন তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া যায়। ফলে তাহার মনে আনন্দ ও খুশী অনুভূত হয়। প্রথম অবস্থাকে "হদছ" (অপবিত্রতা) আর দ্বিতীয় অবস্থাকে পবিত্রতা বলা হয়।

৫। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ লিখিয়াছেন যে, সহবাসের পর গোসল করিলে দেহের ক্ষয়িত শক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে। এই গোসল তাহার দেহ ও রূহের

জন্য খুব উপকারী ও লাভজনক হয়। অপবিত্র অবস্থায় থাকা আর গোসল না করা দেহ ও আত্মার জন্য বড়ই ক্ষতিকারক। বিশুদ্ধ বিবেক ও নির্মল স্বভাব ইহার উপযুক্ত সাক্ষী। পক্ষান্তরে পায়খানা প্রস্রাব নির্গত হওয়ার কারণে যদি শরীয়তের পক্ষ হইতে গোসল করা অপরিহার্য করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে মানুষ খুব অসুবিধায় পড়িয়া যাইত এবং তাহাদের খুব কষ্ট ভোগ করিতে হইত, যাহা আল্লাহ পাকের হেকমত ও রহমতের পরিপন্থী হইত।

৬। সহবাসের মধ্যে আনন্দ ও উৎফুল্লতা উপভোগ হয়। আন্তরিক স্বাধ অনুভূত হয় ফলে আল্লাহর স্মরণে অসতর্কতা সৃষ্টি হয়। আর ইহার ক্ষতিপূরণের জন্য গোসল করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭। বীর্য স্খলনের ফলে দেহের প্রায় সকল লোমকুপের মুখ খুলিয়া যায়। এই জন্যই সহবাসের সময় কখনও কখনও ঘর্ম নির্গত হইয়া থাকে। আর এই ঘর্মের সাথে দেহাভ্যন্তর হইতে অপবিত্র ময়লা যুক্ত বিষাক্ত উপাদানও বাহিরের দিকে আসিতে থাকে। অবশেষে লোম কুপের পার্শ্বে আসিয়া জমা হয়। যদি তখন দেহ ধৌত না করা হয় তখন মারাত্মক রোগ পয়দা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পানির প্রভাবে এইসব বিষাক্ত উপাদান ধ্বংস হইয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ওযু ও তায়াম্মুম নষ্ট করিয়া দেয় এমন বিষয়সমূহ

পায়খানা, পেশাব এবং বায়ু নির্গত হওয়ার পর ওযু করার নির্দেশ কেন?

পায়খানা ও পেশাব ও বায়ু নির্গত হওয়ার দ্বারা যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় উহার কারণে মানবের অভ্যন্তরে এক প্রকারের অপবিত্রতা, শুষ্কতা এবং দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ ফিরিশতাদের থেকে দূরে সরিয়া পড়ে। শয়তান ও জ্বীনেরা তাহাকে ঘিরিয়া লয়। এই কারণে পায়খানা, পেশাব ও বায়ু নির্গত হওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ *

হে আল্লাহ! আমি নরনারী জ্বীন ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর পেশাব পায়খানা ও বায়ু নির্গত হওয়ার পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে غفرانك আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অতঃপর ওযু করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে ওযু করার দ্বারা অপবিত্রতা, শুষ্কতা এবং দুর্বলতা দূরীভূত হইয়া যায়। ফিরিশতাদের নৈকট্য আর শয়তান ও জ্বীনদের থেকে দুরত্ব অর্জিত হয়।

পায়খানা পেশাব ও সহবাস করার সময় কাবা শরীফের দিকে মুখ দিয়া বসা বা উহার দিকে পিঠ দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত।

১। কাবাঘর আল্লাহ পাকের নিদর্শন গুলির অন্যতম। কাবাঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নামান্তর। ইহার সম্মান প্রদর্শনে ঘাটতি করা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে গাটতি করা। এই জন্যই কাবা ঘরের হজ্ব করা ফরয করা হইয়াছে। ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে ইহা পরিষ্কার করা ও পবিত্র করা ব্যতীত ইহা তাওয়াফ করিবে না। নামায পড়ার সময় ইহার সামনে খাঁড়া হইবে। মানবিক প্রয়োজনে অর্থাৎ পায়খানা, পেশাব ও সহবাসের সময় ইহাকে সামনে রাখিবে না। আবার ইহার প্রতি পীঠও দিবে না। কারণ এইরূপ করা বেয়াদবীর অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া বেয়াদবী করে তাহার অন্তর শক্ত হইয়া যায়। আর তাহার শক্ত অন্তরের প্রভাব তাহার সাথে সম্পর্কিত লোকদের মধ্যে পড়িতে থাকে। কবি বলেন–

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد + بلکہ آتش درہمہ آفاق زد

বেআদব ব্যক্তি শুধু নিজেকেই খারাপ করিয়া রাখে না বরং সারা দুনিয়ার কোণায় কোণায় ইহার আগুন লাগাইয়া দেয়।

কুরআনে পাকে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَ مَنْ يُعَظِّم شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ *

আল্লাহ পাকের নিদর্শনগুলির প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করা এমন সব লোকের কাজ যাহাদের অন্তরে তাকওয়া রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন

إِذَا اَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُوْهَا

যখন তোমরা পায়খানায় আস তখন কেবলার দিকে মুখ করিও না এবং ইহার দিকে পীঠও দিও না।

২। অন্তরে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বিদ্যমান থাকা একটি আভ্যন্তরীন ও অদৃশ্য বিষয়। ইহার বাহ্যিক প্রকাশের জন্য বাহিরেও একটি নিদর্শন থাকা প্রয়োজন যাহা এই আন্তরিক অবস্থার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। নামাযের মধ্যে কাবাঘরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ানোকে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহর স্মরণে একাগ্রতার বাহ্যিক নিদর্শন হিসাবে ইহার স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য এই আকৃতিই ধারণ করা নির্দিষ্ট। ইহার বিপরীত হইলে সম্মান প্রদর্শনের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। আর পায়খানা প্রস্রাবের অবস্থা নামাযের অবস্থার সম্পুর্ণ বিপরীত। নামাযে কাবার দিকে মুখ করিতে হয়। সুতরাং পায়খানা প্রস্রাবের সময় কাবার দিকে মুখ না করা উচিত। অধিকন্তু কাবার দিকে পীঠও না দেওয়া চাই। কারণ কাবার দিকে পীঠ দেওয়া বেয়াদবী।

নিদ্রার দ্বারা ওযু ভঙ্গ হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন

اَلعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّتْهِ فَاِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ *

চক্ষুদ্বয় গুহ্যদ্বারের কর্ক। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি শুইয়া পড়ে তখন তাহার গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া পড়ে।

তখন ভিতর থেকে বায়ু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া যায়।

পায়খানায় যাওয়ার সময় এবং পায়খানা হইতে বাহির হওয়ার সময় اَعُوْذُ এবং غُفْرَانَكَ পড়ার ভেদ

পায়খানায় যাওয়ার সময় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ দোয়া পড়া মুস্তাহাব। কেননা পায়খানার স্থানে শয়তান সমবেত থাকে। কারণ নাপাক জিনিস শয়তানের অতি প্রিয়। সুতরাং শয়তানের অনিষ্টতা হইতে হেফাজত থাকার জন্য এই দোয়া পড়িতে হয়।

পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসার সময় غفرانك পড়িতে হয়। কেননা পায়খানা করিবার সময় আল্লাহর যিকির ছাড়িয়া দিতে হয়। অধিকন্তু ইহা শয়তানের সংশ্রব লাভের সময়। সুতরাং পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাই সঙ্গত।

ইস্তিঞ্জা করার সময় তিন কুলুখ ব্যবহার করা নির্দেশের কারণ গোবর ও হাঁড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষিদ্ধ হওয়ার ভেদ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ اعلمكم اِذَا اَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَ اَمَرَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَ نَهٰى عَنِ الرَّوْثَةِ وَ الرِّمَةِ وَ نَهٰى اَنْ يَسْتَطِيْبَ الرجل بِيَمِيْنِهٖ *

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন আমি তোমাদের জন্য পিতার মর্যাদায় আছি। আমি তোমাদিগকে আদব শিক্ষাদান করিব। তোমরা পায়খানায় গিয়া কেবলার দিকে মুখ করিয়া বসিও না আবার কেবলার দিকে পৃষ্ঠ ও প্রদর্শন করিও না। তিনি আমাদিগকে তিনটি কুলুখ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়াছেন। গোবর, হাঁড় এবং ডান হাতের দ্বারা শৌচকার্য করা নিষেধ করিয়াছেন।

পায়খানা প্রস্রাব করার সময় কাবাঘরের দিকে মুখ করিয়া বসা এবং ইহার দিকে পীঠ দিয়া বসা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন হাদীছের অবশিষ্টাংশের আলোচনা করা হইতেছে।

১। ইস্তিঞ্জা করার জন্য তিন কুলুখ নির্ধারণ করা হইয়াছে। কারণ মলদ্বার পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার্য্য কুলুখের একটি সীমা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যথায় সন্দিহান ব্যক্তি শৌচকার্য করায় সারাদিন ব্যয় করিয়া ফেলিবে। তুবও তাহার সন্দেহ দূর হইবে না। এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে শক্ত তাকীদ করা সত্ত্বেও কোন কোন সন্দিহান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শৌচকার্য করিতে কুলুখের স্তুপের সৃষ্টি করিয়া ফেলে। মটকাভর্তি পানি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে তিনাপেক্ষা কম সংখ্যক কুলুখের দ্বারা ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জিত হয় না। কিন্তু তিনটি কুলুখের দ্বারা স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। অধিকন্তু তিনের অধিক কুলূখ ব্যবহার করাতে সময়ের অপচয় হয় এবং সন্দেহের রোগে পতিত হইতে সাহায্য করা হয়।

গোবর এবং হাঁড়ের দ্বারা শৌচকার্য করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ অধিকাংশ সময় ইহাদের মধ্যে কষ্টদায়ক জন্তু যেমন– সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি এবং এক ধরনের কাটাওয়ালা পোকা বসিয়া থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহ ও স্নেহবশতঃ স্বীয় উম্মতকে ইহাদের দ্বারা শৌচকার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহাতে উম্মতের কোন ব্যক্তি ইহাদের দ্বারা শৌচকার্য করিয়া কষ্টদায়ক পোকামাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গোবর ও হাঁড়ের মধ্যে এই সকল কষ্টদায়ক পোকামাকড় বসিয়া থাকার কারণ হইল যে, প্রকৃতপক্ষে এইসব পোকামাকড়ের জন্মই হয় গোবর ও হাড়ে। অধিকন্তু এই দুই বস্তুতে ইহাদের খোরাকও রহিয়াছে। আর এখানেই ইহারা লালিত পালিত হয়। গোবর ও হাড়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর ইহারা মাথা গুজিয়া থাকে। ইহা প্রাণীর সাধারণ অভ্যাস যে, কোন প্রাণী যেখানে জন্ম লাভ করে সেখানে যদি ইহার খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে বাহিরে না গিয়া সেখানেই বসবাস করিতে শুরু করে। এইদিকে খেয়াল রাখিয়াই এই বস্তুদ্বয় দ্বারা শৌচকার্য করা নিষেধ করা হইয়াছে।

২। গোবর ও হাড়ের দ্বারা শৌচকার্য করিলে মারাত্মক রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা ইহাতে বিষাক্ত পোকামাকড় থাকে। আর পোকামাকড় না থাকিলেও কমপক্ষে দুষিত বায়ুর বিষাক্ত ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব সর্বদা ইহার মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান থাকে।

এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহ ও দয়াবশতঃ স্বীয় উম্মতকে গোবর এবং হাড়ের দ্বারা শৌচকার্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা এইসব ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এই সম্পর্কে আরও এক হেকমত বর্ণনা করা হইয়াছে যে– إِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ অর্থাৎ ইহা তোমাদের ভ্রাতা জ্বীনের খোরাক। ইহা ব্যতীত গোবর সম্পর্কে আরও এক হেকমত বর্ণনা করা হইয়াছে যে, গোবর নিজেই নাপাক। সুতরাং ইহা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন অসম্ভব।

উচ্চ হাসি, বমি এবং নাক দিয়া রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর ওযু করার কারণ

প্রবাহিত রক্ত এবং মাত্রাধিক বমির দ্বারা দেহ অপরিচ্ছন্ন ও ময়লাযুক্ত হইয়া যায়। অধিকন্তু ইহাদের দ্বারা মনও অপবিত্র হইয়া যায়। নামাযের মধ্যে থাকা অবস্থায় উচ্চস্বরে হাসি দেওয়া এক প্রকার অপরাধ। এই অপরাধের কাফ্ফারা থাকা উচিত। এইসব অসুবিধা দেখা দেওয়ার পর যদি শরীয়ত প্রবর্তক পুনরায় ওযু করিবার নির্দেশ প্রদান করেন তাহা হইলে ইহাতে অবাক হওয়ার কিছুই নাই।

নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসি দেওয়া অপরাধ কেন? ইহার জবাব হইল এই যে, নামাযে থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি এমনিতেই হাসি দেয় না। বরং মন নামাযের ধ্যান হইতে ফিরিয়া অপবিত্র হইয়া যাওয়ার পরেই উচ্চস্বরে হাসি দিয়া থাকে। মনে এই অপবিত্রতা দূরীভূত করিবার জন্য ওযু করা অপরিহার্য।

পায়খানা পেশাব করার প্রয়োজন হইলে উহা না সারিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

১। মানুষ যখন অন্যান্য কার্য হইতে অবসর হয়, ওযু তখন তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করে। আর সে তখনই অবসর হয় যখন তাহার পেটের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা–ফুলা প্রভৃতির কারণে সৃষ্ট উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ মুক্ত হইয়া শান্ত হয়। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

لَا يُصَلِّيْ اَحَدُكُمْ وَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ *

তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযে খাড়া হইবে না, যখন তাহার পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হয়। এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করিতেছেন যে, মন অন্যদিকে মনোনিবেশ করার মধ্যেও অপবিত্রতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ পায়খানা পেশাবের প্রয়োজন হইলে মন নামাযের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে না বরং পায়খানা পেশাব নিয়ন্ত্রণ করার দিকে মনোনিবেশ করিয়া থাকে। আর নামায থেকে মন ফিরিয়া অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মনের অপবিত্রতার প্রমাণ। সুতরাং এই অবস্থায় মনের মধ্যে নামাযের প্রভাব পড়িবে না। তাই এই অবস্থায় নামায পড়িতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।

২। পায়খানা পেশাব হইতে পেট খালি না করা আর ইহা পেটের ভিতর আটকাইয়া রাখা মনে সংকীর্ণতা ও অপরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি করে। আর এই অবস্থায় নামাযে মন লাগে না।

নামাযে মন না লাগা এবং মন অপরিচ্ছন্ন ও সংকীর্ণ থাকা অবস্থায় নামায পড়িলে নামায অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং যে জিনিসের কারণে নামাযের মধ্যে মন লাগে না; বরং মন অপরিচ্ছন্ন থাকে ঐ সব জিনিস দূরীভূত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আল্লামা হাকীম তুনীসী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'কনুযুস সেহাতে' লিখিয়াছেন, "মুত্রাশয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুত্র জমা করিয়া রাখা ক্ষতিকর। ইহার ফলে মারাত্মক ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন– পেশাব ঝরিয়া পড়া, পাথরী রোগ প্রভৃতি। "সুতরাং প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য হইল; যখন তাহার প্রস্রাব করিবার প্রয়োজন হয় তখনই যেন প্রস্রাব করিয়া লয়। কখনও ইহা আটকাইয়া না রাখে। কোন এক ব্যক্তি এই সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তাহা হইল; "যখন খাদ্য হজম হইয়া গিয়াছে এখন অতিরিক্ত পদার্থ আটকাইয়া রাখিও না যদিও তোমরা চলন্ত তলোয়ারের মধ্যে থাক।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পায়ে পরিহিত মোজাদ্বয়ের উপর মসেহ্ করা

মোজার উপর মসেহ্ করার রহস্য

দেহের যে সব বাহ্যিক অঙ্গ ধূলিবালি মিশ্রিত হইয়া পড়ে ওযুর মধ্যে ঐ সব অঙ্গ ধৌত করার বিধান পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হিসাবে ওযুর মধ্যে পাও ধৌত করা হয়। কিন্তু যখন পায়ের উপর মোজা পরিধান করা হয় তখন পা বাহ্যিক অঙ্গের কাতারে থাকে না বরং আভ্যন্তরীণ অঙ্গের কাতারে আসিয়া যায়। সুতরাং ইহা ধৌত করার বিধান বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু মোজা পরিধান করা আরবদেশের সাধারণ অভ্যাস ছিল। ছিল একটি বহুল প্রচলিত অভ্যাস। সুতরাং প্রত্যেক নামাযের সময় মোজা খুলিয়া ফেলা তাহাদের জন্য কষ্টকর বিষয় ছিল। তাই মোজা পরিহিত অবস্থায় পা ধৌত করার বিধান রহিত করিয়া মোজার উপর দিয়া মসেহ করিবার বিধান জারী করা হইল। যাহাতে মসেহ করিবার সময় পা ধৌত করার কথা স্মরণ হয়। কারণ মসেহ করাও তো পা ধৌত করার একটি নমুনা।

মোজার নীচের অংশ মসেহ বৈধ না হওয়ার কারণ

যদি মোজার নীচের অংশে মসেহ করা বৈধ হইত তাহা হইলে মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিত। কেননা নীচের অংশে মসেহ করিয়া মাটির উপর দিয়া চলার সময় মোজা আরও অধিক ধূলাবালি জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং মসেহ করা আর না করা একই কথা। তাই মোজার উপরের অংশে মসেহ করাই নির্মল বিবেকের চাহিদা।

মুকীমের জন্য একদিন একরাত্র আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত্র পর্যন্ত মোজা মসেহ করানির্ধারণ করার ভেদ

যেহেতু মোজার উপর মসেহ করিবার অনুমতি প্রদানের দ্বারা ওযুর মধ্যে পদদ্বয়ের বিধান সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেহেতু এই ক্ষেত্রে এমন একটি সীমাও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে প্রকৃত বিধানটি বর্জন করার

ক্ষেত্রে বে-লাগাম না হইয়া পড়ে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে শরীয়ত প্রবর্তক (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মোজার উপর মসেহ করার ক্ষেত্রেও সীমা নির্ধারণ হিসাবে কয়েকটি বিশেষ শর্ত লাগাইয়া দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ, মুসাফির নয় এমন ব্যক্তি একদিন একরাত্র পর্যন্ত মসেহ করিতে পারিবে। আর মুসাফির তিনদিন তিনরাত্র পর্যন্ত মসেহ করিতে পারিবে। আর একদিন একরাত্র এমন একটি সময় যাহাতে কোন বিধান সুষ্ঠভাবে পালন করা যাইতে পারে। অনেক জিনিস এমন রহিয়াছে যাহা সুষ্ঠভাবে পালন করিতে চায় তাহা একদিন ও একরাত্রে সুষ্ঠভাবে পালন করা সম্ভব হইতেছে। অনুরূপভাবে তিনদিন তিনরাত্রও এই ধরনের একটি সময়। তবে এই দুইটি সময় মুসাফির ও মুকীমের মধ্যে তাহাদের থেকে অসুবিধা ও কষ্ট দূরীভূত করার অনুপাতে বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন– মুকীম থাকা অবস্থায় মোয়াফেক মত আহার করার এবং কাজকর্ম অধিক করার কারণে তাহার শরীরের তাপ এবং বাহিরে নির্গত হওয়ার উচ্ছিষ্ট উপাদানও অধিক থাকে, যাহা নির্গত হওয়ার উদ্দেশ্যে পায়ের কাছে আসিয়া সমবেত হয়। পক্ষান্তরে মুকীমের তুলনায় মুসাফিরের এইসব উপাদান অনেক কম হয়। কারণ সফর অবস্থায় তাহার খানাপিনা মোয়াফেক মত হয় না। আবার কাজকর্মও কম থাকে। আর এইসব উপাদান ও তাপ নির্গত হইতে গিয়া মোজা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই মুকীমের মোজা মুসাফিরের মোজা অপেক্ষা অধিকবার খুলিয়া দেওয়ার বিধান জারী করা হইয়াছে। এইজন্য মুকীমকে নির্দেশ দেয়া হইয়াছে যাহাতে সে একদিন ও একরাত্র পর মোজা খুলিয়া পা ধৌত করিয়া লয়। আর মুসাফিরকে তিন দিন তিন রাত্র পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু মুকীমের তুলনায় মুসাফির পানি পায় কম। তাই মুকীম বার বার ধৌত করিলেও অসুবিধা হয় না। কিন্তু মুসাফির বার বার ধৌত করিতে গেলে অসুবিধায় পড়িবে। তাই মুসাফির ও মুকীমের মধ্যে এই ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হইয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মসেহ করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্তারোপ করিয়াছেন যে, পবিত্রাবস্থায় মোজা পরিধান করিতে হইবে, যাহাতে মোজার উপর মসেহ করার সময়ও তাহার অন্তরে ধৌত করার দ্বারা অর্জিত পবিত্রতার নকশা লাগিয়া থাকে। কেননা মোজা

পরিহিত অবস্থায় মোজা পরিহিত পায়ে ধূলাবালির প্রভাব খুব কম হয়। ফলে মসেহ করার দ্বারা অর্জিত পবিত্রতার বাহ্যিক প্রভাব ধৌত করার দ্বারা অর্জিত পবিত্রতার বাহ্যিক প্রভাব অপেক্ষা অনেক কম হয়। অতএব ধৌত করার দ্বারা অর্জিত পবিত্রতার নকশা মসেহ করার সময়ও বজায় থাকা স্বাভাবিক। তাই মসেহ করার দ্বারা অর্জিত পবিত্রতা ধৌত করার দ্বারা অর্জিত পবিত্রতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ধরনের স্মরণের ফলে মসেহ করা সত্বেও অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ পবিত্রতার প্রভাব ফলিত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ / পানি

এক প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নঃ কূপ হইতে নাপাক পরিষ্কার করার জন্য শুধু বালতি ভরিয়া ভরিয়া পানি উত্তোলন করাই কি যথেষ্ট?

ইসলামী আইনের এই মাসআলা সম্পর্কে কোন কোন দার্শনিকের এই আপত্তি যে, কূপের মধ্যে নাপাক পতিত হইলে কয়েক বালতি পানি উত্তোলন করা যথেষ্ট মনে করা সম্পর্কে আমাদের বড় অবাক লাগে। কেননা পানি উত্তোলন করার জন্য যখন কূপের ভিতর বালতি ফেলা হয় তখন বালতিও নাপাক হইয়া যায়। বালতি উত্তোলন করার সময় বালতির নাপাক পানি কিছু হইলেও কূপের দেয়ালে লাগে ফলে কূপের দেয়ালও নাপাক হয়। এইভাবে শেষ বালতিটি উত্তোলন করা পর্যন্ত বালতির পানি দ্বারা কূপের দেয়াল নাপাক হইতে থাকে। সুতরাং শেষ বালতিটি যখন কূপের উপরে উঠিয়া আসে তখন কি করিয়া কূপের তলদেশ হইতে শুরু করিয়া কূপের উপরের অংশ পর্যন্ত সমস্ত নাপাক বাহির হইয়া আসিতে পারে?

কোন এক বুদ্ধিজীবী ইহার জবাবে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলিয়াছেন যে, আমি এই বালতি অধিক যুক্তিপূর্ণ ও সম্মানিত কোন কিছু দেখি নাই।

দার্শনিকের এই প্রশ্নের জবাবঃ– বালতি দ্বারা কূপ হইতে পানি উত্তোলন করার যুক্তি পরিষ্কার যে, বালতি দ্বারা পানি উত্তোলন করার মাধ্যমে কূপের পানিকে প্রবাহিত পানিতে পরিণত করা হয়। যাহাতে পানির প্রবাহের ফলে নাপাকীর বিভিন্ন অংশ কূপ হইতে বাহির হইয়া আসিতে থাকে।

জবাবের ব্যাখ্যাঃ- কূপের তলদেশে পানির স্রোত রহিয়াছে। এই স্রোতের মাধ্যমে কূপের ভিতর পানি প্রবেশ করে। বালতির মাধ্যমে কূপ হইতে যত পানি বাহির করিয়া আনা হয় স্রোতের মাধ্যমে সে পরিমাণ পানি পুনরায় কূপের ভিতর প্রবেশ করে। এইভাবে কূপের পানি প্রবাহিত পানির মর্যাদা লাভ করে। আর নাপাকীর অংশ পানির সাথে মিলিয়া মিলিয়া বাহির হইয়া আসিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নাপাকীর অংশ এত কম হইয়া যায় যে, ইহা আর নাপাকীর মধ্যে গণ্য থাকে না। এতটুকু নাপাকী মাফ করিয়া দেওয়ার গণ্ডীভুক্ত হইয়া পড়ে। যেমন, কোন পাত্রে নাপাক কাপড় ধৌত করার সময় বার বার কাপড়টি পানিতে ডুবাইয়া পাত্রের পানি ফেলিয়া দিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত কাপড়ের নাপাকীর পরিমাণ এত কম হইয়া যায় যে, কাপড়ের অবশিষ্ট নাপাকী আর নাপাকীর মধ্যে গণ্য থাকে না। এই অবস্থায় কাপড় পাক বলিয়া গণ্য করা হয়। কূপের বিষয়টিও তদ্রূপ।

নাপাক পতিত হওয়ার পরও প্রবাহিত পানি পাক থাকার কারণ।

বন্ধ ও কম পানিতে নাপাক পতিত হইলে অধিকাংশ সময় পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তিত হইয়া যায়। যদি এইসব পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে পানি কম হওয়ার কারণে নাপাকের প্রভাবে পানি প্রভাবিত হইয়া পড়ে এবং প্রায় সমস্ত পানি নাপাক মিশ্রিত হইয়া পড়ে। কিন্তু পানি যদি প্রবাহিত হয় তাহা হইলে পানিতে নাপাক পতিত হইলেও পানি প্রবাহের কারণে নাপাক একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না। কারণ নাপাকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলিও পানির প্রবাহের সাথে দূরে চলিয়া যায়। ফলে নাপাক পানির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায় না। তাই প্রবাহিত পানি পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হয়।

সামান্য পানি নাপাক হওয়ার হেকমত। অল্প পানি ও অধিক পানির সীমা নির্ধারণ করার রহস্য

বিশ্ব নিখিলের প্রত্যেকটি জিনিসের পানির প্রয়োজন। অধিকন্তু ইহা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকাই এই কথা প্রমাণ করে যে, সকল প্রাণীরই পানির প্রয়োজন রহিয়াছে। বিশ্ব নিখিলের সমস্ত প্রাণীর পানির নিকটে আসা যাওয়া করা এবং পানির উপর ইহাদের জীবনধারণ নির্ভরশীল হওয়া একটি বাস্তব সত্য।

সুতরাং পানির অনেক স্থান এমন রহিয়াছে যাহা হইতে হিংস্র জন্তু পানি পান করে। আর অনেক পানি এমন রহিয়াছে যাহাতে নাপাক পতিত হইয়া থাকে। হিংস্র জন্তু ও নাপাকের প্রভাবে পানি মানবদেহের জন্য কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর হইয়া থাকে।

কি পরিমাণ পানি হিংস্র জন্তু ও নাপাকের প্রভাবে ক্ষতিকর হয় উহার একটি নির্ধারিত সীমা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে মানুষ পানির ক্ষতি হইতে সতর্ক হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যদি নির্ধারিত সীমা হইতে পানির পরিমাণ বেশী হয় তাহা হইলে তাহারা যেন পানি ব্যবহারের অনুমতি পায়। সুতরাং অল্প পানির জন্য যে হুকুম রহিয়াছে অধিক পানির জন্য যদি একই হুকুম হয় তাহা হইলে দুনিয়ার মানুষ বড় বড় ক্ষতি ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। জীবনধারণ তাহাদের জন্য মুশকিল হইয়া পড়িবে। এইজন্য পানির স্বল্পতার পরিমাণ ও আধিক্যের পরিমাণের সীমা নির্ধারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাহাতে নাপাক পতিত উভয় প্রকার পানির হুকুম এক না হয়। তাহা হইলে মানুষের পানি ব্যবহার করা কঠিন ও মুশকিল হইয়া পড়িবে।

পানির জন্য দশ দশ হাত সীমা নির্ধারণের কারণ

যেভাবে নাপাকীর স্বল্পতা ও আধিক্যতার সীমা নির্ধারণ করা জরুরী ছিল, যাহাতে ইহা কম ও অধিক পানির মধ্যে পতিত হওয়ার ফলে পানি পবিত্র ও অপবিত্র হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। অনুরূপভাবে পানির স্বল্পতা ও আধিক্যেরও একটি সীমা নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা জরুরী, যাহাতে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার সময় সন্দেহ ও সংশয় পয়দা না হয়। আর এই জন্য দশ সংখ্যাটি নির্ধারণ করা হইয়াছে। কারণ ইহা বড় বহুবচন অর্থাৎ দশকগুলির প্রথম সংখ্যা। ইহাকে এইক্ষেত্রে মাপকাঠি নির্ধারণ করা হইয়াছে। কারণ ইহা বড় বহুবচনের প্রথম সংখ্যা হিসাবে পানির আধিক্যের প্রতি নির্দেশ করিতেছে। সুতরাং দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রশস্ত চৌবাচ্চার পানি অধিক পানি বলিয়া পরিগণিত। আর ইহার পানি পবিত্র।

সুতরাং যেহেতু এই পরিমাণ পানি অধিক পানি হিসাবে গণ্য এবং পবিত্র সেহেতু স্বল্প নাপাকী ইহাতে পতিত হইয়া পানির মধ্যে কোন রূপ প্রভাব

বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। স্বল্প নাপাকী হইল এতটুকু পরিমাণ নাপাকী যাহা পানিতে পতিত হইয়া পানির বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন করিতে পারে না। এই জন্যই যেখানে দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ পানি থাকে সেখানে স্বল্প নাপাকীকে প্রভাবশীল বলিয়া গণ্য করা হয় না। এতটুকু নাপাকী এই পরিমাণ পানিতে পতিত হইলে পানি নাপাক হয় না; বরং ইহা পাক বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থকে গুণ করিলে গুণফল দাঁড়ায় একশত বর্গহাত। আর একশত বর্গহাত নিঃসন্দেহে অধিক।

ইঁদুর ও বিড়ালের ঝুটা পবিত্র হওয়ার কারণ

ঝুটা বা খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ পাক ও নাপাক হওয়া নির্ভর করে জন্তুর লালা পবিত্র ও অপবিত্র হওয়ার উপর। আর লালা পবিত্র ও অপবিত্র হওয়া নির্ভর করে জন্তুর গোশত পবিত্র ও অপবিত্র হওয়ার উপর। যদি শরীয়ত এইসব জন্তু নাপাক হওয়ার হুকুম দিত তাহা হইলে মানুষ মহাবিপদ ও কষ্টে পতিত হইত। কারণ এইসব জন্তু দিন রাত মানুষের বিছানা, কাপড় চোপড়ের সাথে লাগিয়া চলে আবার মানুষের পানাহারের বস্তুর মধ্যে প্রায়ই মুখ দেয়। শরীয়ত এইসব জন্তু নাপাক হওয়ার হুকুম দিলে এইসব জিনিসও নাপাক হইয়া যাইত। যেহেতু শরীয়ত এইসব জন্তুকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে তাই ইহাদের ঝুটাও পবিত্র। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী ইহার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَ الطَّوَّافَاتِ *

" ইহারা নাপাক নহে। কেননা ইহারা বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমাদের ঘরে আসা যাওয়া করে।"

কুকুর ও বিড়ালের ঝুটার মধ্যে পার্থক্য করার কারণ

১। কুকুর একটি অভিশপ্ত জন্তু। ফিরিশতারা ইহাকে ঘৃণা করে। কারণ ইহা শয়তানের সাথে সাদৃশ্য রাখে। কেননা গোস্বা করা, উদ্দেশ্যহীন কাজ করা এবং নাপাক মিশ্রিত থাকা কুকুরের স্বাভাবিক স্বভাব। মানুষকে কষ্ট দেওয়া এবং

শয়তানী চিন্তাধারা কবুল করা শয়তানের মধ্যে পাওয়া যায়। এই কারণে হাদীছে আসিয়াছে যে, কোন প্রয়োজন ব্যতীত কুকুরের সাথে মিলামিশা করিলে দুই কিরাত করিয়া সওয়াব কমিয়া যায়।

২। কুকুর যেসব জিনিস আহার করে উহা দ্বারা সে স্বীয় মুখ মিশ্রিত করিয়া ফেলে। মুখ পরিষ্কার করে না। কিন্তু বিড়াল তেমন নহে। সে চাটিয়া চাটিয়া স্বীয় মুখ পরিষ্কার করিয়া ফেলে।

কুকুর পাত্রে মুখ দিলে বা পাত্র হইতে পানি বা অন্য কোন জিনিস পান করিলে পাত্র সাতবার ধৌত করিয়া পবিত্র করার হেকমত।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات و عفروه الثامنة بالتراب *

"যখন কুকুর কোন পাত্র হইতে কোন কিছু পান করে বা আহার করে তখন ঐ পাত্র পাক করার জন্য সাতবার ধৌত কর আর অষ্টম বার মাটি দ্বারা মাজিয়া লও।"

কুকুরের লালার প্রভাব খুব মারাত্মক ও বিষাক্ত হইয়া থাকে। পাত্র বা অন্য জিনিসেও ইহার একই প্রভাব পড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তি কুকুরের অবশিষ্ট খাদ্য আহার করে বা কুকুর মুখ দিয়াছে এমন পাত্রে আহার করে অথবা পান করে তাহা হইলে তাহার জীবনে কুকুরের হিংস্রতা ও বদ অভ্যাস অবশ্যই প্রতিফলিত হইবে। এই জন্যই যে পাত্রে কুকুর কোন কিছু ভক্ষণ করিয়াছে বা পান করিয়াছে– সে পাত্র বার বার ধৌত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়াছেন। আর সাত বার ধৌত করার কথা বলিয়া বার বার ধৌত করার সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। সাতবার ধৌত করার নির্ধারণ করা প্রমাণ করে যে– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরে নববী দ্বারা অবগত হইতে পারিয়াছেন যে, পাত্র এই সীমা পর্যন্ত ধৌত করিলে পাত্র হইতে অপবিত্রতার প্রভাব দূরীভূত হইয়া যাইবে। তাই ধৌত করার এই সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। আর অষ্টম বার পাত্রটি মাটি দ্বারা

মাজিবার নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, কুকুরের লালার যে বিষাক্ত প্রভাব পাত্রের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে উহা মাটির দ্বারা ধ্বংস হইয়া যায়।

ইবাদতের জন্য সময় নির্দিষ্ট করার রহস্য

১। সময়ের এবং অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানবদেহের পরিবর্তন সর্বদা প্রত্যক্ষ করা যায়। অনুরূপভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আন্তরিক অবস্থারও পরিবর্তন হইতে থাকে। অতএব সময়ের পরিবর্তনের প্রভাব যেভাবে মানুষের দেহে পড়িয়া থাকে অনুরূপভাবে তাহার অন্তরেও পড়িয়া থাকে। সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের আবর্তন কখনও কখনও প্রাত্যহিক হইয়া থাকে। যেমন, প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়। আবার কখনও কখনও ইহার আবর্তন সাপ্তাহিক হইয়া থাকে। যেমন, জুমআর নামাযের সময়। কখনও কখনও সময়ের আবর্তন বাৎসরিক হইয়া থাকে। যেমন, রমযান মাসের রোযা এবং দুই ঈদের সময়। এই জন্যই প্রত্যেক ইবাদত উহার সময়ের আবর্তনের সাথে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

২। মানুষের আমলসমূহ প্রতি সপ্তাহে সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। রমযান মাসে কুরআন পাকের অবতীর্ণ হওয়া সময়ের মর্যাদা এবং মানুষের বিশেষ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৩। আগত রোগ এবং কষ্ট-ক্লেশ হইতে আপন দেহ হেফাজত করিবার জন্য মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু, ঔষধ এবং খাদ্য সময়োপযোগী ব্যবহার করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে মানুষ স্বীয় আত্মার হেফাজতের জন্য আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত আহকাম নির্ধারিত ও উপযুক্ত সময়ে আদায় করিয়া থাকে।

৪। নামাযের জন্য ওয়াক্ত নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা জরুরী। কেননা ওয়াক্ত নির্ধারিত থাকিলে মানুষের চিন্তা এই দিকেই নিবদ্ধ থাকে। অধিকন্তু অন্তরে স্থিরতা ও প্রশান্তি আসে। পক্ষান্তরে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রত্যেকেই আপন অভিমত প্রকাশ করিয়া ঝগড়া সৃষ্টি করার সুযোগ পাইবে না। কোন জিনিস নির্ধারিত হইলে প্রত্যেকেই ইহার নির্ধারণে আপন অভিমতকে প্রাধান্য দিতে চায়, যদিও এই অভিমত প্রদানে তাহার ক্ষতিও হয়।

৫। যদি ইবাদতের জন্য ওয়াক্ত নির্দিষ্ট না হইত তাহা হইলে অধিকাংশ

লোক সামান্য নামায রোযা করিয়া অনেক কিছু করিয়াছে বলিয়া ধারণা করিত, যাহা সম্পূর্ণ বেকার ও বেফায়দা হইত। অধিকন্তু ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করার মধ্যে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট ওয়াক্তের পাবন্দী না করে এবং এই ওয়াক্তে ইবাদত না করিয়া অন্য ওয়াক্তে করিবার টালবাহানা করে, তাহা হইলে তাহার কান মলিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে।

৬। আল্লাহর হেকমতের চাহিদা হইল এই যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষকে নামাযের পাবন্দী করার এবং নামায আদায়ের জন্য সময় নির্ধারিত করার নির্দেশ দেওয়া, যাহাতে মানুষ নামাযের পূর্বে থেকেই নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে এবং ইহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে। আর নামাযের পর ইহার নূরের প্রভাব এবং রং অবশিষ্ট থাকে, যাহা নামাযেরই মর্যাদা রাখে। এইসব কার্য সারিয়া অবশিষ্ট সময়ে আল্লাহর যিকির করিতে পারে আর তাঁহার আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে অন্তর লাগাইয়া দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা এমন একটি ঘোড়ার সাথে তুলনা করা যায়, যাহার সামনের ও পিছনের উভয় দিক রশি লাগাইয়া টানিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা একবার সামনের দিকে ধাবমান হয় কিন্তু পরে আবার মুক্তহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। নামাযের পাবন্দী করার ফলে গাফলতি ও গোনাহের অন্ধকার অন্তরের মধ্যে বসিতে পারে না।

৭। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য ওয়াক্ত নির্ধারিত করা ওয়াক্তের পাবন্দীর প্রতি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিলম্ব না করার প্রতি ইঙ্গিত করে।

لَا تُوخِرْ عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ

"আজকের কাজ আগামীকল্যের জন্য ছাড়িয়া দিবে না।"

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করার রহস্য

নামাযের জন্য নির্ধারিত পাঁচটি ওয়াক্তের বিশেষত্বের দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্ব বুঝানের জন্য আল্লাহ পাক কুরআন করীমে এইসব ওয়াক্তের এমনসব গুণাবলী উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ওয়াক্ত নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব রাখে। যেমন, ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ *

"অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, এবং এশার সময় ও দুপুরে। আর আসমান যমীনের সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই জন্য।

কুরআন পাকের এই বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত ওয়াক্তসমূহের মধ্যে আসমান যমীনের মধ্যে বড় বড় পরিবর্তন হইতে থাকে। এইসব পরিবর্তনের সময় আল্লাহ পাকের নতুন নতুন প্রশংসা করা ও পবিত্রতা বর্ণনার সুযোগ আসে। এইসব পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের রূহ ও দেহ উভয়ের উপর প্রতিফলিত হয়।

সারকথা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায কি? ইহা তোমাদের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন। অর্থাৎ, যেসব অবস্থা তোমাদের জীবনে অপরিহার্যভাবে আপতিত হয় তাহা হইল, এই পাঁচটি পরিবর্তন। আর এইসব পরিবর্তন তোমাদের স্বভাবের সাথে পরিপূর্ণ জড়িত বিধায় তোমাদের জীবনে এইগুলি আপতন অপরিহার্য। নিম্নে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

জোহরের নামায নির্ধারণ করার রহস্য

নামাযের পাঁচটি ওয়াক্ত বিপদগ্রস্ত মানবের বিভিন্ন অবস্থার সাথে তুলনীয়। যেমন, কোন ব্যক্তিকে প্রথমে অবগত করা হইয়াছে যে, তোমার উপর এক বিপদ নামিয়া আসিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ- তোমার নামে আদালত থেকে ওয়ারেন্ট জারী হইয়াছে, তোমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। ইহা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রথম অবস্থা। ইহাতে তাহার মনের স্থিরতা ও সুখাবস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের এই অবস্থা দুপুরের পর সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ার অবস্থার সাথে তুলনীয়। কেননা এই অবস্থা প্রমাণ করে যে, তাহার মনের স্থিরতা এবং সুখাবস্থাও হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার এই মানসিক অবস্থার মোকাবিলায় জোহরের নামায নির্ধারণ করা হইয়াছে। কারণ জোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য হেলিয়া পড়ার সময় থেকেই, যাহাতে সূর্য হেলাইয়া দেওয়ার শক্তি যাহার হাতের মুঠাতে রহিয়াছে তাহাকে স্মরণ করিয়া তাহার দিকে মনোনিবেশ করা যায়।

অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলিয়া পড়ার সময় সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই সময় আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এই জন্য আমার মনে চায় যে, এই সময় আমার কোন আমল আসমানের দিকে আরোহণ করুক।

আবার এই সময় আসমান যমীনের যে পরিবর্তন হয় ইহার চাহিদা হইল যে, এই সময় বান্দা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। এইসব কারণে এই সময়টি আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে।

চিকিৎসাবিদগণ লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত পরিবর্তনগুলির প্রভাব মানুষের দেহের উপর পর্যন্ত পড়িয়া থাকে। কানুচা নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মুফাররেহুল কুলুবে' লিখা হইয়াছে যে, দুপুরের পর নিদ্রার কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়া যায়। আর এই সময়ের নিদ্রাকে হায়লুলা বলা হয়। হায়লুলা অর্থ প্রতিবন্ধকতা। ইহাকে হায়লুলা বলার কারণ, ইহা নিদ্রিত ব্যক্তি ও নামাযের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

গরমের দিনে বিলম্ব করিয়া আবহাওয়া শীতল হইলে জোহরের নামায পড়িবার হেকমত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اِذَا اِشْتَدَّ الحرُّ فابردوا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ

"যখন গরম প্রচণ্ড হয় তখন জোহরের নামায ঠাণ্ডা অবস্থায় আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের হাঁফ"। ইহার অর্থ জান্নাত জাহান্নাম আল্লাহ পাকের খাযানা। এই দুনিয়াতে এই খাযানা হইতেই ভাল-মন্দ অবস্থা আসিয়া থাকে।

আছরের নামায নির্ধারিত হওয়ার রহস্য

দ্বিতীয় পরিবর্তন তখন আসে যখন তুমি বিপদগ্রস্ত হওয়ার অতি নিকটে উপস্থিত থাক। উদাহরণ স্বরূপ- যখন তোমাকে ওয়ারেন্টের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করিয়া হাকীমের সামনে উপস্থিত করা হয়। এই অবস্থায় ভয়ের কারণে তোমার রক্ত শুষ্ক হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয় এবং তোমার থেকে সান্ত্বনা ও

স্থিরতার নূর দূর হইয়া যায়। তোমার এই অবস্থা সূর্যের ঐ অবস্থার সাথে তুলনীয় যখন সূর্যের আলো হ্রাস পাইয়া যায় এবং সূর্যের দিকে তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পার কিন্তু তোমার দৃষ্টি সূর্যের আলোর তেজে বাধা প্রাপ্ত হয় না। বরং পরিষ্কারভাবে তুমি ইহা দেখিতে পার। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম প্রায়। সূর্যের অবস্থার সাথে নিজের অবস্থাকে তুলনা করিয়া নিজের গুণাবলী ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনার কল্পনা হয়। মনের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আছরের নামায নির্ধারিত হইয়াছে, যাহাতে মনের পরিবর্তনকারী মালিকের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার রহমত নিজের দিকে টানিয়া আনা যায়।

অধিকন্তু ইহা এমন একটি সময় যে, এই সময়ের অসতর্কতার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। এই সময়ের অসতর্কতা মানবদেহে পর্যন্ত খারাপ ক্রিয়া করিয়া থাকে। হাকিম মুহাম্মদ আযরানী লিখিয়াছেন যে, আছরের সময়ের নিদ্রা অনেক রোগের সৃষ্টি করে। অনেক সময় এই সময়ের নিদ্রায় মানুষ ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং এই সময়ের চাহিদা হইল যে, এই সময় নিদ্রা যাওয়া ও অসতর্ক থাকার পরিবর্তে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া।

মাগরিবের নামায নির্ধারিত হওয়ার রহস্য

তৃতীয় পরিবর্তন তখন আসে যখন এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা তোমার সামনে না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ– তোমার নাম অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তোমাদের বিরুদ্ধে এমন সাক্ষী হাযির করা হইয়াছে, যাহা তোমার ধ্বংস প্রায় নিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সময় তোমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তুমি নিজেকে কয়েদী বলিয়া ধারণা করিতেছ। তোমার এই অবস্থা সূর্য অস্ত যাওয়ার অবস্থার সাথে তুলনীয়, যেন তোমার জীবনের সমস্ত আশা–আকাঙক্ষার আলো খতম হওয়ার পথে। মনের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাগরিবের নামায নির্ধারিত হইয়াছে, যাহাতে জীবনের লম্বা লম্বা আশার চিকিৎসা হইয়া যায়।

ইশার নামায নির্ধারিত হওয়ার রহস্য

চতুর্থ পরিবর্তন তখন আসে যখন বিপদ তোমার উপর যেন আসিয়াই পড়িয়াছে। বিপদের ঘোর অন্ধকার তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ– তোমার নাম অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার এবং সাক্ষীগণের সাক্ষ্য দেওয়ার পর তোমাকে ফয়সালা শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। কারাগারে লইয়া যাওয়ার জন্য তোমাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হইয়াছে। তোমার এই অবস্থা রাত্রের ঘোর অন্ধকারের সাথে তুলনীয় যে, রাত্রের এই ঘোর অন্ধকার তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইশার নামায নির্ধারিত হইয়াছে, যাহাতে এই ইবাদতের বরকতে আপতিতপ্রায় এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পার। রাত্র ও অন্ধকারের বিপদাপদের সাথে দিনের এবং আলোর আরাম ও মুক্তির সাথে কুদরতি সম্পর্ক রহিয়াছে। এক আরবী কবি এই কুদরতী সম্পর্কের কথা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন–

اَلَمْ تَرَ أَن اللَّيْلَ لَمَا تَرَاكَمَتْ + دَجَاه بدَا وَجْه الصَّبَاح وَ نُوْره

فَلَا تَصْحَبن اليَاس إِنْ كُنْتَ عَالِمًا + لَبِيبًا فَان الدَّهـر شَتى امُوْره

"তুমি কি দেখ না যে, যখন রাত্রের অন্ধকার আছন্ন করিয়া ফেলে তখন উহার পরে প্রভাতের আলোর আগমন হইয়া থাকে। সুতরাং তুমি যদি জ্ঞানী বুদ্ধিমান হও; তাহা হইলে নিরাশ হইও না। কেননা কালের অবস্থা বিভিন্ন হইয়া থাকে।"

ফজরের নামায নির্ধারিত হওয়ার রহস্য

অতঃপর এই মহাবিপদের অন্ধকারে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর আল্লাহ পাকের রহমতের সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি তোমাকে এই অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়াছেন। অন্ধকারের পর প্রভাত হয়। আর প্রভাতে দিবসের আলো স্বীয় উজ্জ্বলতার সাথে প্রকাশিত হয়। এই মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফজরের নামায নির্ধারিত হইয়াছে। আল্লাহ পাক তোমাদের স্বভাবগত পরিবর্তন মোতাবেক তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই নামাযসমূহ তোমাদের নিজেদের লাভের জন্যই নির্ধারণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা এইসব বিপদ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর– তাহা হইলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পরিত্যাগ করিও না। ইহাতো তোমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থার

প্রতিফলন। তোমাদের সামনে আগত প্রায় বিপদাপদের চিকিৎসা। তোমাদের সামনে আগত এই দিবস তোমাদের ভাগ্যে কি আনয়ন করে– তাহা তোমরা অবগত নও? সুতরাং দিবস তোমাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা স্বীয় মনিবের দরবারে কাকুতি মিনতি করিতে থাক, যাহাতে তোমাদের দিবস মঙ্গল ও কল্যাণের দিবস হয়। এই সকল সময়ে যদি মানুষ আল্লাহকে ভুলিয়া থাকে– তাহা হইলে তাহাদের রূহে বড়ই খারাপ প্রভাব পড়ে। আর যদি নিদ্রায় থাকে তাহা হইলে তাহার দেহে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। যেমন, মুফাররেহুল কুলুবের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ফজরের নামাযের সময় নিদ্রিত ব্যক্তি খুব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করিয়া যদি তাহার উদর খালি থাকে, তাহা হইলে তো মারাত্মক ক্ষতিতে পতিত হয়।

নামাযের ওয়াক্তসমূহের প্রথম ও শেষসীমা নির্ধারণ করার রহস্য

যদি মানুষকে এই নির্দেশ দেওয়া হইত যে, তাহারা সকলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়িয়া লইবে। অর্থাৎ এমন একটি ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত যাহা হইতে সামান্য আগে বা পিছে করা যাইবে না। তাহা হইলে ইহা মানুষের জন্য মারাত্মক অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইত। এই জন্যই নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে কিছু প্রশস্ততা দান করা হইয়াছে। আর ওয়াক্তের প্রথম ও শেষ সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা স্মরণ রাখা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা খুবই সহজ।

ওয়াক্তের পাবন্দী করার হেকমত

নামাযের ওয়াক্তের পাবন্দী করার মধ্যে এক কুদরতী প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। নামাযের নির্ধারিত ওয়াক্ত আসার সাথে সাথে এই দায়িত্বটি আদায় করিবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামাযীর অন্তরে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। আর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রূহানী শক্তি এই ফরয দায়িত্বটির প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। যখনই অকৃত্রিম সিংগার (আযানের) আওয়াজ কর্ণে প্রবেশ করে তখন দ্বীনদার মুসলমান সাথে সাথে ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। সর্বদাই তাহার অন্তরে নামাযের চিন্তা থাকে। কেননা এক নামায আদায় করার পর সে দ্বিতীয় নামাযের ফিকিরে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় / নামায

প্রথম পরিচ্ছেদ / আযান

নামাযের আযানের রহস্য

জামাতের সাথে নামায আদায় করা একটি জরুরী বিষয়। কোন প্রকার ঘোষণা বা আহবান ব্যতীত এক স্থানে একই সময়ে অনেক লোক একত্রিত করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাই আহবানের ব্যবস্থা করা হইল– যাহা আযান নামে পরিচিত। কিন্তু আল্লাহর হেকমতের ইহাও চাহিদা হইল যে, আযান যেন শুধু একটি সাধারণ ঘোষণা বা আহবান হইয়া না থাকে বরং ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে প্রকাশ পায়। ইহা এমন কতগুলি বাক্যের সমষ্টি, যাহার দ্বারা মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করা হয়। আর এই সব বাক্যে দ্বীনের ইযযত ও সম্মান বিদ্যমান থাকে। যাহারা ইহা কবুল করিল তাহাদের কবুল করাই যেন তাহাদের আল্লাহর দ্বীনের অধীনস্থ হইয়া যাওয়ার পরিচায়ক হয়। এই জন্য ইহা গঠনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ এবং তৌহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকা জরুরী মনে করা হইয়াছে; আর এমন কিছু বাক্য সংযোজন করাও জরুরী মনে করা হইয়াছে, যাহাতে নামাযের দিকে আহবান পাওয়া যায়। আর ইহা "হাইয়া আলাছ্ ছালাহ"তে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা সংযোজন করার মধ্যে ভেদ হইল যে, যে কার্যের দিকে আযানের দ্বারা আহবান করা হইবে আযানের মধ্যে যেন ঐ কার্যের কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকে।

কানে আংগুল দিয়া আযান দেওয়ার হেকমত

বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ ইবনে মাজাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يَّجْعَلَ اصْبَعَيْهِ فِي اُذُنَيْهِ قَالَ انه ارفع لِصَوْتِكَ *

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাঃ)–কে নির্দেশ দিয়াছেন– "তিনি যেন আযান দেওয়ার সময় দুইটি আঙ্গুলি দুই কানে রাখিয়া

আযান প্রদান করেন।" তিনি আরও বলিলেন যে- "এইভাবে আযান দিলে তোমার আযানের আওয়াজ উচ্চ হইবে।"

নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার ভেদ

নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার হেকমত হইল এই যে, নবজাতকের কানে যে আওয়াজ প্রথম প্রবেশ করে উহার প্রভাব তাহার মস্তিষ্কে পড়ে এবং তাহার স্বভাবে ইহার প্রতিফলন ঘটে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার প্রথা চালু করিয়াছেন, যাহাতে তাহার জন্মের পর তাহার কর্ণে যে আওয়াজ স্থায়ী আসন করিয়া লইবে তাহা যেন তাওহীদ ও রিসালাতের আওয়াজ হয়। কেননা জন্মের সময় যে আওয়াজ তাহার কর্ণে পৌঁছে তাহা পাথরের নকশার ন্যায় মজবুত ও সুদৃঢ় হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ / নামাযের বিবরণ

কাবাঘর সামনে রাখিয়া নামায পড়ার রহস্য

১। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে এক নীতি ও অভ্যাস জারী ছিল যে, যখন কোন আমীর বা বাদশাহের প্রশংসা করা হইত বা তাহার গুণাবলী বর্ণনা করা হইত- তখন প্রশংসাকারী বা গুণ বর্ণনাকারীরা বাদশাহের সামনে খাড়া হইত। অতঃপর তাহার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায় লিপ্ত হইত। নামাযের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি নজর দেওয়া হইয়াছে। বিনয় ও একাগ্রচিত্ততা ইবাদতের রূহ। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের দিকে দৃষ্টি করার দ্বারা ইহা অর্জিত হয় না বরং ইহা অর্জিত হওয়ার জন্য জরুরী হইল বিভিন্ন জিনিস হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া কোন একটা বিশেষ জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। অধিকন্তু ইবাদতের একাগ্রতা অর্জন করার পূর্বশর্ত পরিবেশ নীরব হওয়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতকারী একটি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট জিনিসের দিকে রূখ করা নিজের জন্য অপরিহার্য না করিয়া নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা ও বিশেষ জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অর্জিত হইতে পারে না। এই জন্য নামাযের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিক নির্ধারণ করা হইয়াছে।

২। মানবের ভিতর ও বাহিরের মধ্যে এমন একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান

রহিয়াছে যে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একদিকে ঝুকাইয়া দেওয়ার দ্বারা অন্তরও একদিকে ঝুকিয়া যাওয়ার সহায়ক হয়। এই জন্য নামাযের মধ্যে সমস্ত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাবার দিকে মনোনিবেশ করা অবলম্বন করা হইয়াছে, যাহাতে নামাযীর অন্তরও একদিকে মনোনিবেশকারী হইয়া যায়।

৩। সকল মানুষের জন্য একটি নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত কেবলা থাকা অপরিহার্য। কেননা সকলের জন্য একটি নির্দিষ্ট কেবলা হইলে সকলের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একমুখী হইয়া থাকিবে। ইহাতে সকলের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঐক্য স্থাপিত হইবে। আর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঐক্য আন্তরিক ঐক্য স্থাপনের প্রধান সহায়ক। এইভাবে যখন সকলের অন্তর একত্রে এবং একই পন্থায় ইবাদতের নূর ও বরকত হাসিল করিবে। তখন ইহার দ্বারা অন্তর আলোকিত হওয়ার সমাবেশে আড়ম্বরপূর্ণ এক বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে।

যেমন কোন ঘরের মধ্যে একই স্থানে যদি অনেকগুলি বাতি এক সাথে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঘর চমকপ্রদভাবে আলোকিত হইয়া পড়ে। অন্তর আলোকিত হওয়ার এই আড়ম্বরপূর্ণ প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়াই জুমআর নামায ও জমাতের সাথে নামায পড়ার প্রথার প্রচলন দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জমাতে এক মহল্লার লোকদের, জুমার নামাযে এক শহরের লোকদের, হজ্জের মধ্যে সমস্ত দুনিয়ার লোকদের সমাবেশ হয়। আর ইহা ইবাদতের নূরের ঐক্যে শক্তি প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ পন্থা ও উপায়। কিন্তু যেহেতু দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি ওয়াক্তে এক স্থানে সমবেত হওয়া মুশকিল, তাই এই ঘরের দিককে ঘরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া নামাযে ইহা সামনে রাখিয়া নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

৪। যেদিন সমস্ত দুনিয়াতে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী ইবাদত চালু ছিল আর এইসব ইবাদতে শিরক ও মাখলুক পূজা মিশ্রিত ছিল, খালেছ তাওহীদের ভিত্তিতে কোন ইবাদত মওজুত ছিল না, তখনকার দিনে এক মহান পথপ্রদর্শক সমগ্র জাহানের ত্রুটিযুক্ত এইসব ইবাদতের মোকাবিলায় আপন ইবাদতের তরীকাকে বিশুদ্ধ তাওহীদের ভিত্তিতে চালু করিতে ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি তরীকা কায়েম করা অপরিহার্য-

এই ব্যাপারে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকার অবকাশ নাই। এই ব্যবস্থা কায়েম করিতে গিয়া তিনি স্বীয় উম্মতকে বাহিক্যভাবে এমন এক দিকে রূখ করাইতে চাহিলেন, যেদিকে রূখ করার দ্বারা অন্তরের মধ্যে আল্লাহ প্রেমের ঝড় বহিতে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যেক মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এক মহান তৌহিদ প্রচারক মক্কায় অবস্থিত আল্লাহর ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন। আর শেষ যামানায় তাহারই বংশ হইতে পরিপূর্ণ শরীয়তসহ একজন নবী আগমন করিয়াছেন, যিনি প্রথমে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষাকে পুনঃজীবিত করিয়াছেন। সুতরাং নামায পড়িতে গিয়া যখন এই ঘরের দিকে রূখ করিবে তখন এইসব জিনিসগুলি ছবির ন্যায় নামাযীর চিত্রপটে ভাসিয়া উঠিবে। আর তাহার উত্তরপুরুষ বিশ্বনিখিলের মহান সংস্কারক আল্লাহর কলেমাকে সুন্নত করিতে গিয়া কি কি মেহনত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইতে থাকিবে।

৫। যদি কোন ব্যক্তি কোন ঘরের দিকে যায় তখন উক্ত ঘর তাহার উদ্দেশ্য হয় না বরং ঘরওয়ালা উদ্দেশ্য হয়। এই ঘরের প্রতি সে যে সম্মান প্রদর্শন করে সকলেই জানে যে, এই সম্মান প্রকৃতপক্ষে ঘরকে প্রদর্শন করে নাই বরং ঘরওয়ালাকে প্রদর্শন করিয়াছে। যেমন, যদি কেহ কোন সিংহাসনওয়ালার সিংহাসনের প্রতি কুর্ণিশ করে তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তাহার সিংহাসনের প্রতি কুর্ণিশ হয় না বরং সিংহাসনওয়ালার প্রতিই কুর্ণিশ হইয়া থাকে; বরং বায়তুল্লাহ বলিয়াও এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, কাবার প্রতি রূখ করিয়া নামায পড়াতে কাবা উদ্দেশ্য নহে বরং কাবাওয়ালা অর্থাৎ আল্লাহ উদ্দেশ্য। যেহেতু কাবা আল্লাহর ঘর তাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবার প্রতি রূখ করা হইয়াছে। এই জন্যই কাবার প্রতি রূখ করিয়া নামায পড়া নির্ধারণ করা হইয়াছে।

নামাযের জন্য জায়গা ও পোশাক পরিষ্কার হওয়ার রহস্য

১। বাদশাহদের দরবারে স্থান এবং পোশাকের পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খুব খেয়াল রাখা হয়। তাই যাহারা বাদশাহের দরবারে গমন করিবে তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ পাক পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত জরুরী। যেভাবে জায়গা ও পোশাক পরিচ্ছদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাদশাহগণ পছন্দ করিয়া থাকেন অনুরূপভাবে সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সকল

বাদশাহদের বাদশাহ মহান আল্লাহ পাকও জায়গা, পোশাক ও অন্তরের পবিত্রতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। কেননা তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও ময়লার প্রতি তাঁহার ঘৃণা এবং তিনি এইসব অপছন্দ করেন। যেহেতু অন্যান্য বাদশাহদের অস্তিত্বও তাঁহার কুদরতী হাতের দ্বারাই হইয়াছে, আর তাহারা তাঁহারই কুদরতে টিকিয়া আছে সুতরাং তাহাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করার গুণ তাঁহার এই গুণের ছায়া। যেহেতু আল্লাহ পাক নিজেও পবিত্র এবং পবিত্রতা ভালবাসেন, প্রত্যেক জিনিসেই তিনি পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করিয়া থাকেন তাই নামাযের জন্য জায়গা ও পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র থাকাকে নামাযের একান্ত জরুরী শর্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। এই কারণেই কুরআনে পাকে তিনি নির্দেশ দিয়াছেন–

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ

আপন পোশাক পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।

২। অপবিত্রতা ও ময়লা আবর্জনার সাথে শয়তানের সম্পর্ক। তাই আল্লাহর দরবারে খাড়া হওয়ার সময় শয়তানের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন জিনিস হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া উচিত। অন্যথায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত পরিপূর্ণ হইবে না বরং ত্রুটিযুক্ত হইবে।

নামাযের জন্য রোকন ও শর্ত নির্ধারণ করার রহস্য

যদি মানুষের ইবাদতের জন্য রোকন ও শর্ত নির্ধারণ না হয় তাহা হইলে সে দিশাহারা অন্ধের ন্যায় স্বীয় হাত-পা মারিতে থাকিবে। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হইতে আহকাম প্রদানের মাধ্যমে যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা তখনই পরিপূর্ণ হইবে যখন আহকামের জন্য ওয়াক্ত, রোকন ও শর্ত নির্ধারিত হইবে। যেহেতু আল্লাহর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, আগ্রহ ও ভয়ের মাধ্যমে তাঁহার দিকে আন্তরিকভাবে মনোনিবেশ করা ও ঝুঁকিয়া পড়া একটি অপ্রকাশ্য বিষয়। এই জন্য বাহিরেও ইহার জন্য এমন কাজ হওয়া আবশ্যক যাহার মাধ্যমে আন্তরিক এই অবস্থার প্রকাশ হইতে পারে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযীর এই আন্তরিক অবস্থাকে দুইটি কার্যের মাধ্যমে

প্রকাশ করিয়াছেন। একঃ স্বীয় চেহারা ও দেহ কেবলামুখী করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া। দুইঃ মুখের দ্বারা আল্লাহু আকবার বলা। কেননা মানুষের জন্মগত অভ্যাস যে, যখন তাহার অন্তরে কোন বিষয় বসিয়া যায় তখন তাহার মুখ ও তাহার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাহার অন্তরের অবস্থা মোতাবেক আমল করিতে থাকে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اِنَّ فِيْ جَسَدِ ابْنِ اٰدَمَ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ

বনী আদমের দেহের মধ্যে গোশতের একটি টুকরা রহিয়াছে অর্থাৎ অন্তর। যখন উহা ঠিক থাকে তখন সমুদয় দেহ ঠিক থাকে।

কারণ মুখ ও অন্যান্য অঙ্গের আমলসমূহ আন্তরিক অবস্থার মজবুত নিদর্শন এবং স্থলাভিষিক্ত। ইহাদের দ্বারাই আন্তরিক অবস্থার প্রকাশ হয়। এই জন্য এই দুই কার্যের পর নামাযীর যতগুলি আন্তরিক অবস্থা সামনে আসিবে প্রত্যেকটি আন্তরিক অবস্থা মোতাবেক বাহ্যিক রোকন ও শর্ত নির্ধারণ করা হইয়াছে।

নামাযের হাকীকত

মানুষ যখন আপন পরওয়ারদিগারের পক্ষ হইতে আপতিত কোন বিপদ দূরীভূত করিবার জন্য বা তাঁহার থেকে কোন নিয়ামত লাভের জন্য আবেদন করে তখন তাহার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী কাজ হইল, সে এমন কতগুলি কার্য করে এবং এমন কিছু বাক্য ব্যবহার করে যাহা দ্বারা পরওয়ারদিগারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শিত হয়, যাহাতে সম্মানসূচক কার্য ও বাক্য ব্যবহারের দ্বারা তাহার রূহানী অবস্থারও কিছু প্রভাব আবেদন পেশ করাতে পড়িতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে রূহানী অবস্থার প্রভাবই হইল এই আবেদনের মূল বিষয়। এই কারণেই বৃষ্টির জন্য আবেদন করার নিমিত্ত নামায পড়া সুন্নত করা হইয়াছে। (কারণ ইহাতে এমন সব কার্য করা হয় ও এমন সব বাক্য ব্যবহার করা হয়, যাহা দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শিত হয়।) সুতরাং নামাযের মধ্যে মৌলিক বিষয় তিনটি। (১) আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মর্যাদার দিকে খেয়াল করিয়া আন্তরিকভাবে বিনয়ী হইয়া যাওয়া। (২) আপন স্বইচ্ছায় আগ্রহভরে আল্লাহ পাকের বড়ত্ব এবং স্বীয় বিনয় মুখের দ্বারা প্রকাশ

করা। (৩) এই আন্তরিক বিনয় মোতাবেক স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা। এক কবি বলেন-

اَفَادَتْكُمُ النَّعمَاء منى ثَلَاثَة + يَدِىْ وَ لِسَانِيْ وَ الضَّمِيْرَ المَحجبًا

তোমাদের নিয়ামত আমার তিন অঙ্গকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করিয়াছে। আমার হাত, আমার মুখ ও লুকায়িত অন্তর।

আল্লাহ পাকের প্রতি সম্মানসূচক কার্যাবলীর মধ্যে একটি হইল- তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার সাথে চুপিচুপি কথা বলা। তদাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শনের পন্থা হইল- স্বীয় বিনয় এবং পরওয়ারদিগারের সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার দিকে দৃষ্টি করিয়া মাথা নীচু করিয়া দেওয়া। কেননা মানুষ ও জানোয়ারের মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ানো অহংকার ও দম্ভের নিদর্শন আর মাথা নীচু করিয়া ফেলা বিনয় ও নম্রতার নিদর্শন। ইহা তাহাদের জন্মগত স্বভাব। আল্লাহ পাক বলেনঃ

فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ *

তাহাদের গ্রীবাদেশসমূহ বিনয়ের সাথে এই নিদর্শনের সামনে ঝুঁকিয়া যায়।

ইহা অপেক্ষা আরও অধিক সম্মান প্রদর্শনের পন্থা হইল- তাঁহার দরবারে মাথা মাটিতে রাখিয়া ঘর্ষণ করা অর্থাৎ সিজদা করা। কেননা মানুষের মাথা তাহার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত অঙ্গ। দেহের সবগুলি ইন্দ্রিয় মাথার মধ্যে গিয়া সমবেত হয়।

সম্মান প্রদর্শনের উল্লিখিত পন্থাত্রয় সর্বদা মানুষের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। রাজা-বাদশাহ, আমীর ওমারাহগণকে সম্মান করিতে গিয়া সাধারণ মানুষ এই সকল পন্থা ব্যবহার করিয়া থাকে। সম্মান প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি হইল যাহাতে উল্লিখিত মৌলিক বিষয়ত্রয় বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু ইহাতে সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থার দিকে উন্নতি হইয়া থাকে। ধাপে ধাপে বিনয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাধারণ অবস্থা হইতে উচ্চাবস্থার দিকে উন্নত হওয়ার মধ্যে যে ফায়দা নিহিত রহিয়াছে তাহা শুধু উচ্চ পর্যায়ের সম্মানের মধ্যে বা উচ্চ পর্যায় হইতে নিম্ন পর্যায়ের দিকে

নামিয়া আসার মধ্যে পাওয়া যায় না। নামাযের মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে সম্মান প্রদর্শনের তিন পন্থায়ই বিদ্যমান। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই পদ্ধতির আমলকে নামাযের মধ্যে মূল হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

নামাযের মধ্যে নাভীর নীচে অথবা নাভীর বা বক্ষের উপরে হাত বাঁধিবার ভেদঃ

নাভীর নীচে হাত বাঁধার দ্বারা চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সতর ঢাকার আবেদন করার দিকে ইঙ্গিত করা বুঝায়। নাভীর উপরে হাত বাঁধার দ্বারা হালাল খানাপিনা পাওয়ার দিকে ইঙ্গিত, আর বক্ষের উপর হাত বাঁধার দ্বারা স্বীয় অন্তরকে সত্য এবং হকের উপর কায়েম রাখার এবং অন্তর খুলিয়া দেওয়ার দোয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা বুঝায়।

নোটঃ হানাফী মাযহাব মোতাবেক পুরুষরা নাভীর নীচে আর নারীরা বুকের উপর হাত বাঁধিবে। কোন কোন ইমামের মতে নারী পুরুষ উভয়ে বুকের উপর আর কোন কোন ইমামের মতে উভয়ে নাভীর নীচে হাত বাঁধিবে।

জমাতের সাথে নামায পড়ার সময় দুই নামাযীর মধ্যে ফাঁক রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) লিখিয়াছেন, অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যিকিরের মজলিসে একে অপরের সাথে লাগিয়া এবং জমিয়া বসিলে যিকিরের প্রতি অন্তরের নিবিড়তা ও নিমগ্নতা সৃষ্টি হয়। যিকিরের মজা পাওয়া যায়। বাজে ধারণা হইতে অন্তর মুক্ত হইয়া যায়। আর জমিয়া ও লাগিয়া বসা বর্জন করিলে উল্লিখিত ফায়দাসমূহ হ্রাস পাইতে থাকে। উল্লিখিত ফায়দাসমূহে যতটুকু ত্রুটি হইতে থাকে ততটুকু শয়তানের দখল হইতে থাকে।

নামাযের মধ্যে আদবের সাথে দণ্ডায়মান হওয়ার হেকমত

কোন সাধারণ লোক যখন কোন বাদশাহের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করার জন্য তাহার সামনে দণ্ডায়মান হয় তখন ভীত ও শংকিত অবস্থায়

তাহার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া আদবের সাথে দণ্ডায়মান হওয়ার নিদর্শন। অনুরূপভাবে আল্লাহর দরবারে স্বীয় দেহের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝুঁকাইয়া দণ্ডায়মান হওয়া নিজকে তাঁহার দরবারে আদবের সাথে পেশ করার নিদর্শন। উদাহরণ স্বরূপ পদদ্বয় বরাবর করিয়া, হস্তদ্বয় বাঁধিয়া এবং দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিয়া দাঁড়ানো বাদশাহের সামনে আদব প্রদর্শনের বাহ্যিক প্রকাশ। অনুরূপভাবে নামাযের মধ্যে দুই হাত বাঁধিয়া দাঁড়ানো আল্লাহর অনুগতদের চাহিদা। আল্লাহর অনুগত হওয়ার জন্য তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, বিনয় প্রকাশ করা, আর সিজদা করা পরিপূর্ণভাবে স্বীয় দাসত্ব প্রকাশ করার নিদর্শন।

তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে উভয় হাত উত্তোলন করার ভেদ

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করার মধ্যে নামাযী যেন এই কথা স্বীকার করিতেছে যে, "আমি কোন জিনিসের মালিক নহি, হে আল্লাহ! সব কিছু আপনার। আপনিই সবকিছুর মালিক। আমি খালি হাত, মুখাপেক্ষী ও ফকির। আপনার দান ও ভিক্ষার আশাবাদী ও ভিক্ষুক হইয়া আপনার সামনে খাড়া হইয়াছি।" ইহাতে এই দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আমি সর্বপ্রকার শক্তি ও ক্ষমতা হইতে খালি। সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার আপনিই মালিক। সুতরাং এই কল্যাণকর কার্য অর্থাৎ ইবাদতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

হযরত ইবনে আরবী (রহঃ) বলেন, এই কথা স্বীকার করিয়া আল্লাহর দিকে উভয় হাত উত্তোলন করা হয় যে, "সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য আপনার অধিকারে রহিয়াছে। আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নাই।" সুতরাং আল্লাহু আকবার বলিয়া যখন উভয় হাত উপরে উত্তোলন করিবে তখন সে এই কথা ধারণা করিবে যে- আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু আছে সবকিছু হইতে পৃথক হইয়া সে আল্লাহর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় নারীরা কাঁধ পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করিবার ভেদ

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় নারীদের কাঁধ পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করার

মধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নারীদের মর্যাদা পুরুষের মর্যাদা অপেক্ষা কম। অধিকন্তু এই পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করা তাহাদের পর্দার জন্য উপযোগী।

(ব্যাখ্যাঃ কাঁধ হইতে উপরে হাত উত্তোলন করিলে নারীদের বক্ষ খুলিয়া যাইবে। ইহা তাহাদের পর্দার পরিপন্থী। অধিকন্তু তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় চাদরের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া আনা পুরুষের জন্য সুন্নত। ইহা নারীদের জন্য সুন্নত নয়; বরং এই ক্ষেত্রেও পর্দার খেয়াল করা একান্ত প্রয়োজন। যদি কাপড়ের নীচ হইতে হাত বাহির করিয়া কান পর্যন্ত উত্তোলন করে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য কষ্টকর হইবে। অধিকন্তু মুখের ও নাকের উপর রাখা কাপড় ও হাতের নীচের অংশ খুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি কাঁধ পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করে তাহা হইলে এইসব অসুবিধা হইবে না।)

নামাযের মধ্যে হাত বাঁধিয়া খাড়া হওয়ার কারণ

নামাযের মধ্যে হাত বাঁধিয়া খাড়া হওয়া যাচঞ্চা, মুখাপেক্ষিতা, মিসকীনী অবস্থা, অক্ষমতা, অসহায়তা, মিনতি ও অপদস্থতার দিকে ইঙ্গিত করা। কেননা নামায আল্লাহ পাকের বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম। নামাযে হাত বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হওয়ার মধ্যে বাদশাহের দরবারে দণ্ডায়মান ঐ সকল গোলাম ও চাকর-বাকরদের সাথে সাদৃশ্য পয়দা হয়, যাহারা বাদশাহের সম্মান, মর্যাদা ও পরাক্রমশালিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাহার সামনে হাত বাঁধিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকে। আর এই অবস্থায় বিনয় ও মিনতির সাথে আবেদন করা হয়। এই জন্যই اهدنا শব্দের দ্বারা হেদায়েতের দোয়া করিবার পূর্বে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা হয়। এই জন্য বাদশাহদের কাছে কোন কিছু যাচঞ্চা করিবার সময় যে অবস্থা অবলম্বন করিতে হয় নামাযের মধ্যেও অনুরূপ অবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যেই নামাযের মধ্যে হাত পা জড়সড় হইয়া যায়। অমনোযোগী হওয়া যায় না। আপাদমস্তক আদবের সহিত খাড়া হইতে হয়।

মোটকথা; নামাযের মধ্যে হাত বাঁধিয়া খাড়া হওয়া মানবের স্বভাবজাত কানুনের আলোকেও বন্দেগীর জন্য খুব উপযোগী।

নামাযের মধ্যে এই দিক সেই দিক দৃষ্টি করা অথবা মানুষের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন,

لَا يَزَالُ اللّٰهُ تَعَالٰى مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَ هُوَ فِي صَلٰوتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِت فَاِذَا اِلْتَفَت اَعْرَضَ عَنْهُ

বান্দা যখন নামায পড়িতে থাকে তখন আল্লাহ পাক তাহার দিকে দৃষ্টি রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে এইদিক সেইদিক না দেখে। কিন্তু যখন এইদিক সেইদিক দেখে তিনি তাহার দিক হইতে ফিরিয়া যান। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমতের দৃষ্টি তাহার থেকে ফিরিয়া যায়। (আবু দাউদ)

হাদীছের সারকথা হইল যে, যখন কোন বান্দা আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে তখন তাহার জন্য আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও ক্ষমার দরজা খুলিয়া যায়। আর বান্দা যখন তাঁহার প্রতি অমনোযোগী হইয়া পড়ে, তাঁহার থেকে ফিরিয়া যায় তখন সে আল্লাহর রহমত থেকে শুধু বঞ্চিতই হয় না বরং অমনোযোগিতার কারণে সে আল্লাহর আযাব পাওয়ার যোগ্য হইয়া যায়।

যখন কেহ কোন রাজা বা বাদশাহের দরবারে যায় তখন তাহার সামনে দাঁড়াইয়া এইদিক সেইদিক খেয়াল করে না, অন্য কাহারও সাথে কথা বলে না বা দরবারে করার উপযুক্ত নয় এমন কাজও করে না। তাহা হইলে আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়াইয়া এমন কাজ করা কিভাবে সঙ্গত হইতে পারে? এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَمْسَحُ الحَصى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ

"তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযে খাড়া হওয়ার পর কঙ্করী পরিষ্কার করিবে না। কেননা আল্লাহর রহমত তাহার সম্মুখে উপস্থিত।

অন্য এক হাদীছে আসিয়াছে যে,

اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوة لَا يَصْلَحُ فِيْهَا شَئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَ التَّكْبِيْرُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ *

নামাযের মধ্যে কথাবার্তা দুরস্ত নহে। নামায তো তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তিলাওয়াত। (মুসলিম)

নামাযের মধ্যে ছানা পড়ার কারণ

১। সুবহানাকাল্লাহুম্মা দোয়াটি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রবেশকালীন সালাম।

(নোটঃ কোন দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় ঐ দরবারের মর্যাদা মোতাবেক দীর্ঘ ও প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী সম্বলিত সালাম পেশ করিতে হয়। আর ছানা আল্লাহ পাকের দরবারের শান মোতাবেক সালাম।)

২। মানবের স্বভাব হইল যে, যখন কোন উচ্চ মর্যাদাশীল আমীরের কাছে কোন জিনিসের যাচঞ্চা করে এবং তাঁহার থেকে কোন প্রয়োজন মিটাইতে ইচ্ছা করে তখন সে প্রথমে আমীরের প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার বড়ত্ব ও মহত্ব এবং স্বীয় অসামর্থ্যতা ও দরিদ্রতার কথা বর্ণনা করিয়া স্বীয় প্রয়োজন ও অভাবের কথা তাহার সামনে প্রকাশ করে। ছানার মধ্যে এই পন্থাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে মানুষ আল্লাহ পাকের মহত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে এবং নিজের অসহায়ত্ব ও অসামর্থ্যতা সম্পর্কে সজাগ হইতে পারে এবং নিজে আন্তরিকভাবে আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণভাবে হাজির হইতে ও বিনয়ী হইতে পারে।

নামাযের সূচনাতে ছানার পর আউযুবিল্লাহ পড়িবার রহস্য

নামাযে ছানার পর আউযুবিল্লাহ পাঠ করা এই জন্য নির্ধারিত হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক বলিয়াছেন,

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ *

যখন তুমি কুরআন পাঠ করিবার ইচ্ছা কর তখন অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণার জাল থেকে আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যেহেতু সুরায়ে ফাতিহা কুরআনের অংশ। তাই সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করাব পূর্বে ছানার পরে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা হয়।

বিসমিল্লাহ সূরায়ে ফাতিহার পূর্বে পাঠ করার কারণ

বিসমিল্লাহ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার আগে পাঠ করার ভেদ হইল এই যে, আল্লাহর বান্দাগণ কুরআন পাঠ করিবার পূর্বে যাহাতে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া বরকত হাসিল করিতে পারে।

নামাযের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার রহস্য

নামাযের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহা এই জন্য পড়া হয় যে, সূরা ফাতিহা একটি পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ দোয়া। আল্লাহ পাক ইহা স্বীয় বান্দাদের পক্ষ হইতে নাযিল করিয়াছেন, যেন ঘোষণা করিতেছেন যে, আমার বান্দারা এইভাবে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, শুধু আমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে। আর একমাত্র আমার ইবাদত করিবে বলিয়াই অঙ্গীকার করে। অনুরূপভাবে এমন এক রাস্তায় চলার জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করে যাহা কল্যাণ ও মঙ্গলের ধারক ও বাহক। আর যাহাদের প্রতি আমার গোস্বা রহিয়াছে, যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে– তাহাদের পথ অবলম্বন করা হইতে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ দোয়া হইল সর্বোত্তম দোয়া। সুরায়ে ফাতিহা পরিপূর্ণ ও সারগর্ভ দোয়া এই জন্য যে, ইহাতে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও গুণকীর্তন রহিয়াছে। অতঃপর তাঁহার ব্যাপক প্রতিপালন, তাঁহার ব্যাপক ও বিশেষ রহমত, তাঁহার মালিকানা এবং শাস্তি প্রদান ও পুরস্কার প্রদানের পরিপূর্ণ ক্ষমতার কথা আলোচনা করিয়া তাঁহার কাছে হেদায়েতের জন্য দোয়া করিতে বলা হইয়াছে।

সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর ভেদ

সূরায়ে ফাতিহা প্রকৃতপক্ষে দরখাস্ত ও প্রার্থনা। ইহার পর কুরআনের অন্য যে কোন সূরা পাঠ করা এই প্রার্থনা ও দরখাস্তের জবাব। ইহাতে সর্বপ্রকার মানবিক সফলতার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ *

(হে আল্লাহ! আমাকে সরল সোজা পথে হেদায়েত দান করুন)- এই প্রার্থনার পরে যখন অন্য এক সূরা পাঠ করা হইল তখন বুঝা গেল যে, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূরা হইয়াছে। তাহার আকাঙক্ষা পূরা হইয়াছে। কেননা কুরআন সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ *

কুরআন ঐ কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত।

যেহেতু তাহার প্রার্থনা ও আবেদন পুরা হইয়াছে তাই ইহার শুকরিয়া স্বরূপ আদব প্রদর্শন করা তাহার অপরিহার্য দায়িত্ব। আর এই আদব হিসাবে রুকু ও সিজদা করা হয়। আল্লাহ পাকের কাছে বান্দার হেদায়েত প্রার্থনা করার উদাহরণ যেমন, এক রোগী চিকিৎসকের কাছে স্বীয় রোগের চিকিৎসার আবেদন করিতেছে। বান্দার মধ্যে রোগ হইল- তাহার অনোপযোগী ও ভিত্তিহীন আমল এবং বাতিল আকিদা। সে যেন সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করিয়া আল্লাহ পাকের কাছে এইসব রোগ হইতে মুক্তি চাহিতেছে। আর আল্লাহ পাক যেন তাহার চিকিৎসার প্রতি পথপ্রদর্শন করিতেছেন যে, তোমার রোগসমূহের প্রতিষেধক আমার কালাম হইতে গ্রহণ কর। ইহার একাংশ পাঠ কর। ইহা এমন এক ঔষধ যাহা সাধারণ রোগ, অপরাধ, অশ্লীল কার্য, লৌকিকতা প্রদর্শন, শিরক, অহংকার, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি রোগের জন্য পরিপূর্ণ নিরামক। কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা তুমি স্বীয় রোগগুলির পরিপূর্ণ ঔষধ পাইবে।

এই জন্যই নামাযী সুরায়ে ফাতিহার পর কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে, যেন সূরায়ে ফাতিহা চিকিৎসকের সামনে স্বীয় অবস্থা বর্ণনার তুল্য। আর ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা পাঠ করা চিকিৎসক কর্তৃক রোগের ঔষধ প্রদান করা। অতঃপর রুকু সিজদা করার মাধ্যমে ঔষধ প্রদানের শুকরিয়া আদায় করিয়া ঔষধ কবুল করিয়া লয়।

রুকু সিজদার হাকীকত

১। কোন বান্দা আপাদমস্তক মনিবের অনুগত থাকার পর মনিবের কাছে কোন জিনিস যাচঞা করিবার সময় এবং তাহার আবেদন পুরা হওয়ার পর সুসংবাদ পাওয়ার সময় বান্দার মধ্যে অবস্থার সৃষ্টি হয় রুকু এবং সিজদা বান্দার এই দুই অবস্থার উপর নির্দেশ করে। এই সম্বন্ধে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

২। কোন রাজা-বাদশাহ বা সম্রাটের পক্ষ হইতে প্রজাদের কাছে যখন কোন নির্দেশনামা আসে আর তাহাদিগকে ইহা পাঠ করিয়া শুনানো হয় তখন নির্দেশনামা পাওয়ার আর নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাহারা ইহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নমুনা প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে নামাযের মধ্যে আহকামুল হাকিমীন, সকল বাদশাহের বাদশাহ আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে নির্দেশনামা হিসাবে কুরআন পাঠ করা হইল। সুতরাং এই নির্দেশনামা শুনার পর ইহাতে উল্লিখিত নির্দেশগুলি পালন করিবার স্বীকৃতি হিসাবে ঝুঁকিয়া গিয়া রুকু ও সিজদা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ রুকু সিজদা করিতে ঝুঁকিয়া যাওয়া পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং রুকু সিজদা আল্লাহ পাকের ঐ নির্দেশের প্রতি অনুগত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে যাহা তাহাদিগকে পড়িয়া শুনানো হইয়াছে।

৩। আল্লাহ পাকের বড়ত্বের খেয়াল করার পর নিজের ক্ষুদ্রতার যে প্রভাব বান্দার অন্তরে প্রতিফলিত হয়, আর এই প্রভাবের ফলে বান্দার মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় বান্দার দেহে এই অবস্থার পরিপূর্ণ বাহ্যিক প্রকাশ হইল বান্দা আল্লাহ পাকের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়া। শরয়ী পরিভাষায় ইহাকে রুকু বলা হয়।

অতঃপর তাঁহার সীমাহীন মর্যাদার বদ্ধমূল বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিবার পর আর বান্দার নিজের নিম্ন মর্যাদার কথা কল্পনা করার পর তাহার অন্তরে যে এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, বান্দা নিজের দৈহিক কর্ম ও অবস্থার দ্বারা এই আন্তরিক অবস্থার প্রকাশ ঘটাইয়া থাকে তাহার মুখ ও মাথা মাটিতে রাখার মাধ্যমে আর স্বীয় নাক মাটিতে ঘর্ষণ করার মাধ্যমে। কেননা মুখমণ্ডল ও মাথা মানবদেহের সর্বাধিক সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই বান্দার এই অবস্থা প্রকাশের জন্য এই অঙ্গদ্বয় ব্যবহার করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় ইহাকে সিজদা বলা হয়।

৪। নামাযের মধ্যে বান্দা খোদার সামনে দণ্ডায়মান হয়। নামাযের প্রথমাংশ হইল কেয়াম। ইহা সেবক সেবিকার আদব কায়দার মধ্যে একটি আদব। অতঃপর নামাযে রুকু করা হয়। ইহা দ্বিতীয় অংশ। আল্লাহর নির্দেশের সামনে বান্দা কি পরিমাণ মাথা অবনত করে রুকুর দ্বারা ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর সিজদা– ইহা তৃতীয় অংশ। ইহার দ্বারা পরিপূর্ণ আদব, পরিপূর্ণহীনতা এবং আমিত্বহীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। আর ইহাই ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহর বড়ত্বের প্রতি সম্মান প্রকাশক এইসব দৈহিক আমল ও আদব অন্তরের দ্বারা আল্লাহর বড়ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের স্মারক কর্ম হিসাবে এবং দেহকে আন্তরিক অবস্থার অংশীদার বানানোর জন্য নির্ধারিত হইয়াছে।

নামাযের মধ্যে দুই সিজদা করার হেকমত

বান্দা প্রথম সিজদা করে এই কথা প্রকাশ করার জন্য যে, সে মাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। আর দ্বিতীয় সিজদা করে এই দিকে নির্দেশ করার জন্য যে, সে পুনরায় মাটিতেই প্রত্যাবর্তন করিবে।

নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার রহস্য

মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব হইল যে, কোন ওয়ায়েজের মাত্র একবার নসীহতের দ্বারা তাহার অন্তর খুব একটা প্রভাবিত হয় না। অনুরূপভাবে বিভিন্ন পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া মানুষের অন্তরে যে মরীচা পড়ে তাহাও মাত্র একবার আখেরাত স্মরণ করাইয়া দেওয়ার দ্বারা দূর হয় না। আর ইহা বাস্তব যে, কোন বস্তুতে মরীচা পড়িলে রেত দ্বারা মাত্র একবার ঘর্ষণ করিলেই মরীচা দূর হইয়া পরিষ্কার হয় না। বরং বার বার রেত দ্বারা ঘর্ষণ করার প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে সূরায়ে ফাতিহাও মারাত্মক মারাত্মক রূহানী রোগের মরীচার জন্য রেত বিশেষ। এই জন্যই ইহা নামাযে বার বার পড়া হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাতে, জুমা, দুই ঈদের নামাযে এবং হজ্জব্রত পালনে মুসলমানদের সমবেত হওয়ার হিকমত

আশেপাশের লোকেরা প্রাতদিন পাঁচবার এক স্থানে সমবেত হওয়া অতঃপর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এবং পায়ে পা মিলাইয়া একই সত্য উপাস্যের

সামনে কাতার বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হওয়া জাতীয় ঐক্যের কত সুন্দর ব্যবস্থা?

অতঃপর সপ্তাহে শুক্রবারে আশে পাশের ছোট ছোট গ্রামের এবং বস্তির লোকজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হইয়া একটি বড় মসজিদে একত্রিত হয় আর একজন আলেম সম্প্রদায়ের প্রয়োজন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় খুতবা পাঠ করে। আর এই খুৎবাতে আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণণা করে।

অতঃপর দুই ঈদের দিনে বৎসরে দুইবার অনতিদূরের শহরের লোকজন একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়। আর নিজেদের পথপ্রদর্শক মহানবীর একটি আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট জমাতে পরিণত হইয়া বিশ্বকে ইসলামী সূর্যের উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করিতে থাকে।

অতঃপর জীবনে একবার দুনিয়ার খোদা–প্রেমিকরা ঐ মহান পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত হয় যেখান থেকে সর্বপ্রথম তাওহীদের আলো চমকিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বনিখিলের বিভিন্ন ভূখণ্ডে যে সকল মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে সেদিন তাহারা সে মল্লভূমিতে উপস্থিত হয়। সেখানে তাহারা সেদিন শুধু মাটি পাথর দ্বারা প্রস্তুত ঘরের প্রশংসা করে না বরং মহান প্রতিপালক সকলের উপাস্য মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে, যিনি এই পবিত্র ভূমি হইতে তাওহীদের আজীমুশ্‌শান অতুলনীয় প্রবক্তা বিশ্বনিখিলের পথপ্রদর্শকের জন্ম দিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে প্রতি বৎসর বিভিন্ন জাতির লোকজন এই স্মারক (বায়তুল্লাহ) প্রত্যক্ষ করিয়া এক নবউদ্দীপনা ও আবেগ এবং অন্তরের মধ্যে ঈমানের সতেজতা লাভ করিয়া থাকে। আর ইহা এমন একটি স্মারক ও নিদর্শন যাহা প্রত্যক্ষ করিলে স্বভাবতঃই মানুষের মধ্যে আবেগ ও উদ্দীপনা এবং ঈমানের সতেজতা জন্ম লাভ করিয়া থাকে।

কাবার প্রতি মুসলমানদের সম্মান প্রদর্শন দেখিয়া যদি কেহ মুসলমানের ন্যায় বিশুদ্ধ তাওহীদপন্থীদের উপর মাখলুক পূজার অপবাদ নিক্ষেপ করার প্রয়াস চালায় তাহা হইলে ইহা হইবে তাহার নিরেট মুর্খতার পরিচায়ক। অপবাদ নিক্ষেপের প্রয়াসী এই ব্যক্তিকে মানবীয় স্বভাবের সাধারণ প্রবণতা ও আবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ব্যাপারে কদম রাখা উচিত। অধিকন্তু বায়তুল্লাহ এমন এক ঘর যাহা অপরিহার্যভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

নিঃসন্দেহে মুসলমান জাতি কুরআনের প্রতি নির্ভেজাল ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে। যদি তাহাদের স্বভাবে প্রতিমা পূজার বা মাখলুক পূজার কোন সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে মুক্তির মহান দিশারী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর অপেক্ষা অধিক পূজার্থ আর কোন জিনিস ছিল? আল্লাহ পাক পবিত্র মক্কা ভূমিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমাহিত করিতে দেন নাই, যাহাতে আল্লাহর তাওহীদের এই উৎসভূমি সর্বপ্রকার সন্দেহ ও সম্ভাবনাময় ধারণার ধূলিবালি হইতেও পবিত্র থাকে। আর মাখলুকের অস্বাভাবিক সম্মান প্রদর্শনের সম্ভাবনাও উঠিয়া যায়।

নামাযের মধ্যে রুকুর পর সোজা হইয়া দাঁড়ানো (কাওমা) নির্ধারিত হওয়ার কারণ

নামাযী যখন সিজদা করিতে ইচ্ছা করে– তখন সিজদা পর্যন্ত পৌছার জন্য তাহাকে অবশ্যই ঝুঁকিতে হয়। আর এই ঝুঁকা রুকুর ঝুঁকা না হওয়া চাই; বরং এক নতুন ঝুঁকা হওয়া চাই, যাহা সিজদা পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম হয়। এই জন্য রুকু এবং সিজদার মধ্যে তৃতীয় একটি আমল হওয়া চাই যাহা রুকু সিজদা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়, যাহাতে রুকু হইতে সিজদাকে আবার সিজদা হইতে রুকুকে পৃথক করা যায় আর উভয় স্বতন্ত্র দুইটি আমল হিসাবে প্রকাশ পায়। অধিকন্তু ইহাদের প্রত্যেকের জন্য যাহাতে নামাযীর পৃথক নিয়ত হয় এবং সে প্রত্যেকের পৃথক প্রভাব অনুভব করার ব্যাপারেও সতর্ক হইতে পারে। এই তৃতীয় আমলটির নাম কাওমা।

নামাযের মধ্যে দুই সিজদার মাঝে বসার (জলসার) কারণ

দুই সিজদা একে অপর থেকে তখনই পৃথক হইতে পারে যখন উভয়ের মধ্যে তৃতীয় আর একটি আমল প্রতিবন্ধক হিসাবে মাঝখানে আসে। এই জন্যই দুই সিজদার মাঝখানে জলসা নির্ধারিত করা হইয়াছে। যেহেতু স্থিরতা ব্যতীত কাওমা ও জলসা এক প্রকার খেলতামাশা এবং নামাযীর অস্থিরতার নিদর্শন। খেলতামাশা ও অস্থিরতা ইবাদতের মর্যাদার পরিপন্থী হেতু কাওমা ও জলসা স্থিরতার সাথে আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রুকু সিজদার সময় বার বার তাকবীর বলার ভেদ

১। ঝুঁকিয়া পড়া ও উঠিয়া যাওয়ার সময় প্রত্যেকবার তাকবীর বলার ভেদ হইল– আল্লাহ পাকের মর্যাদা ও বড়ত্ব সম্পর্কে বার বার নিজকে সতর্ক করা আর স্বীয় হীনতা ও অসামর্থ্যতার প্রতি নিজকে মনোযোগী করিয়া তোলা।

২। দ্বিতীয় হেকমত এই যে, নামাযের জামাতে ইমামের পিছনে দাঁড়ানো মুক্তাদীরা তাকবীর শুনিয়া বুঝিতে পারে যে, ইমাম এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার দিকে যাইতেছে।

যোহর ও আছরের নামাযে নীরবে কেরাত পাঠ করা আর অপর তিন নামাযে উচ্চ স্বরে কেরাত পাঠ করার কারণ

যোহর এবং আছরের নামাযে নীরবে আর মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা নির্ধারিত হওয়া খুব যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবোযোগী এবং আল্লাহ পাকের হেকমতের মোয়াফেক হইয়াছে। কারণ মাগরিব, ইশা আর ফজরের সময় মানুষ সাধারণতঃ বিভিন্ন ব্যস্ততা, কথাবার্তা, শোরগোল এবং নাড়াচাড়া হইতে চুপচাপ থাকে। এই সময় শান্তি ও আরাম অনুভব করিয়া থাকে। আর চিন্তা ফিকির ও পেরেশানী খুব কম থাকে। তাই এই সময় কুরআন তাহাদের অন্তরে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কেননা অন্তর চিন্তা ফিকির ও পেরেশানী হইতে খালি ও মুক্ত থাকার ফলে এবং শোরগোল, আওয়াজ, চলাফেরা প্রভৃতি না হওয়ার কারণে কান কুরআন শ্রবণ করার জন্য আর অন্তর ইহা বুঝার জন্য খুব প্রস্তুত থাকে। এই জন্যই রাত্রে কোন কথা বলা হইলে তাহা কর্ণভেদ করিয়া সোজা অন্তরে গিয়া বসে এবং অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আল্লাহ পাক কুরআন করীমে এইদিকে ইঙ্গিত করিতেছেনঃ

اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلاً *

রাত্রে জাগ্রত হওয়ার ফলে নফস খুব ভালভাবে দলিত হয় এবং রাত্রের কথা অন্তরে খুব প্রভাব বিস্তার করে এবং বদ্ধমূল হইয়া বসিয়া যায়।

ইহা একটি সর্বসম্মত বাস্তব এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, সুন্দর স্বরবিশিষ্ট মানুষ, পক্ষী, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির রাত্রের আওয়াজ মানুষের অন্তরে দিনের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় এবং মর্মস্পর্শী হয়। তাই এই সময়ে উচ্চস্বরে কেরাত পড়ার নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহাতে ইহা অন্তরের কাছে অধিক মর্মস্পর্শী হয়।

অনুরূপভাবে যোহর ও আছরের নামাযে কুরআন নীরবে পাঠ করার হেকমত হইল দিনের বেলায় বাজারে এবং ঘরের মধ্যে বিভিন্ন রকম শোরগোল ও আওয়াজ হইতে থাকে। এই জন্য যোহর ও আছরের সময়ে ব্যস্ততা, শোরগোল, বিভিন্ন কাজকর্ম ও চিন্তা–ফিকিরের কারণে অন্তর শান্তি ও আরামে থাকে না। এই কারণেই কোন কথার দিকে ভালভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে না। তাই এই সময়ে উচ্চস্বরে কেরাত পড়ার নীতি নির্ধারণ করা হয় নাই। কুরআন কারীমেও এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে–

اِنَّ لَكَ فِيْ النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً *

দিনের বেলায় আপনার অনেক বড় বড় ব্যস্ততা থাকে।

এই সময় কুরআনের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে রাত্রে অন্তর ও জিহবার মধ্যে আর জিহবা ও কানের মধ্যে পূর্ণ আনুকূল্য পাওয়া যায়। এই কারণেই ফজরের নামাযে অন্যান্য নামায অপেক্ষা লম্বা কেরাত পাঠ করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাট হইতে একশত আয়াত পর্যন্ত ফজরের নামাযে পাঠ করিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফজরের নামাযে সূরায়ে বাকারা পাঠ করিতেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সূরায়ে নমল, সূরায়ে হুদ, সূরায়ে বনী ইসরাইল, সূরায়ে ইউনুস প্রভৃতি লম্বা লম্বা সূরা পাঠ করিতেন। এই নামাযে অধিক লম্বা কেরাত পাঠ করার নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে এই জন্য যে– নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অন্তর সর্বপ্রকার পেরেশানী হইতে মুক্ত থাকিয়া কুরআন শ্রবণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। অধিকন্তু প্রত্যুষে সর্বপ্রথম যে আওয়াজ কানের ভিতর দিয়া সরাসরি অন্তরের মধ্যে পতিত হয় তাহা আল্লাহর কালাম হওয়াই সঙ্গত। কেননা আল্লাহর কালামে মানুষের জন্য নিছক মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে ভরপুর বরকত।

এই জন্য এই সময় এই কালাম সরাসরিভাবে কোন প্রকার বাধাগ্রস্ত না হইয়া অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

জুমআ ও উভয় ঈদের নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করার কারণ

যখন দিনের বেলায় এমন কোন নামায পড়িতে হয় যাহা নামায হওয়া ব্যতীতও দ্বীনের প্রচার, শিক্ষা, নসিহত, আযাবের ভয় প্রদর্শন এবং ধর্মোপদেশ প্রভৃতির মাধ্যম হয় এমন নামাযে দিনের বেলায়ও উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করার নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ জুমার নামায, উভয় ঈদের নামায, বৃষ্টি প্রার্থনা করার জন্য নামায প্রভৃতিতে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করিতে হয়। কোন কোন ইমামের মতে সূর্য গ্রহণের সময় পঠিত নামাযেও উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করিতে হয়। কেননা এই সময় নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করিলে মানুষের সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্যের মধ্যে ফায়দা হয়। অর্থাৎ এই সময় সমবেত হওয়ার মধ্যে নামায পড়া ব্যতীতও তাহাদের কাছে দ্বীনের আহকামের প্রচার এবং তাহাদিগকে দ্বীনের আহকাম শিক্ষা দেওয়া এবং এই সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং এই সময় উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করিলে উল্লিখিত উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়। কেননা এই সময় সাধারণ মানুষের বড় বড় দলকে আল্লাহ পাকের কথা শুনাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের কাছে আহকামের প্রচার করা হয়। এই ধরনের সমাবেশে এইরূপ করা হয়– এই জন্য যে, এই ধরনের সমাবেশ সর্বদা হয় না বরং এক দীর্ঘ সময় পরে পরে হইয়া থাকে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এইসব নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করার নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত বিষয়টি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাইয়ূম (রহঃ) বলিয়াছেন, এইসব নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করিবার নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহাতে মানুষ কুরআন সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করার সুযোগ পায় এবং ইহার মধ্যে কুরআনের মর্যাদাও পাওয়া যায়।

জুমআ ও দুই ঈদের নামাযে খুৎবা পাঠ করার রহস্য

জুমআ, দুই ঈদের নামাযে, বৃষ্টি প্রার্থনা করিবার জন্য নামাযে এবং সূর্য গ্রহণের সময় পঠিত নামাযে খুৎবা পাঠ করার নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে,

যাহাতে যাহারা খুৎবাতে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অবগত নয়– তাহা সম্পর্কে অবগত হইতে পারে। তাহাদের কাছে ইসলামের প্রচার ও শরিয়তের আহকামের উপদেশ প্রদান যথাযথভাবে হয়। আর যাহারা পূর্ব হইতে এই সম্পর্কে অবগত রহিয়াছে কিন্তু স্বীয় জ্ঞান মোতাবেক আমল করা হইতে গাফেল রহিয়াছে– তাহাদের জন্য এই খুৎবা সতর্ককারক ও স্মারক হয়।

প্রত্যেক দুই রাকাতের পর তাশাহহুদ পড়া নির্ধারণ হওয়ার কারণ

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নামায দুই রাকাত করিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। দুই রাকাতের পর অবশিষ্ট রাকাতগুলি নামাযকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য। তাই প্রত্যেক দুই রাকাতের পর তাশাহুদ পড়ার নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহাতে মূল নামায ও অতিরিক্ত নামাযের মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায়। আর এই পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রথম দুই রাকাতে সূরায়ে ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা মিলাইয়া পড়া অপরিহার্য করা হইয়াছে। আর শেষ দুই রাকাতে অন্য কোন সূরা মিলানো অপরিহার্য করা হয় নাই।

তাশাহহুদ পড়ার জন্য বৈঠক নির্ধারণ করার কারণ

খোদায়ী নির্দেশনামা পাঠ করা শেষ হওয়ার পর খোদায়ী দরবারে বসিয়া যাওয়ার অনুমতি হয়। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমার জন্য হাদিয়া স্বরূপ কি আনিয়াছ? তখন সে নতজানু হইয়া বসিয়া ইহা প্রকাশ করে যে, "হে খোদা! আন্তরিক সম্মান, দৈহিক ইবাদত এবং সম্পদগত ইবাদত পাওয়ার হকদার তো একমাত্র আপনিই। আর একমাত্র আপনার দরবারই এইসব পেশ করার যোগ্য। এইজন্য আমার দেহ ও সমস্ত মাল এই উদ্দেশ্যে আপনার সামনে হাযির।"

তাশাহহুদ পাঠের বৈঠকে থাকিয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)—কে সালাম দেওয়া নির্ধারিত হওয়ার কারণ

নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ করার দ্বারা অন্তর সতর্ক রাখা। তাঁহার রিসালাতের স্বীকৃতি

প্রদান করা। ইসলাম গ্রহণের ফলে যে নিয়ামত লাভ হইয়াছে উহার এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন প্রচারের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। অধিকন্তু তাঁহার শুকরিয়া আদায় করার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি সালাম প্রদান করা হয়। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ *

যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না– সে খোদারও শুকরিয়া আদায় করিতে পারে না।

নামাযে তাঁহার প্রতি সালাম প্রদান করার দ্বারা তাঁহার এহসান ও অনুগ্রহের কিছু হক আদায় হয় হেতু নামাযে তাঁহার প্রতি সালাম প্রদানের নীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে।

তাশাহহুদের বৈঠকে থাকিয়া সাধারণ মুমিনদের ও নেককারদের প্রতি সালাম প্রদান নির্ধারণ হওয়ার হেকমত

তাশাহহুদের মধ্যে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ আমাদের উপরও আল্লাহর নেককার বান্দাদের প্রতি সালাম।" এই দোয়াটি রহিয়াছে। ইহাতে সকল মুমিনদিগকে সালাম দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন বান্দাদের মুখ হইতে এই দোয়াটি বাহির হয় তখন আসমান যমীনের সকল মুমিন বান্দাদের কাছে সালাম পৌঁছিয়া যায়। এখানে সালামের ব্যাপকতা দেওয়া হইয়াছে, স্বজাতির সহমর্মিতার হক আদায় করিবার জন্য।

তাশাহহুদ পাঠ করার সময় শাহাদত আঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করার হেকমত

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, তাশাহহুদ পড়ার সময় আংগুল উত্তোলন করার মধ্যে তৌহিদের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর ইহার দ্বারা মৌখিক স্বীকৃতি আর অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আমলের মধ্যে আনুকূল্য পাওয়া যায়।

কারণ তাশাহহুদের মধ্যেও তাওহীদের আলোচনা রহিয়াছে। অধিকন্তু আঙ্গুলি উত্তোলন দ্বারা তাওহীদের মর্মকথার চিত্র সামনে ফুটিয়া উঠে।

নামাযে অপছন্দ কর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত

নামাযে এমনসব কার্য করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহা মাহাত্ম্য ও ভাল ভাল অভ্যাসের নিদর্শন এবং বিবেকবান ব্যক্তির কাছে পছন্দ হয়। পক্ষান্তরে নামাযে এমনসব অভ্যাস ও কর্ম প্রকাশ হওয়া সঙ্গত নয় যাহা বিবেকহীন পশুর অভ্যাস বলিয়া পরিচিত। যেমন, মুরগীর ন্যায় ঠোকর মারা, কুকুরের ন্যায় বসা, শিয়ালের ন্যায় মাটির উপর শয়ন করা, উটের ন্যায় বসা, হিংস্রপশুর ন্যায় হাত মাটিতে বিছাইয়া দেওয়া।

অনুরূপভাবে এমন আকৃতিও ধারণ করা সঙ্গত নয়; যাহা অহংকারী লোকের আকৃতি অথবা এমন লোকের আকৃতি যাহার উপর আযাব নাযিল হইতেছে। এই ধরনের আকৃতি অবলম্বন করা উচিত নয়। যেমন, কোমরের উপর হাত রাখিয়া খাড়া হওয়া।

তাশাহহুদের পর দরূদ ও দোয়া পড়ার রহস্য

তাশাহহুদের পর দোয়া পড়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নামাযীর কাছে যে দোয়া পছন্দ হয়– সে তাহা করিতে পারে। কেননা নামায সমাপ্ত করার সময় দোয়া করার সময়। কারণ নামায পড়ার কারণে আল্লাহর রহমত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছে। আর যখন বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হইতে থাকে তখন তাহার দোয়া কবুল করা হয়। দোয়ার আদব হইল যে, দোয়া করার পূর্বে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা। তাঁহার গুণকীর্তন করা। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিলা দিয়া দোয়া করা। অর্থাৎ তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালামের হাদিয়া প্রেরণ করা, যাহাতে দোয়া কবুল হয়। অতঃপর নিজের জন্য, পিতামাতার জন্য, সমস্ত মুসলমানের জন্য মাগফিরাতের দোয়া এবং তাহাদের জন্য হিদায়াতের ও দ্বীনের অন্যান্য প্রয়োজনাদির জন্য দোয়া করিয়া নামায সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ডানে ও বামে "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিয়া সালাম ফিরাইয়া নামায থেকে অবসর গ্রহণ করা।

সালামের দ্বারা নামায সমাপ্ত করিবার কারণ

ডানে–বামে সালাম ফিরানের মধ্যে এই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, নামাযের সময় আমি এই জগত ছাড়িয়া বাহিরে অন্য কোথায়ও চলিয়া গিয়াছিলাম। আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া আসিয়াছি। তাই আগন্তুকের ন্যায় প্রত্যেককে সালাম করিতেছি। কবি বলেন–

جاں سفر رفت و بدن اندر قیام + وقت رجعت زاں سبب گوید سلام

"রূহ সফরে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু দেহ স্বস্থানেই রহিয়াছে। এই কারণে প্রত্যাবর্তনের সময় সালাম বলিয়াছে।"

ফরজ নামাযের পূর্বে ও পরে সুন্নত নামায পড়ার কারণ

দুনিয়ার কাজ কারবার মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ভুলাইয়া দেয়। সুতরাং এমন একটি জিনিসের প্রয়োজন দেখা দিল যাহা বান্দার অন্তরকে এইসব ঝামেলার আবর্জনা থেকে পাকসাফ করিয়া দেয়।

আর এই উদ্দেশ্যে ইহাকে ফরয নামাযের পূর্বে ব্যবহার করা অপরিহার্য। যাহাতে ফরজ শুরু করার পূর্বে সে সর্বপ্রকার ঝামেলামুক্ত হইতে পারে। আর একটি পাক সাফ স্বচ্ছ অন্তর লইয়া ফরয নামায শুরু করিতে পারে। ইহার দ্বারা নামাযের মধ্যে তাহার অন্তর বসিবে। তাই এই উদ্দেশ্যে ফরয নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া বৈধ করা হইয়াছে। অনেক সময় মানুষ খুব তাড়াতাড়ি নামায পড়িয়া ফেলে। নামাযের সমস্ত আদবের খেয়াল করিতে পারে না। ফলে সে নামাযের দ্বারা পূর্ণ উপকার লাভ করিতে পারে না। সুতরাং ফরয নামাযের পরে সুন্নত নামায নির্ধারণ করা হইয়াছে ফরয নামাযের ক্ষতিপূরণ করার জন্য। ফরয নামায পড়ার সময় তাহার নামাযে যেসব দুর্বলতা দেখা দিয়াছে সুন্নত নামাযের মাধ্যমে তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

চার রাকাতবিশিষ্ট নামাযের শেষ দুই রাকাতে সূরা মিলানো হয় না কেন?

প্রথমে প্রত্যেক নামাযে মাত্র দুই রাকাত করিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। পরে আল্লাহ পাক দুই রাকাত পরিপূর্ণ করিবার জন্য যোহর আছর এবং ইশার নামাযের ফরয দুই রাকাতের পর আরও দুই রাকাত আর মাগরিবের নামাযের দুই রাকাতের পর আরও এক রাকাত অতিরিক্ত যোগ করিয়া দিলেন। মাগরিবের নামাযে এক রাকাত অতিরিক্ত যোগ করিয়াছেন। বেজোড় সংখ্যার হেকমত রক্ষা করার জন্য। এই ক্ষেত্রে বিধান হইল যে,– যখন কোন জিনিসের অসম্পূর্ণতার ত্রুটি পুরা করার উদ্দেশ্য হয় তখন একই জাতীয় জিনিস উহার সাথে মিলাইতে হয়, যাহা মর্যাদার দিক দিয়া মূল জিনিস হইতে নিম্নমানের হয় সুতরাং যদি ফরযের প্রথম দুই রাকাতের সাথে সুরা মিলানোসহ আরও পরিপূর্ণ দুই রাকাত মিলানো হইত তাহা হইলে শেষের দুই রাকাতও সর্বদিক দিয়া প্রথম দুই রাকাতের বরাবর হইয়া যাইত। তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতার ত্রুটি পূরা করার বিধান বজায় থাকিত না। কেননা প্রথম দুই রাকাতের সাথে অপর দুই রাকাত মিলানের কারণ হইল– অনেক সময় নামাযের একাগ্রতা বা মনোনিবেশ বা কেরাত অথবা কোন রোকন পালন করিতে গিয়া কোন রকম ত্রুটি দেখা দেয়। এই ত্রুটির পূরণার্থে এই দুই রাকাতের সাথে আরও দুই রাকাত বা এক রাকাত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নামাযের জামাতের এবং জামাতে কাতার সোজা করিবার রহস্য

নামাযের জামাতের প্রচলন এবং জমাতে নামায পড়ার মধ্যে এত অধিক সওয়াব এই উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে, যাহাতে নামাযীদের মধ্যে ঐক্যবোধ পয়দা হয়। অতঃপর এই ঐক্যবোধকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য নামাযীদের তাকিদের সাথে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের একের পা অন্যের পায়ের সাথে মিলাইয়া রাখে, কাতার সোজা করে এবং একে অন্যের সাথে মিলিয়া মিলিয়া খাড়া হয়। এইরূপ করার পিছনে এক রহস্যও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইল; তাহারা যেন সকলে এক ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়। ফলে

একজনের রীতিনীতি অপরজনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারে। অধিকন্তু নিজেদের মধ্যে আমিত্ব, পরস্পর পার্থক্য এবং নিজকে অন্য থেকে বড় মনে করার যে প্রবণতা রহিয়াছে– তাহা মিটিয়া যায়।

তাশাহহুদের বৈঠকের তাৎপর্য

সমস্ত ইবাদত পাওয়ার হকদার একমাত্র আল্লাহ পাক। কোন প্রকারের ইবাদতে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সর্বপ্রকার শরীক হইতে সম্পূর্ণ রূপে পাক ও পবিত্র। তিনি কোন অবস্থায় কোন শরীকের মুখাপেক্ষী নহেন। اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ (সমস্ত সালাম আল্লাহ পাকের জন্য)–এর মর্মকথা ইহাই।

অতঃপর নামাযী اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ পাঠ করে। ইহার তাৎপর্য এক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিধান এই যে, প্রত্যেক অনুগ্রহকারী ও পৃষ্ঠপোষকের ভালবাসা মানুষের অন্তরে স্বভাবগতভাবেই পয়দা হইয়া থাকে। আর আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত কত অনুগ্রহ ও এহসান রহিয়াছে। তিনিই ঐ সত্তা যাহার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে চিনিয়াছি। তাঁহার মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের পথ জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার মাধ্যমেই আল্লাহর ইবাদতের সর্বোত্তম পন্থা অর্থাৎ আযান, নামায পাইয়াছি। আর তাঁহারই মাধ্যমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত উন্নতি করিতে পারি। তাঁহার মাধ্যমেই 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার পূর্ণ তাৎপর্য জানিতে পারিয়াছি। তিনিই খোদা পর্যন্ত পৌঁছার সর্বোচ্চ মাধ্যম।

মোটকথা– আমাদের উপর মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত বেশী অনুগ্রহ ও এহসান রহিয়াছে যে, তাঁহার অনুগ্রহ ও এহসানের দিকে দৃষ্টি করিয়া অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদেরও পথভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অন্যান্য জাতির লোকেরা নিজেদের অনুগ্রহকারী ও নবীদের অসংখ্য অনুগ্রহ ও এহসান দেখিয়া তাহাদিগকে খোদাপ্রাপ্তির মাধ্যম বুঝার পরিবর্তে খোদা মনে করিয়া চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছিল। তৌহিদের শিক্ষাদাতাদিগকে অদ্বিতীয় খোদা বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা দুনিয়ার মানুষকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা ছিল বিনয়, নম্রতা এবং খোদার

দাসত্বের পূর্ণ স্বীকৃতির শিক্ষা। কিন্তু তাহারা এই শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া নিজেদের শিক্ষাদাতাগণকেই মাবুদ বলিয়া একীন করিয়া লইয়া ছিল।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ ও এহসান দেখিয়া মুসলমানদের মধ্যেও এই সম্ভাবনা ছিল যে, মুসলমানরা অন্যান্য জাতির ন্যায় এইরূপ করিয়া বসে। কিন্তু আল্লাহ পাক এই জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করিয়াছেন। তাহাদিগকে এই আশংকা থেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে "লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাথে সর্বদার জন্য "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"কে জুড়িয়া ইহাকে তাওহীদের বাক্যের অংশ সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে মুসলমান সর্বদার জন্য শিরক হইতে বাঁচিয়া যায়। স্বীয় নবীকে খোদা মনে না করিয়া খোদার রাসূল ও বান্দা বলিয়া বিশ্বাস করে। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনাতে সমাহিত করা হইয়াছে। মক্কাতে সমাহিত করিবার সুযোগ দেন নাই। কেননা যদি তাহাকে মক্কাতে সমাহিত করা হইত তাহা হইলে হয়ত কাহারও অন্তরে তাঁহার পূজা করার ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত। অথবা কমপক্ষে মুসলিমবিরোধীরা বা শত্রুপক্ষ অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করিত যে, মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করিতেছে। এখন তাঁহার সমাধি মদিনাতে হওয়ার ফলে যাহারা মক্কা শরীফের উত্তর দিকে থাকিয়া দক্ষিণ দিকে রূখ করিয়া নামায আদায় করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের দিকে পৃষ্ঠ দিয়া তাহাদের নামায আদায় করিতে হয়। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর পূজা হওয়া এবং মুসলমানদের শিরকে লিপ্ত হওয়ার রাস্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপভাবে যে যে কার্যের দ্বারা মানুষ তাহাকে খোদা মনে করার ধারণায় লিপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ, তাহাকে আল্লাহ পাকের সত্তা ও আল্লাহ পাকের গুণাবলীতে শরীক মনে করার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে আল্লাহ পাক নিজেই ইসলামের মধ্যে এইসব কার্যের সহীহ শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, কোন মুসলমান এই ধরনের ধারণায় লিপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নাই। কিন্তু যেহেতু অনুগ্রহকারীর প্রতি মুহাব্বত রাখা এবং তাহার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের স্বভাবগত চাহিদা তাই ইহার জন্য আল্লাহ পাক এক রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন যে, মুসলমানগণ তাঁহার

জন্য দোয়া করিবে। আর এইভাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার উন্নতি হইতে থাকিবে। এই জন্য প্রত্যেক মুসলমান নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

এই দোয়ার পবিত্র তোহফা পেশ করে এবং বেদনাবিধুর অন্তরে তাঁহার শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁহার অনুগ্রহ, এহসান ও মেহেরবানীর প্রতি খেয়াল করিয়া তাঁহার এমন মহাব্বত অন্তরে পয়দা করে যে, যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সামনে উপস্থিত আছেন। তাঁহার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীসমূহের সৌন্দর্যের নকশার মাধ্যমে তাহাকে সামনে উপস্থিত মনে করিয়া সামনে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক।

(তাশাহহুদ পাঠ করার সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে আছেন বলিয়া মনে করিতে হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে উপস্থিত আছেন এমন মনে করা সঙ্গত নয়।)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর দ্বীনের সত্যিকার সেবক সাহাবায়ে কেরাম, তাবে' তাবে'ঈন, আওলিয়া কেরাম, পরহেযগার মুত্তাকী, ফকীহ ও মোহাদ্দেছীনগণ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাহাদের অনুগ্রহ ও মেহেরবানী আমাদের উপর সর্বাধিক। সুতরাং তাহাদের সেবার সৌন্দর্যের কারণে তাহাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত দ্বীনের সেবকদের জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ *

"আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের প্রতি সালাম"

তাশাহুদ পাঠের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)—এর জন্য দরূদ পাঠ করার হেকমত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰي اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰي اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰي اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰي اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন যেমন আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাহার পরিবার পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত গুণবিশিষ্ট এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার পরিবার পরিজনের প্রতি বরকত প্রেরণ করুণ যেমন আপনি ইবরাহীম (আঃ) ও তাহার পরিবার পরিজনের প্রতি বরকত প্রেরণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত গুণবিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

উল্লিখিত শব্দগুলি আমরা নামাযে পাঠ করিয়া থাকি। বস্তবে ইহাদের নাম দরূদ। যদি আমরা আল্লাহ পাকের সঠিক বান্দা এবং ইবাদতকারী ও সম্মান প্রদর্শনকারী হইতে পারি। অধিকন্তু মাখলুকের প্রতি স্নেহ মমতা ও অনুগ্রহকারী এবং ইলম ও আকিদার দ্বারা ভরপুর হইয়া যাই— তাহা হইলে সত্যিকার অর্থে এইসব কিছু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অনুগ্রহ ও মেহেরবানী। যদি তাঁহার অন্তরে আমাদের ব্যথা না থাকিত তাহা হইলে আমাদের জন্য কুরআন কারীমের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থের অবতরণ কিভাবে হইতে পারিত? যদি তাহার মেহেরবানী ও মহাব্বত আমাদের জন্য না থাকিত, আমাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য না হইত এবং আমাদের জন্য অসহনীয় কষ্ট বরদাশত না করিতেন— তাহা হইলে এই পবিত্র দ্বীন আমাদের কাছে কিভাবে পৌঁছিত?

অতঃপর একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, সাধারণ সাধারণ অনুগ্রহকারীদের প্রতি আমাদের মহাব্বত পয়দা হওয়াটা আমাদের নির্মল বিবেকের চাহিদা, তাহা হইলে মুসলমানদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেমের আবেগ কেন মওজুদ থাকিবে না? আর এই প্রেমের আবেগের ফল এই দরূদ শরীফ।

নামাযের ইমামতি ও জামাতের সাথে নামাযের হেকমত

যখন কোন বিষয় খুব মজবুত ও সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় তখন উহা কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে হয়। আল্লাহ পাক দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসে মধ্যবর্তিতা পছন্দ করেন। আর ইহাদের মধ্যে মধ্যবর্তিতা তখনই কায়েম হয় যখন ইহাদের মধ্যে ঐক্য ও একত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ পাক শরয়ী আহকামের জগতে এই ঐক্য ও একত্ব দেখাইয়াছেন নামাযের জামাত ও ইমামতির আকৃতিতে। সূর্যের অধীনে পরিচালিত ব্যবস্থাপনার দিকে দেখ— আল্লাহ পাক দেহবিশিষ্ট জিনিসসমূহ সৃষ্টি করিয়া সূর্যকে ইহাদের বড় ইমাম নির্ধারিত করিয়াছেন। ছোট-বড় সমস্ত দেহবিশিষ্ট জিনিসকে ইহার অধীন করিয়া দিয়াছেন।

মোটকথা— দেহের জগতের ছোট-বড় সমস্ত ধারা ধাপে ধাপে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লাহ পাক সৃষ্টি জগতে এবং কুদরতের কানুনের মধ্যে যে আকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন— উহাই শরীয়তের আহকামের জগতে নামাযের ইমামতি ও জামাতের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ঐক্যের প্রতি বনী আদমকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আর দেখাইয়াছেন যে, ঐক্য ও একত্বের বরকতের দ্বারাই দুনিয়া কায়েম রহিয়াছে।

সুতরাং বস্তুজগতে যখন সর্বদাই এক ইমামের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা হইলে কিভাবে ধারণা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ পাক রূহানী জগতের জন্য এমন কোন ইমাম নির্ধারণ করেন নাই, যে ইমামতির ধারা ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত যাহার কাছে গিয়া সমাপ্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহারা হইলেন নবী রাসূলগণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণ। অতএব নামাযের ইমামতি এই রূহানী সম্পর্ক ও একত্বের প্রতি ইঙ্গিত যাহার ধারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়া সমাপ্ত হইয়া যায়। আর তাহার প্রতিনিধিত্বে ইহার প্রকাশ নামাযের ইমামদের আকৃতিতে হইতেছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার পরিপন্থী আমল করে অথবা নামাযের জামাত

অস্বীকার করে, সে মধ্যবর্তিতার মর্যাদা বর্জন করিয়াছে। সে আল্লাহর কুদরতের কানুন এবং আহকামের জগত হইতে বাহির হইয়া বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছে।

এক প্রশ্নের জবাব

প্রশ্নঃ নামায এক ওয়াক্ত নির্ধারিত হইল না কেন? পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হইল কেন?

জবাবঃ দেহের পুষ্টি সাধন ও শক্তি অর্জনের জন্য বার বার আহার করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে অন্তরের সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা এবং শক্তি অর্জনের জন্যও রূহানী খাদ্যের প্রয়োজন আরও বেশী। কিন্তু প্রশ্নকারী যাহা বলিতেছে তাহা তো বড়ই আশ্চার্যের বিষয় যে, নামায শুধু এক ওয়াক্ত কেন নির্ধারিত হইল না? আমরা তাহার জবাবে বলিতেছি যে, যখন তোমরা দৈহিক শক্তি অর্জনের জন্য একদিনে কয়েকবার আহার কর– তাহা হইলে রূহের সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা ও শক্তি কায়েম রাখার জন্য রূহানী খাদ্য অর্থাৎ নামায তো আরও অধিক প্রয়োজন। কেননা রূহ তো দেহ অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও পাতলা জিনিস। আর দেহ সতেজ ও সুস্থ রাখার আর ইহাতে শক্তি কায়েম রাখার জন্য যখন একদিনে কয়েকবার আহার কর– তাহা হইলে রূহের খাদ্যের জন্য রাত্র দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত হইয়াছে– ইহাতে দোষের কি আছে?

পাঁচ ওয়াক্ত, জুমআ, দুই ঈদের জামাতের এবং হজ্জের সমাবেশের হেকমত

আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও পবিত্রতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত একত্রিত হইয়া এবং মিলিয়া মিশিয়া আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও পরাক্রমশালিতা বর্ণনা করাকে আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করিয়া দিয়াছেন। কোন শহর বা এলাকা এমন দেখিবে না যাহার মহল্লায় মহল্লায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাত হয় না। কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের সমাবেশে যদি শহর বা এলাকার সকল অধিবাসীগণকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইত তাহা হইলে ইহা হইত একটি অসম্ভব বিষয়ের নির্দেশ। এইজন্য শহর বা এলাকার সকল মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার জন্য সপ্তাহের মধ্যে মাত্র একদিন অর্থাৎ জুমআর দিন নির্ধারণ করা হইল। অনুরূপভাবে এক জনপদের লোকজনের

একত্রে সমাবেশ হওয়ার জন্য ঈদের নামায নির্ধারণ করা হইল। যেহেতু ইহা একটি বিরাট সমাবেশ– তাই ঈদের নামাযের জন্য শহরের বাহিরে একটি বড় ময়দান নির্ধারণ করা হইল। কিন্তু ইহার পরও দুনিয়ার মুসলমানগণ একত্রিত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। তাই সকল মুসলমানের একত্রিত হওয়ার জন্য একটি বড় স্থান থাকা প্রয়োজন, যাহা বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার জন্য সুবিধাজনক এলাকায় বিদ্যমান এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন এলাকার মুসলমানরা একত্রিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় হেতু শুধু ঐ সকল লোকদের একত্রিত হওয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহারা ইহাতে একত্রিত হওয়ার খরচ বহনের সামর্থ্য রাখে।

নামায শেষ করার পর দোয়া পড়ার রহস্য

হাদীছের মধ্যে এমন কিছু কথা ও কিছু দোয়া উল্লিখিত রহিয়াছে, যাহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযান্তে পাঠ করিতেন। ইহা পাঠ করার উদাহরণ এমন হইতে পারে যে, কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবার হইতে বিদায় গ্রহণ করার সময় দরবারের উপযুক্ত কিছু আদব প্রদর্শন করিতে হয় এবং সালাম পেশ করিতে হয়। চুপচাপ বিদায় গ্রহণ করে না। বরং দরবার হইতে বিদায় গ্রহণকালেও দরবারের আদব রক্ষা করিয়া আবেদন নিবেদন করে এবং স্বীয় অবস্থার কথা পেশ করে। অতঃপর বিদায় গ্রহণ করে। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয আদায় করার পর নিম্নোক্ত কথাগুলি পাঠ করিতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا

وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

"হে আল্লাহ! আপনি সালাম, নিরাপত্তা আপনার পক্ষ হইতে পাওয়া যায়। নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন স্থলও আপনি। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি বড় বরকতময়। হে গৌরবান্বিত এবং সম্মানিত।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরে আরও অনেক দোয়া পাঠ করিতেন।

নামাযে সুতরা খাড়া করিবার ভেদ

নামায আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য কর্তব্য। নামাযীর নামাযে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মনিবের খেদমতের জন্য মনিবের সামনে চুপ ও সতর্ক অবস্থায় দাঁড়ানো এক গোলামের অবস্থার সাথে তুলনীয়। এই জন্যই নামাযী নামাযে থাকা অবস্থায় তাহার সামনে দিয়া কাহারও না চলাকে নামাযের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা মনিবের খেদমতের উদ্দেশ্যে মনিবের সামনে অপেক্ষামান কোন গোলামের সামনে দিয়া চলা মারাত্মক বেয়াদবী হিসাবে গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন–

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِيْ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبه بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ *

"তোমাদের মধ্যে যখন কেহ নামাযের মধ্যে দণ্ডায়মান হয় তখন সে স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কানে কানে কথা বলে, প্রতিপালক তাহার ও কেবলার মধ্যে অবস্থান করেন।"

অধিকন্তু নামাযীর সামনে দিয়া আসাযাওয়া করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার মনোযাগ নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই নামাযের সামনে দিয়া কেহ যাইতে চাহিলে নামাযী তাহাকে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে। উল্লিখিত হেকমতদ্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়া নামাযীর সামনে সুতরা রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে যদি কাহারও নামাযীর সামনে দিয়া চলিতে হয় তাহা হইলে যেন সুতরার বাহির দিয়া চলে। ফলে সে উভয় অপরাধ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। নামাযীর সামনে কমপক্ষে এক হাত উচ্চ এবং এক আঙ্গুল মোটা কোন জিনিস খাড়া করিয়া দেওয়ার নাম সুতরা রাখা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا وَضَعَ اَحَدكُمْ بَيْنَ يَدَيْه مِثْلَ مُؤخِّرَة الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَ لَا يَبال بِمَنْ مروراء ذَالِكَ *

"যখন তোমাদের মধ্যে কেহ হাওদার পিছনে রক্ষিত কাঠের সামনে কোন

জিনিস সম্মুখে রাখ, তখন নামায পড়িতে পার। আর ইহার বাহির দিয়া কেহ পথ চলিলে উহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

সুতরাং রাখার রহস্য হইল; যদি নামাযীর সামনে দিয়া সর্বাবস্থায় চলা নিষেধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিবে। এই জন্য সুতরা খাড়া করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বাহ্যিকভাবে নামাযীর নামাযের স্থান তাহার চলার স্থান হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয়। আর পৃথক মনে হওয়ার কারণে নামাযীর সামনে দিয়া পথ চলিলেও নামাযীর মনে কোন খটকা না বাঁধে। বরং তাহার এই চলাকে নামাযী দূরে দিয়া চলার ন্যায় মনে করে।

কবরস্তানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

কারণ মানুষ সেখানে নামায পড়িতে পড়িতে হয়ত আওলিয়া ও উলামাদিগকে প্রতিমার ন্যায় পূজা করা শুরু করিয়া দিবে। অথচ ইহা প্রকাশ্য শিরক। অথবা এইসব স্থানে নামায পড়াকে আল্লাহর অধিক নৈকট্যের মাধ্যম মনে করিবে। কেননা তাহারা মনে করিবে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাহাদেরও হাত রহিয়াছে। আর এইরূপ মনে করা শিরকে খফী বা অপ্রকাশ্য শিরক। নিম্নে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক ইরশাদ উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার মর্মার্থ ইহাই। তিনি ইরশাদ করেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰى اِتَّخَذُوا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ

"ইহুদী খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর লা'নত। তাহারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদার স্থান বানাইয়া লইয়াছে।"

সুর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দ্বিপ্রহরে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

ইহার কারণ হইল– মুশরিকরা এই তিন সময় সুর্যের পূজা করে। সূর্যকে সিজদা করে। এই জন্য আল্লাহ পাক তাহাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হইতে মুসলমানদের নিষেধ করিয়াছেন। অধিকন্তু মানুষ আল্লাহ পাকের যত ইবাদত করে তন্মধ্যে নামাযই সবচাইতে বড় ইবাদত। সুতরাং এই ইবাদতের ওয়াক্তের

দিক দিয়াও ইসলাম ও কুফুরের মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত। তাই মুশরিকদের পূজার ওয়াক্ত মুসলমানদের ইবাদতের ওয়াক্ত এক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গোসলখানায় (হাম্মামখানায়) নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

হাম্মামখানায় নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হইল– সেখানে মানুষ সতর খুলিয়া থাকে। অধিকন্তু সেখানে মানুষের আনাগোনা হয়। এইসব কারণে নামাযীর একাগ্রতা বাধা প্রাপ্ত হয়। একাগ্রচিত্তে স্বীয় পরোয়ারদিগারের সামনে প্রার্থনা হইতে পারে না।

যেখানে উট বাঁধে সেখানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

যেখানে উট বাঁধা হয় সেখানে নামায পড়া নিষেধ। কারণ উট একটি বিরাট দেহবিশিষ্ট প্রাণী। যাহাকে আক্রমণ করে তাহাকে ছাড়ে না। মানুষকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া ইহার স্বভাব। অবাধ্যতা ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইগুলি প্রত্যেকটি আশংকার বিষয়। সুতরাং এইসব আশংকা থাকা অবস্থায় নামাযীর নামাযে মন না লাগা স্বাভাবিক। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلُّوْا فِيْ مَرَاحِ الْغَنَمِ وَ لَا تُصَلُّوْا فِيْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ

"তোমরা ছাগল যেখানে বাঁধে সেখানে নামায পড় কিন্তু উট যেখানে বাঁধে সেখানে নামায পড়িও না। কেননা উটের স্বভাবে শয়তানী উপদান অধিক।"

পশু যবেহ করার স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

পশু যবেহ করার স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে– ইহা অপবিত্র ও নাপাক স্থান। পশু যবেহ করার ফলে রক্ত ও গোবর পড়িয়া স্থানটি দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। অথচ নামাযের জন্য পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত জরুরী।

পথে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

রাস্তার মধ্যখানে নামায পড়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে কারণ প্রথমতঃ পথিকের পথচলার কারণে তো নামাযীর [illegible] না। অধিকন্তু

রাস্তার মধ্যখানে নামায পড়ার কারণে পথিকের পথ চলায় বিঘ্নতার সৃষ্টি হইবে। অথবা পথিক নামাযের সামনে দিয়া পথ চলিতে বাধ্য হইবে, অথচ নামাযীর সামনে দিয়া চলা নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ রাস্তার উপর দিয়া হিংস্র জন্তু চলাফেরা করে। এই জন্যই রাস্তায় বিশ্রাম গ্রহণ করার ব্যাপারে হাদীছে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। এইসব কারণে রাস্তার উপরে নামায পড়া নিষিদ্ধ; বরং রাস্তা ছাড়িয়া এক পার্শ্বে গিয়া নামায পড়া অপরিহার্য।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ ظَهْرُ بَيْتِ اللّٰهِ وَ الْمَقْبَرَةُ وَ الْمَزْبَلَةُ وَ الْمَجْزَرَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ عَطْنُ الْإِبِلِ وَ مُحَجَّةُ الطَّرِيْقِ *

"হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সাতটি স্থানে নামায পড়া জায়েয নাই। কাবাঘরের ছাদের উপরে, (সম্মান স্বরূপ) কবরস্তানে (শিরকের ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে), ময়লার স্তুপে (অপবিত্রতার কারণে), পশু যবেহ করার স্থানে (অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধের কারণে), গোসলখানায় (একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার কারণে), উট বাঁধার স্থানে, রাস্তার মধ্যখানে (একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে)।

আমলের কাযা ও রুখসত নির্ধারণ করার হেকমত

কোন কোন সময় মানুষের বিভিন্ন প্রকার অসুবিধাও দেখা দিয়া থাকে। যদি অসুবিধার সময় তাহার দায়িত্বে কোন রকম সাবলীলতার ও হ্রাস করার খেয়াল না করা হয় তাহা হইলে ইহা তাহার জন্য বড়ই অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

এইজন্য তাহার দায়িত্ব কিছুটা লাঘব করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাহাতে আহকামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিছুটা সুবিধা অনুভব করিতে পারে। আল্লাহ পাক বলেন,

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ *

"আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে আসানি করিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তোমাদের সাথে কাঠিন্যতার ইচ্ছা করেন না।"

আর যদি তাহার সুবিধা করিতে গিয়া আমল সম্পূর্ণ রূপে রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ অসুবিধার সময় যদি আমল পরিপূর্ণভাবে বর্জন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে আমল বর্জন করিবার অভ্যাসী হইয়া যাইবে। এইজন্যই মানুষের আমল করার অভ্যাসী করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য বার বার আমল করান হয়। যেমন বদমেযাজ হিংস্র প্রাণীকে বার বার আমল করাইয়া অভ্যাসী করিয়া গড়িয়া তোলা হয়।

যাহারা গোনাহ থেকে নিজকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে, অথবা শিশুদের শিক্ষা দেয় অথবা চতুষ্পদ জন্তুকে কোন কার্যের অভ্যাসী করিয়া গড়িয়া তুলে- তাহারা ভালভাবে অবগত আছে যে, একটি কাজ সর্বদা করিতে থাকিলে কাজের সাথে কতটুকু আন্তরিক সম্পর্ক ও মহাব্বত পয়দা হয়? আর কাজটি সম্পাদন করা কত সহজ? পক্ষান্তরে কাজটি ছাড়িয়া দিলে কাজটি থেকে আন্তরিক সম্পর্ক কতটুকু নষ্ট হইয়া যায়? পুনরায় এই কাজটি করিতে গেলে কাজটি করা কতটুকু কষ্টের ব্যাপার হয়? যদি দ্বিতীয়বার কাজটি করার চাহিদা পয়দা হয় তাহা হইলে কাজের জন্য নতুন করিয়া আন্তরিক সম্পর্ক পয়দা করিতে হয়। এই সবদিকে খেয়াল করিয়া এই ক্ষেত্রে আমলের জন্য দুইটি দিক অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

এক- যখন কোন কার্য সম্পাদন করিবার নির্ধারিত সময় অতিক্রম করিয়া যায় তখন উক্ত কার্য কাযা করিবার নীতি নির্ধারিত হইয়াছে।

দুই- অসুবিধার সময় কার্য সম্পাদন করিবার জন্য রুখসাত নির্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার দায়িত্ব কিছুটা লাঘব ও সাবলীল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এই নীতি মোতাবেক অন্ধকার রাত্রে কেবলা নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে শুধু চিন্তা করিয়া কেবলা নির্ধারণ করিয়া নামায পড়ার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।

অর্থাৎ নিজের চিন্তা মোতাবেক যেদিক কেবলা বলিয়া মনে সাক্ষ্য দেয়- ঐ দিকে রুখ করিয়া নামায পড়ার অনুমতি রহিয়াছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে ঐ

দিকটি কেবলা নহে। যাহার সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় না থাকে তাহার সতর খুলিয়াও নামায পড়ার অনুমতি রহিয়াছে। যদি কেহ ওযু করিবার জন্য পানি না পায় সে ওযু বর্জন করিয়া শুধু তায়াম্মুম করিতে পারে। যে নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করিবার সামর্থ্য না রাখে সে শুধু যিকিরের দ্বারা নামায পড়িতে পারে। যাহার নামাযে দাঁড়াইবার শক্তি নাই সে বসিয়া বসিয়া বা শুইয়া শুইয়া নামায পড়িতে পারে। যে রুকু সিজদা করিতে পারে না সে ইহার উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকাইয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। আহকামের রুখসত দেওয়ার মধ্যে এই দিকেও খেয়াল করিতে হইবে যে, কোন আমলের পরিবর্তে যে আমলটি গ্রহণ করা হইবে- তাহা এমন হইতে হইবে যে, ইহার দ্বারা যেন মূল আমল স্মরণে আসে আর আমলকরনেওয়ালা ইহা অবগত হয় যে, এই আমলটি অমুক আমলের পরিবর্তে নির্ধারিত হইয়াছে।

আরামের সাথে সফরকারীর জন্যও রোযা না রাখার ও নামায কসর পড়ার অনুমতি থাকার কারণ

কষ্ট-ক্লেশ মুক্ত আরামের সাথে সফরকারী ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা ও নামায কসর (অর্থাৎ কমাইয়া) পড়ার অনুমতি দেওয়া এবং কষ্টক্লেশ ও মেহনতি মুকীমের (সফর না করিয়া এলাকায় অবস্থানকারীর) জন্য রোযা ভঙ্গ করার এবং নামায কসর পড়ার অনুমতি প্রদান না করা আল্লাহ পাকের বিশেষ হেকমতের উপর নির্ভরশীল। ইহা সন্দেহাতীত যে, রোযা ভঙ্গ করার এবং নামায কসর পড়ার অনুমতি মুসাফিরের জন্য নির্ধারিত। মুকীম ব্যক্তি রোযা ভাঙ্গিতে পরিবে না। আবার নামাযও কসর করিতে পারিবে না। অবশ্য রোগের কারণে মুকীম ব্যক্তি শুধু রোযা ভাঙ্গিতে পারে। এই বিধান রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার ফল। কেননা সফর মৌলিকভাবে আযাবের টুকরা। বিপদাপদ, কষ্টক্লেশ, মেহনত পরিশ্রমে ভরপুর। মুসাফির সফর অবস্থায় যতই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকুকনা কেন প্রত্যেকে স্ব স্ব মর্যাদা মোতাবেক কোন না কোন কষ্টক্লেশ ও মেহনত পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে। সুতরাং আল্লাহ পাকের নিছক রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি সফরকারীদের দায়িত্ব থেকে নামাযের একাংশ হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। অপর অংশ আদায় করাতেই দায়িত্ব মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই সফরের কারণে ফরয রোযার বেলায় রোযা ভঙ্গের

অনুমতি দিয়া সাবলীলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। সফর শেষ করিয়া ঘরে আসার পর পরিত্যক্ত রোযা পুনরায় আদায় করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। রোগের কারণে রোযা ছাড়িয়াছে এমন ব্যক্তি এবং ঋতুবতী নারী সম্পর্কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সফরের কারণে তাহাদের থেকে আল্লাহর ইবাদত সম্পূর্ণভাবে বর্জিত না হয়।

পক্ষান্তরে সফরে না থাকিয়া এলাকায় থাকা অবস্থায় তো অগণিত কষ্টক্লেশ ও মেহনত পরিশ্রম লাগিয়াই থাকে। সুতরাং যদি এই কষ্টক্লেশ ও মেহনত পরিশ্রমের কারণে নামাযে কসর ও রোযা ভাঙ্গার অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে তো অনেক মেহনতী ও পরিশ্রমী মানুষ থেকে অনেক অপরিহার্য এবং একান্ত জরুরী ইবাদতও ছুটিয়া যাইত। যদি কাহাকেও অনুমতি দেওয়া হইত আর কাহাকেও দেওয়া না হইত তাহা হইলেও তাহা সম্ভব হইত না। কেননা মেহনত ও কষ্টক্লেশ এমন একটি জিনিস, যাহার সত্যিকার পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব। কেননা ইহা ব্যক্তিবিশেষে কমবেশী হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমতি প্রদান করা আর না করার সঠিক মাপকাঠি সম্ভব নয় বিধায় অনুমতি প্রদানের বিষয়টি মীমাংসা করাও মুশকিল। কিন্তু সফরের অবস্থা এমন নয়। কেননা সফরের অবস্থার মেহনত ও কষ্টক্লেশ সফরের সাথে সম্পর্কিত। ইহার সাথে ইবাদত লাঘব করার মিল রহিয়াছে। কারণ সফর অবস্থায় সময় কম পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা ইবাদত লাঘব করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য মুকীম ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ার কারণে রোযা রাখিতে অসুবিধা হয় তাহা হইলে তাহার রোযা ভঙ্গের অনুমতি রহিয়াছে। বসিয়া বা শুইয়া নামায পড়া তাহার জন্য বৈধ। ইহা মুসাফিরের কসর নামাযের সাদৃশ। কেননা এই অবস্থায় ওয়াক্ত যথেষ্ট আছে কিন্তু কষ্টক্লেশের কারণে আমল করা মুশকিল।

নামাযে কসর করা এবং রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি শুধুমাত্র মেহনত ও কষ্ট ক্লেশের ভিত্তিতে নয় কেননা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। মেহনত ও কষ্টক্লেশের উপর। যে ব্যক্তি মেহনত পরিশ্রম করে না সে সুখী হইতে পারে না। মেহনত পরিশ্রমের দামও সুখ স্বাচ্ছন্দের দ্বারাই পাওয়া যায়। সুতরাং কষ্টসাধ্য সমস্ত কার্যে যেমন কৃষিকার্য, কামারের কার্য

প্রভৃতির মধ্যে অবশ্যই মেহনত পরিশ্রম ও কষ্টক্লেশ হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে দুনিয়ার কোন কাজই মেহনত ও কষ্ট ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। এই জন্যই তাহাদিগকে নামাযে কসর করিবার এবং রমযানে রোযা ভঙ্গ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কেননা পরিশ্রমী ও মেহনতী লোকজন সর্বদাই তাহাদের কার্যে লিপ্ত থাকে। তাহাদের রোজগার ইহার উপরই নির্ভরশীল। যদি তাহাদিগকে রোযা ভঙ্গের ও নামায কসর করার অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এইজন্য সাধারণ মেহনত ও কষ্টক্লেশের কারণে রুখসত প্রদান না করা আল্লাহর হেকমতের চাহিদা মোতাবেক হইয়াছে। বরং এক বিশেষ মেহনত ও কষ্টক্লেশের কারণে রুখসত প্রদান (অর্থাৎ আহকাম লাঘব করা) হইয়াছে।

মোটকথা; যে কোন অসুবিধার কারণেই আহকাম লাঘব করা উচিত নয়। কেননা অসুবিধা বিভিন্নভাবে হইয়া থাকে। যদি সকল প্রকার অসুবিধার কারণে আহকাম লাঘব করা হয়– তাহা হইলে আল্লাহ পাকের আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়া যাইবে।

ঋতুমতী নারী ঋতুমুক্ত হইয়া রোযা আদায় করা ও নামায আদায় না করার কারণ

এই সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, ঋতুমতী নারী ঋতুমুক্ত হওয়ার পর তাহার পরিত্যাক্ত রোযা পরে আদায় করার এবং নামায পরে আদায় না করার বিধান সত্য শরীয়তের সৌন্দর্য, উহার হিকমত ও আদিষ্ট ব্যক্তিদের মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি সুদৃষ্টি ক্ষেপণ। কেননা ঋতুকাল ইবাদতের যোগ্যতা রাখে না। তাই এই সময়ে ইবাদত বৈধ নয়। তবে পবিত্রকালের নামায ঋতুকালের পরিত্যাক্ত নামাযের জন্য যথেষ্ট। ঋতুকালীন পরিত্যাক্ত নামায পরে পড়িবার প্রয়োজন নাই। কেননা নামায প্রতিদিন বার বার পড়িতে হয়। কিন্তু রোযা প্রতিদিন আসে না। বরং বৎসরে মাত্র একমাস, যদি ঋতুকালের রোযাও বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহার সাদৃশ (অর্থাৎ অন্য রোযা) ইহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। সুতরাং রোযার হেকমত নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই ছুটিয়া যাওয়া রোযা পবিত্রকালে রাখা ওয়াজিব করা হইয়াছে,

যাহাতে রোযার হেকমত তাহার থেকে ছুটিয়া না যায়। আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহে এইসব হেকমতের উদ্দেশ্যেই রোযা বৈধ করিয়াছেন। [১]

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়ার বিধান চালু করার কারণ

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ আপদ-বিপদ, বালা-মুছীবত এবং অমঙ্গল অবস্থার নমুনা ও নিদর্শন। অতএব আল্লাহ পাকের রহমত ও পরিপূর্ণ মেহেরবানীর চাহিদা হইল যে, সূর্যগ্রহণের সময় মানুষকে এমন পন্থা শিক্ষা দিবে, যাহা সূর্যগ্রহণের সাথে তুলনীয় বালা-মুছীবত ও আপদ-বিপদ দূর করিবে এবং অমঙ্গল অবস্থাসমূহ মিটাইবে। (বালা-মুছীবত সূর্য গ্রহণের সাথে এই দিক দিয়া তুলনীয় যে, সূর্যগ্রহণের দ্বারা আলো অন্ধকার হইয়া যায়। আর বালা-মুছীবতও মানুষের সুখ শান্তিকে দুঃখ ও অশান্তিতে পরিণত করে।) এই জন্যই আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন। কেননা আল্লাহ পাকের নীতি হইল যে, তিনি দোয়ার দ্বারা বালা-মুছীবত দূরীভূত করেন। দোয়া আর বালামুছীবত যখন একত্রিত হয় তখন আল্লাহর হুকুমে দোয়া প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তবে দোয়া এমন ব্যক্তির মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয় যে আল্লাহ পাকের কাছে তাওবা করে।

বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ বোখারী ও মুসলিম শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ পাকের দুইটি নিদর্শন। কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ইহাতে গ্রহণ লাগে না। বরং ইহাও আল্লাহ পাকের নিদর্শন। আল্লাহ পাক ইহাদের দ্বারা স্বীয় বান্দাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ দেখিতে পাও তখন তাড়াতাড়ি নামাযে লিপ্ত হইয়া পড়িও।

ফায়দাঃ

(১) অধিকন্তু প্রতিদিন বেতেরসহ নামায মোট ছয় ওয়াক্ত। পবিত্রতার দিনেও ছয় ওয়াক্ত করিয়া নামায। পবিত্রকালে সমস্ত নামায আদায় করিতে গেলে মুশকিল হইয়া যাইবে। তাই ঋতুকালীন নামায বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রোযামাত্র এক মাস। রমযানের পর আর কোন রোযা নাই। তাই রমযানের পর আদায় করিতে কোন অসুবিধা নাই। তাই রোযার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

অত্র হাদীছে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, উল্লিখিত নিদর্শনদ্বয় গোনাহগার বান্দাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য, যাহাতে তাহারা স্বীয় গোনাহ, বদকার্য ও কলুষতার খারাপ পরিণাম সম্পর্কে ভয় পায়। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণের সময় করণীয় কর্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, অনেক পূন্য অর্জন কর, নেক কাজের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও, বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে নামায পড়, দোয়া কর, আল্লাহ পাকের প্রশংসা কর। এই সময়ে যিকির, কান্নাকাটি, নামায, সিজদা, তাওবা, দোয়া, গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, বিনয়, একাগ্রতা, আল্লাহর দরবারে স্বীয় অক্ষমতা আরয করা, সদকা করা, গোলাম আযাদ করা, প্রভৃতি নেক কাজ করা নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে এই সকল নেককার্য নেককার্য করনেওয়ালার প্রতি আগত আযাবের জন্য ঢাল স্বরূপ হইয়া যায়। ইহা এমন এক সময় যে, ইহা বালামুছীবত ও বিপদাপদ জন্ম নেওয়ার কথা স্মরণ করায় এবং এই সম্পর্কে সতর্ক করে। এই জন্যই এই সময়ে আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে এমনিতেই ভয় ও আশংকা পয়দা হয়। অধিকন্তু এই সময় যমীনের উপর তাজাল্লী অবতীর্ণ হয়। তাই ইহা আল্লাহওয়ালাদের জন্য আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভের উপযুক্ত সময়। হযরত নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) হইতে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

فَاِذَا تَجَلَّى اللّٰهُ بِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهٖ خَشَعَ لَهٗ

"যখন আল্লাহ পাক স্বীয় মাখলুকের কোন জিনিসের উপর তাজাল্লী অবতীর্ণ করেন- তখন উহা আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়া যায়।"

অধিকন্তু কাফেররা চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করিত। তাই মুসলমানদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব অর্পিত হইল যে, তাহাদের দ্বারা যেন এমন কোন প্রমাণ প্রকাশ পায় যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহারা ইবাদত পাওয়ার হকদার নহে। তাই তাহারা এই সময়ে যেন আল্লাহ পাকের কাছে করুণ আবেদন করে এবং আল্লাহকে সিজদা করে। অতএব আল্লাহ পাক বলেন-

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ *

"তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করিও না বরং আল্লাহ পাককে সিজদা কর। এই সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই সিজদা দ্বীনের নিদর্শন এবং এমন জবাব যাহা কাফেরদের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

প্রশ্নঃ যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, গ্রহ নক্ষত্র কক্ষপথে চলিতে গিয়া যখন কোন এক নির্ধারিত স্থানে পৌছে তখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। সুতরাং ইহাদের সাথে আযাব ও সওয়াবের কি সম্পর্ক?

জওয়াবঃ প্রশ্নকারী যাহা বলিয়াছে– তাহা হইল ইহার বাহ্যিক কারণ। আর আমরা যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা হইল প্রকৃত কারণ ও বাস্তব। সুতরাং আমাদের বর্ণনার সাথে তাহার প্রশ্নের কোন বিরোধ নাই।

বৃষ্টির জন্য নামায পড়ার মধ্যে চাদর উলটানের কারণ

বৃষ্টির জন্য নামায পড়ার সময় চাদর উল্টানের হেকমত হইল নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা, যেন তাহারা শুষ্ক বৎসর ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা হইতে সুখস্বাচ্ছন্দ ও রিযিকের প্রশস্ততার দিকে পরিবর্তন লাভ করার উদ্দেশ্যে নামায পড়িতেছে। অধিকন্তু এই নামাযের দ্বারা যেন তাহারা নিজেদের অহংকার, গর্ব, ঔদ্ধত্য, দম্ভ ও অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি দোষত্রুটি বর্জন করিয়া তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং বিনয় নম্রতা, অভাব ও দরিদ্রতা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার দিকে ফিরিয়া যাওয়ার কথা ঘোষণা করিতেছে। আর চাদর পাল্টানের দ্বারা তাহাদের এই পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। তাহাদের চাদর পাল্টানো তাহাদের এই পরিবর্তনের চিত্র। যেহেতু কোন বিষয় কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা মৌখিক প্রকাশ অপেক্ষা দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হয় তাই চাদর পাল্টাইয়া তাহাদের পরিবর্তনকে কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইতেছে। আবার ইহাতে এই দিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, চাদর পাল্টানের চিত্রের ভাষায় ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কর্ম ও চরিত্র হইতে মুক্তির জন্য এবং প্রশংসনীয় ও উত্তম কর্ম ও চরিত্রের তাওফীকের জন্য দোয়া করা হইতেছে। হযরত ইবনে আরবী বলেন–

اَمَنَ كَانَ يَسْتَسْقِيْ يَحُول رواهِ + تحُول مِن الاَفْعَال لَعَلَّك ترتفى

"হে দুর্ভিক্ষের বৎসর! বৃষ্টির জন্য নামায আদায়কারী ও চাদর পলটকারী! তুমি স্বীয় বদকার্যগুলি পরিবর্তন কর এবং নেককার্য অবলম্বন কর, যাহাতে তুমি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হইতে পার।"

ঈদের নামাযে আযান ও ইকামাতের বিধান না থাকার কারণ

যেহেতু ঈদের দিনে ঈদের নামায পড়ার জন্য মানুষকে অবগত ও সতর্ক করিবার অনেক মাধ্যম বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন পূর্ব হইতেই ঈদের দিনকে খুশীর দিন হিসাবে গণনা করা হইতেছে। অধিকন্তু পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি চলিতেছে। ইহার অনেক চর্চাও হইতেছে। এই সবকিছু ঈদের নামাযের জন্য ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি। অধিকন্তু ঈদের দিনে আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রভৃতি যিকির করার বিধান রহিয়াছে। আর এইসব যিকিরের বিধান চালু করার উদ্দেশ্যও ঈদ সম্পর্কে অসতর্ক ব্যক্তিকে সতর্ক করা। যেহেতু উল্লিখিত বিষয়সমূহের দ্বারা ঈদের নামায সম্পর্কে মানুষ পূর্ব হইতেই অবগত তাই ঈদের নামাযে আযান ও ইকামাতের প্রয়োজন অবশিষ্ট রহিল না। কেননা আযান ইকামাত মূলতঃ অসতর্কদিগকে সতর্ক করার জন্য ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি। আর ঈদের দিনের পূর্ব হইতেই ঈদের নামাযের ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি বিভিন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলার কারণ

যেহেতু ঈদের দিনে মানুষ মনের চাহিদা মোতাবেক অনেক জিনিসে অর্থাৎ পানাহারে ও খেলাধূলায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। তাই আল্লাহ পাকের বড়ত্ব, মহত্ব, মর্যাদা ও পরাক্রমশালিতা ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই তাহাদিগকে এই ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করিবার জন্য উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলার বিধান চালু করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের সামনে আল্লাহর বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা হাযির থাকে, যেন তাহারা বলিতেছে যে, হে আল্লাহ! সমস্ত বড়ত্ব ও মর্যাদা আপনারই। আর আমরা তো কিছুই না।

ঈদের নামাযে তাকবীর বলার সময় কান পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করার ভেদ

ঈদের নামাযে তাকবীর বলার সময় দুই কান পর্যন্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া

ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, হে খোদা! আমরা আপনার বড়ত্ব, মর্যাদা এবং পরাক্রমশালিতার সামনে আমাদের বড়ত্ব ও মর্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছি। সর্বপ্রকার বড়ত্ব ও মর্যাদার মালিক একমাত্র আপনি।

কুরআন কারীম আল্লাহ পাকের বিশেষ নিদর্শন হওয়ার রহস্য

দুনিয়াতে রাজা বাদশাহদের পক্ষ হইতে প্রজাদের কাছে ফরমান প্রেরণ করার প্রথা জারী রহিয়াছে। যেহেতু প্রজারা রাজা বাদশাহদিগকে সম্মান করে– তাই তাহাদের ফরমানকে সম্মান করে। যেহেতু আল্লাহ পাক সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী– তাই তাহার ফরমান কুরআন পাকও সকলের কাছে অধিক সম্মানিত। এই হিসাবে কুরআন পাক আল্লাহ পাকের নিদর্শন। যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অন্যান্য নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য লোকের লিখিত বিভিন্ন কিতাবের প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল। আর তখনকার লোকজন ধর্ম পালনের সাথে সাথে তাহাদের গ্রন্থসমূহকেও সম্মান করিত। আর গ্রন্থসমূহ পড়া ও পড়ানোর প্রথা তাহাদের মধ্যে চালু ছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন প্রয়োজন ছিল বিশুদ্ধ ইলমের। আর সর্বদার জন্য বিশুদ্ধ ইলম অর্জন করা বাহ্যিকভাবে কোন গ্রন্থব্যতীত সম্ভব নয়। আর গ্রন্থটিও এমন হওয়া চাই যাহা তাহারা পাঠ করিতে পারে এবং তাহাদের কাছে ইহা সম্মানিত হয়। সুতরাং এই গ্রন্থের চাহিদা হইল যে, ইহা এমন একটি গ্রন্থ হউক যে, আল্লাহর রহমতের প্রকাশ ইহার মাধ্যমে হউক। আর ইহা বিশ্ব নিখিলের প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হউক। অধিকন্তু ইহার সম্মান এইভাবে হউক যে, এই গ্রন্থ পাঠ করার সময় যেন সকলে চুপ করিয়া থাকিয়া মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে। অতঃপর ইহাতে বর্ণিত নির্দেশসমূহ সাথে সাথে আমল করা শুরু করিয়া দেয়। সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করিয়া সিজদা করে। যেখানে তাসবীহ পাঠ করার নির্দেশ রহিয়াছে সেখানে তাসবীহ পাঠ করে। এই গ্রন্থই কুরআন। আর ইহা এইভাবে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সাব্যস্ত হইল।

পয়গম্বর আল্লাহর নিদর্শন হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে

প্রেরিত, যেন তিনি কোন সম্রাটের এমন এক অফিসারের সমতুল্য, যাহাকে সম্রাট স্বীয় আদেশ নিষেধ প্রজাদিগকে শুনাইয়া দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং প্রজাদের পক্ষ হইতে এই অফিসারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। এই দিক দিয়া পয়গম্বর আল্লাহর নিদর্শন।

পয়গম্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান এইরূপ করা হইয়াছে যে, তাহাদের আনীত আহকামসমূহ পালন করা, তাহাদের প্রতি দরূদ পাঠ করা। কথাবার্তা বলার সময় তাহাদের সামনে আওয়াজ উচ্চ না করা।

নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফের হেকমত

নামাযের দ্বারা নফসের দৌরাত্ম খতম হইয়া যায় এবং নফস সংশোধিত হয়। কারণ নামাযের দ্বারা নফস পাক হইয়া ফিরিশতার জগত পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। নফসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, যখন নফস এক গুণের দ্বারা গুণান্বিত হয় তখন উহার মধ্যে উক্ত গুণের বিপরীত যে গুণ থাকে তাহা নফস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আর এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয় যে, মনে হয় যেন বিচ্ছিন্ন গুণটি নফসের মধ্যে কখনও ছিলই না। সুতরাং যে ব্যক্তি ঠিকভাবে নামায আদায় করে, খুব ভালভাবে ওযু করে অতঃপর ঠিক সময়ে নামায আদায় করে, রুকু সিজদা ঠিক মত বিনয়ের সাথে আদায় করে, ইহার তাসবীহসমূহ ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের আমলসমূহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, আর বাহ্যিক আমলসমূহ আদায় করিবার সাথে সাথে ইহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্য লাভের ইচ্ছা করে– তাহা হইলে সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের উচ্চতর পর্যায়ে পৌছিয়া যাইবে। আল্লাহ পাক তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পর্কে বলিয়াছেন–

وَلَو أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَل يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهَا الْخَطَايَا *

"যদি তোমাদের কাহারও ঘরের সামনে দিয়া কোন নহর প্রবাহিত হয় আর সে প্রতিদিন উহাতে পাঁচবার গোসল করে– তাহা হইলে তাহার দেহে কি

কোন ময়লা থাকিতে পারে? উপস্থিত সাহাবাগণ বলিলেন, না! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন– ইহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ। আল্লাহ পাক এইভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা বান্দার গোনাহ সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়া দেন।"

দুই খুতবার মধ্যে ইমামের বসিয়া বিশ্রাম লওয়ার রহস্য

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর মধ্যে দুই খুতবা প্রদান এবং দুই খুতবার মধ্যে বসিয়া আরাম করাকে সুন্নত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য পুরা হইয়া যাইবে। খুতবা প্রদানকারীও আরাম পাইবে। অধিকন্তু শ্রবণকারীরাও নতুন উদ্দীপনা লইয়া শুনিবে।

প্রত্যেক খুতবাতে কলেমায়ে শাহাদত বিদ্যমান থাকার রহস্য

খুতবা পড়ার সুন্নত তরীকা হইল যে, খুতবার সূচনাতে আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য আদায় করা। অতঃপর পৃথককারী শব্দ 'আম্মাবাদ' পাঠ করিয়া উপস্থিত জনতাকে উপদেশ, নসীহত করিয়া আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া। ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদান করা। কুরআন কারীমের একাংশ পাঠ করা। মুসলমানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের দোয়া করা। কারণ এই পন্থায় উপদেশ প্রদান করাতে আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও কুরআন কারীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কেননা খুতবা দ্বীনের নিদর্শন। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলি আযানের ন্যায় ইহাতেও বিদ্যমান থাকা জরুরী। হাদীছে আসিয়াছে যে–

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ *

"যে খুতবাতে শাহাদত বিদ্যমান নাই– ইহা কর্তিত হাতের তুল্য।"

আতংকিত ও ভীত অবস্থায় নামাযে খাড়া হওয়ার ভেদ

নামাযের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সামনে মনোযোগের সাথে এমন মানসিক অবস্থা লইয়া খাড়া হওয়া প্রয়োজন যে, অন্তর বিগলিত হইয়া যায়।

যেমন, কোন ব্যক্তি যখন কো[illegible] আটকা পড়িয়া যায়

আর এইজন্য তাহাকে বন্দী করার বা ফাঁসি দেওয়ার নির্দেশ জারী করার প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সময় হাকীমের সামনে এই ব্যক্তি কতটুকু আতংকিত অবস্থায় খাড়া হইবে? নামাযী অনুরূপ আতংকিত ও ভীত অন্তর লইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে খাড়া হওয়া উচিত।

দোয়া ও তকদীরের (নিয়তির) হাকীকত

দুনিয়ার মঙ্গল ও অমঙ্গল, ভাল বা মন্দ কোন জিনিসই তকদীরের বাহিরে নয়। আল্লাহ পাক যেভাবে যেটা নির্ধারিত করিয়াছেন সেভাবেই প্রকাশ হইবে। তবে ইহাদের কোনটি কিভাবে অর্জিত হইবে সেজন্য আল্লাহ পাক মাধ্যমও নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাল জিনিস অর্জন করার জন্য এক প্রকার মাধ্যম নির্ধারণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মন্দ জিনিস অর্জন করার জন্য অন্য এক প্রকার মাধ্যম নির্ধারণ করিয়াছেন। কোন বিবেকবান ব্যক্তি ইহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারে না। তকদীরের বিবেচনায় চিকিৎসা করা আর না করা দোয়া করা আর দোয়া না করার ন্যায়। কেননা দোয়া করিলেও বুঝিতে হইবে যে, দোয়া করা তাহার তকদীরে ছিল তাই দোয়া করিয়াছে। আর দোয়া বর্জন করিলেও বুঝিতে হইবে যে, দোয়া বর্জন করাই তাহার তাকদীরে ছিল। অনুরূপভাবে চিকিৎসা করার ফয়সালাও তদ্রূপ। চিকিৎসা করিলে বুঝিতে হইবে যে, তকদীরে নির্ধারিত ছিল বলিয়া চিকিৎসা করিয়াছে। আর চিকিৎসা বর্জন করিলেও বুঝিতে হইবে যে, চিকিৎসা বর্জন করা তকদীরে নির্ধারিত ছিল বলিয়াই চিকিৎসা বর্জন করিয়াছে। অনুরূপভাবে চিকিৎসার ফলাফলও তকদীরের উপর নির্ভরশীল। তকদীরে থাকিলে চিকিৎসার দ্বারা ফল পাওয়া যাইবে। অন্যথায় নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কেহই এই অভিমত প্রকাশ করিতে পারিবে না যে, চিকিৎসা বিদ্যা সম্পূর্ণ বাতিল ও অর্থহীন। আর আল্লাহ পাক ঔষধে কোন প্রভাবই রাখেন নাই।

আল্লাহ পাক ঔষধে প্রভাব রাখার পূর্ণ শক্তি রাখেন। আর বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা প্রকাশও করিয়া দেখাইয়াছেন। যেমন, সকমুনিয়া, সানা, হুব্বে মামলুক প্রভৃতি ঔষধে এমন মজবুত ও শক্তিশালী প্রভাব রাখিয়াছেন যে, ইহাদের পূর্ণ মাত্রা সেবন করিলে দাস্ত না হইয়া উপায় নাই। অনুরূপভাবে সাম্মুল ফার, বলীশ এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষাক্ত ঔষধে এমন মারাত্মক প্রভাব রাখিয়াছেন

যে, ইহাদের পূর্ণমাত্রা পান করার ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে এই বিষয়ে কেন সন্দেহ করা যাইবে যে, আল্লাহ পাক স্বীয় মকবুল বান্দাদের দৃঢ় বিশ্বাসমূলক মনোযোগে ভরপুর দোয়াসমূহ মৃত জিনিসের ন্যায় রাখিয়া দিবেন? ইহাতে সামান্য প্রভাবও থাকিবে না? নিশ্চিয়ই দোয়ার মধ্যে কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের ওয়াদা হইল যে, দোয়া কবুল হইয়া থাকে। অনেক সময় যাহা দোয়া করে তাহাই পাইয়া থাকে। অনেক সময় যাহা দোয়া করে তদাপেক্ষা উত্তম জিনিস পাইয়া থাকে। অনেক সময় দুনিয়ায় পায়, অন্যথায় পরকালে পায়।

সারকথা, দোয়ার মধ্যে কোন না কোন প্রভাব অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। যদিও ইহার প্রকাশ তকদীরের উপর নির্ভরশীল। তবে যে ব্যক্তি ঔষধের প্রভাব সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা রাখে না এবং দোয়া কবুল হওয়ার কথা স্বীকার করে না সে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুল্য, যে অনেক দিন পর্যন্ত কয়েক বৎসরের পুরাতন ও প্রভাব নষ্ট কোন ঔষধ ব্যবহার করিয়াছে। এখন ঔষধের ফল না পাওয়ার কারণে বলিয়াছে যে, ইহাতে কোন প্রভাব ও উপকারিতা নাই।

প্রশ্নঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন দোয়া কোন কাজে আসে না? ইহার ভিতর কোন প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না।

জওয়াবঃ আমরা বলিব যে, শুধু দোয়া সম্পর্কে এই প্রশ্ন কেন? ঔষধেরও তো একই অবস্থা। অনেক সময় ঔষধেও তো কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ঔষধ কি কখনও কাহারও মৃত্যুকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিয়াছে? অথবা ঔষধ কোন কোন সময় উপকারে না আসা কি অসম্ভব? তাহা কখনও নহে। বরং ঔষধের মধ্যে এই ত্রুটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ কি কখনও ঔষধের প্রভাব অস্বীকার করিয়াছে? ইহা বাস্তব যে, তকদীর প্রত্যেক জিনিসকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তকদীরের বাহিরে কিছুই নাই। তাই বলিয়া তকদীর জ্ঞানকে অস্বীকার করে নাই এবং মাধ্যমকে অক্ষম ও অপারগ করিয়া দেখায় নাই। বরং যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখ– তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের দৈহিক ও রূহানী অবস্থার কারণসমূহও তকদীর হইতে পৃথক নয় উদাহরণ স্বরূপ, কোন অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়া তকদীর মোতাবেক হয়–

তাহা হইলে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাহার পক্ষে কাজ করিবে। আর দৈহিক অবস্থাও এমন এক পর্যায়ে পৌছিবে যে, দেহ এই চিকিৎসার দ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে। তখন ঔষধ তাহার দেহে তীরের ন্যায় কাজ করিবে। দোয়ার বিধানও অনুরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন দোয়া কবুল করার ইচ্ছা করেন তখন দোয়া কবুল হওয়ার সমস্ত শর্ত দোয়ার মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ / জানাযার নামাম

মৃতব্যক্তির জন্য জানাযার নামায পড়ার রহস্য

বিবেকের চাহিদা হইল যে, যখন কোন এক দল মানুষ কোন এক ব্যক্তিকে কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবারে লইয়া গিয়া তাহার জন্য সুপারিশ করিতে থাকে, তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করে, তাহার পক্ষে কাকুতি মিনতি করে– তখন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। সে ক্ষমা লাভ করে। জানাযার নামাযের রহস্য ইহাই। অর্থাৎ জানাযার নামায এই জন্যই নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, একদল মুমিন ব্যক্তি মৃতব্যক্তির জন্য সুপারিশ করাতে শরীক হওয়া তাহার প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হওয়ার পরিপূর্ণ প্রভাব রাখে এবং রহমত নাযিলের ওসিলা হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا
اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ

কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর যদি তাহার জন্য এমন চল্লিশ ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে যাহারা আল্লাহর সাথে শিরক করে নাই, আল্লাহ পাক ঐ মৃতব্যক্তির জন্য তাহাদের সুপারিশ কবুল করেন।

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ মানুষের রূহ দেহ পরিত্যাগ করার পরও আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলি সাথে সাথেই অক্ষম হইয়া পড়ে না; বরং ইহাতে অনুভূতি অবশিষ্ট

থাকে। জাগতিক জীবনে যেসব জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল আর যেসব চিন্তাধারা করিয়াছিল ঐগুলি তখন পর্যন্ত তাহার সাথে থাকে। এই সময় উর্ধ্ব জগত হইতে তাহার প্রতি অন্য এক ধরনের জ্ঞান অবতীর্ণ হইতে থাকে। ইহার কারণেই অনেক মানুষের প্রতি আযাব অবতীর্ণ হয় অথবা সে সওয়াব লাভ করিয়া থাকে। এই সময় আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের রূহের শক্তি যদি উর্ধ্ব জগতে পৌঁছে আর মৃতের জন্য কাকুতিমিনতি করিয়া দোয়া করিতে থাকে, অথবা মৃতের জন্য সদকা দিতে থাকে– তাহা হইলে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে এমন নির্দেশ হয় যাহা মৃতব্যক্তির জন্য উপকারী হইয়া থাকে।

মৃতব্যক্তির পরিবারের লোকদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা

যেহেতু মৃতব্যক্তির পরিবার পরিজন তাহার মৃত্যুর কারণে বেদনাহত থাকে কাজেই অন্যান্য লোকের কাছে তাহাদের কিছু ইহকালীন হক রহিয়াছে। যেমন, অন্যান্য লোকদের দায়িত্ব রহিয়াছে– তাহাদের কাছে আগমন করা এবং তাহাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা, যাহাতে সমবেদনা জ্ঞাপনের দ্বারা তাহাদের ব্যথা বেদনার কিছুটা উপশম হয়। মৃতের দাফনের কাজে শরীক হইয়া তাহার পরিবার পরিজনকে সহায়তা করা তাহাদিগকে একদিন এবং একরাত্র আহার করানো।

অনুরূপভাবে কিছু পরকালীন হকও রহিয়াছে। যেমন, তাহাদিগকে মহা প্রতিদান লাভের কথা শুনানো, যাহাতে তাহারা সর্বদা পেরেশানী ও শোকে নিমজ্জিত না থাকে এবং আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে। অধিকন্তু উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা, কাপড় ছিড়া এবং বুকে–পীঠে হাত মারা এবং এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকে, যাহা বিপদাপদ ও মুছীবতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আর যেসব কাজ তাহাদের দুঃখ–বেদনা, ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করে ঐ সব কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করা। কেননা এই সময় মৃতের পরিবার পরিজনরা অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায়। সুতরাং তাহাদের অসুস্থতার চিকিৎসা করা চাই। এমন কোন কাজ না করা চাই যাহা তাহাদের ব্যথা বেদনাকে বাড়াইয়া তোলে। সুতরাং মৃতের পরিবার পরিজনের এইসব হক আদায় করিবার জন্য তাহাদের কাছে গিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে হয়।

ফরযে কেফায়ার বিধান চালু হওয়ার রহস্য

কোন কোন ফরয কাজ এমনও রহিয়াছে যাহা কোন স্থানের কেহ কেহ পালন করিলেই সকলের পক্ষ হইতে পালন হয় এবং সকলের দায়িত্ব আদায় হইয়া যায়। কারণ সকলে একত্র হইয়া যদি এইসব কাজ করা শুরু করে তাহা হইলে তাহাদের জীবন চলার ব্যবস্থা হরমদরম হইয়া যাইবে। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের যে ব্যবস্থা তাহাদের দ্বারা হয় তাহাতে ত্রুটি দেখা দিবে। সুতরাং এই ধরনের কাজ সম্পাদন করার জন্য এক একজন ব্যক্তিই যথেষ্ট। যেমন, অসুস্থ ব্যক্তির পরিদর্শন করা, জানাযার নামায পড়া। ইহারা এইভাবেই বৈধ হইয়াছে, যাহাতে মৃতব্যক্তি ও রোগী সম্পর্কিত কার্য সম্পাদিত হয়। তাহাদের অধিকার নষ্ট না হয়। কিছু লোক এই কাজ পুরা করে আর উদ্দেশ্যও হাসিল হয়।

জানাযার নামায আর দান খয়রাতের দ্বারা মৃতব্যক্তি উপকৃত হওয়ার রহস্য

দুনিয়াতে সুপারিশ করার এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দ্বারা অপরাধীর শাস্তি অহরহ মওকুফ হইয়া যাইতেছে। অথবা উঠিয়া যাইতেছে। এই সম্পর্কে প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। সকলেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিতেছে। ইহা অস্বীকার করার অবকাশ নাই। অনুরূপভাবে জানাযার নামায মৃতব্যক্তির জন্য সুপারিশ। সুতরাং জানাযার নামায ও আর্থিক দান মানুষের জন্য উপকারী হইয়া থাকে। কুরআন কারীমে এই ধরনের কাজের অনেক আলোচনা আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন–

اِن اللّٰهَ اَمَرَكُم بِالصَّدَقَةِ فَاِنّ مثل ذٰلِكَ كَمثَل رجلٍ اسره العَدو فَاوثقُوا يَدَيه اِلٰى عُنُقِه وَ قدمُوه لِيَضرِبُوا فَقَالَ اَنَا افدى مِنْكُمْ بِكُلِّ قَلِيْلٍ وَ كَثِيْرٍ فَفَدٰى نَفْسَه مِنهُم ‌×

"আল্লাহ পাক তোমাদিগকে দান করার নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা দান করার উদাহরণ যেমন, এক ব্যক্তিকে তাহার শত্রুরা বন্দী করিয়া তাহাকে মারিবার জন্য তাহার উভয় হাত গ্রীবা দেশের পিছনে নিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে।

তখন সে বলিল, আমার কাছে কমবেশী যাহা কিছু আছে তাহার বিনিময়ে তোমাদের হাত থেকে মুক্তি চাহিতেছি। অতঃপর মুক্তিপণ দিয়া নিজকে তাহাদের থেকে মুক্ত করিয়া লইল।"

মৃতব্যক্তির নেককার সন্তানাদি এবং দানখয়রাত মৃতের উপর হইতে আযাব দূর করিবার এবং আযাব মাওকুফ করিবার জন্য বড়ই উপকারী। কেননা এইসব বিষয় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপযোগী।

নারী পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পর তিনদিন শোক প্রকাশ করিবে আর স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করিবে— ইহার হেকমত

স্বীয় পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পর তিন দিন অপেক্ষা অধিক শোক প্রকাশ করিতে নারীদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। আবার স্বীয় স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করা তাহাদের জন্য ওয়াজিব করা হইয়াছে। এই বিষয়টি শরীয়তের সৌন্দর্য, হেকমত এবং সাধারণ কল্যাণের পরিচায়ক। কেননা মৃতব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করার অর্থ মৃত্যুর বিপদকে বড় মনে করা।

আর জাহিলিয়াতের যুগে ইহাতে অনেক অতিরঞ্জিত করা হইত। সাথে সাথে বুকের দিক দিয়া কাপড় ছিড়িয়া ফেলা, চিবুকের উপর হাত মারা, পিটানো, চুল টানিয়া ছিড়িয়া ফেলা, হাউমাউ করিয়া ক্রন্দন করা প্রভৃতি কুপ্রথাও চালু ছিল। নারীদিগকে একটি সংকীর্ণ, অন্ধকার নির্জন প্রকোষ্ঠে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আটকাইয়া রাখা হইত। সেখানে থাকা অবস্থায় তাহারা কোন সুগন্ধি ও তৈল ব্যবহার করিতে পারিত না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোন কাপড় পরিধান করিতে পারিত না। তাহাদিগকে গোসল করিতে দেওয়া হইত না। এই ধরনের আরও হাজারো কুপ্রথা সেযুগে চালু ছিল, যাহা আল্লাহর প্রতি, তাঁহার ফয়সালা ও তকদীরের প্রতি তাহাদের গোস্বারই প্রকাশ ছিল। আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তাহাদের এইসব কুপ্রথাসমূহ বাতিল করিয়াছিলেন। আর ইহার পরিবর্তে আমাদিগকে ধৈর্য্য ধারণ করার, আল্লাহ পাকের প্রশংসা করার এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ার নির্দেশ দিয়াছেন। আর

এই আমলটি বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য উভয় জাহানের উপকারী। যেহেতু কাহারো মৃত্যুর পর তাহার পরিবার পরিজনের মধ্যে ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ পেরেশানী পয়দা হওয়া মানবের স্বভাব। আল্লাহ পাক তো মানুষের সর্বাবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাই তিনি তাহাদের স্বভাবজাত বিষয়টি সামান্য হইলেও বৈধ রাখিয়া দিলেন। তাহা হইল মৃত্যুর পর মাত্র তিন দিন শোক প্রকাশ করা। এই তিন দিনের ভিতর বিপদগ্রস্ত পরিবার পরিজন নিজেদের ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করিবে। যেমন, বিদায় হজ্জের বৎসর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদিগকে হজ্জ আদায় করার পর মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়া ছিলেন। তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বড় ক্ষতির কারণ হইবে। কেননা তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করিলে শোক স্থায়ী হইয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইবে। এই জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, তিন দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ করাতেও ক্ষতি রহিয়াছে, যদিও ক্ষতির পরিমাণ অল্প। কিন্তু নারীদের মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই তিন দিনকে নগণ্য মনে করা হইয়াছে। কেননা মানুষকে তাহাদের অভ্যাস হইতে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া রাখা বড় মুশকিল ব্যাপার। ইহার ফলে তাহারা খুব কষ্টে পতিত হয়। তাই তাহাদের অভ্যাসগত কতক বিষয়কে তাহাদের জন্য বৈধ রাখিয়া অপরগুলি হইতে বিরত রাখিলে তাহাদের জন্য বিষয়টি অনেক সাবলীল হইয়া যায়। কারণ কেহ যখন তাহার উদ্দেশ্যের কিছু অংশ অর্জন করিয়া ফেলে অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করা তাহার জন্য সোজা হইয়া যায়। এই হিসাবে তিন দিন শোক প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আর স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশদিন শোক প্রকাশ করার হেকমত অত্র গ্রন্থের বিবাহশাদী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।

মৃত মুসলমানকে মাটির নীচে দাফন করার এবং অগ্নিতে না জ্বালানোর হেকমত

১। মৃতব্যক্তিকে দাফন করা হইলে তাহার দেহের গোপনীয়তা রক্ষা করা হইল। আর ইহা জীবিত লোকদের জন্যও তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।

মৃতব্যক্তিকে পানি বা বাতাসে রাখিয়া দেওয়া হইলে তাহার গলিত দেহের দুর্গন্ধের কারণে জীবিত মানুষের নাকের ক্ষতি হইত। আর ইহার দিকে দৃষ্টি পড়িলে ঘৃণার উদ্রেক হইত। ফলে চোখের ও দেহের ক্ষতি হইত। যদি অগ্নিতে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অবশ্য এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মৃতদেহ দুর্গন্ধযুক্তও হইবে না, আবার ঘৃণারও উদ্রেক হইবে না। কিন্তু দেহটি পুড়ানোর সময় যে এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়– তাহা যাহারা পুড়ানোর কার্যে অংশগ্রহণ করে– তাহারা এবং আশপাশের লোকেরাই অবগত আছে। অধিকন্তু পুড়ানোর ফলে আবহাওয়া দুষিত হওয়ার এবং ইহার কারণে নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। কিন্তু মৃতব্যক্তিকে দাফন করার মধ্যে এইসব অসুবিধা নাই এবং আবহাওয়াও দুষিত হয় না। বরং দেহের বন্ধন খুলিয়া যাওয়ার পর মৃতদেহের চারটি মৌলিক উপাদান স্ব স্ব স্থানে পৌঁছিয়া যায়। এই জন্য মাটি, পানি, বাতাস এবং অগ্নির পরিমাণে কখনও পরিবর্তন আসে না। পূর্ব হইতে যে পরিমাণ ছিল সর্বদাই একই পরিমাণ বিদ্যমান থাকে।

২। অগ্নির উত্তাপে মাটির উর্বরাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সকলেই অবগত আছে। আর মৃতব্যক্তিকে দাফন করার ফলে মাটির উর্বরাশক্তি সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহা কাহারোও কাছে গোপনীয় নহে। অগ্নির উত্তাপে মাটির উর্বরাশক্তি নষ্ট হওয়ার প্রকাশ্য হেতু ইহার যুক্তি বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে দাফন করার ফলে উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হইল যে, মানব দেহ এমন একটি জিনিস যাহা উর্বরাশক্তির পূর্ণ জোর পাওয়ার ফলে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। কারণ খাদ্য খাওয়ার পর মানব দেহে রক্ত সৃষ্টি হয়। আর রক্ত থেকে বীর্য সৃষ্টি হয় এবং বীর্য হইতে মানব দেহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং মানব দেহের মূল উৎস খাদ্যশস্য ফলমূল। আর খাদ্য শস্য জন্মলাভ করে মাটির উর্বরাশক্তি হইতে। অধিকন্তু মানবদেহের শুধু সৃষ্টি নয় বরং তাহার প্রতি পালনও হয় খাদ্য–শস্যের ও ফলমূলের দ্বারাই। আর খাদ্য–শস্য ও ফলমূল এইসব কিছু উর্বরাশক্তিরই মাধ্যমে জন্মলাভ করে। এমনকি ইহাদের মধ্যে রং, গন্ধ এবং স্বাদও উর্বরাশক্তিরই কার্য ফল।

সারকথা– উর্বরাশক্তি বড় কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে মাটি হইতে মানব দেহ প্রস্তুতের উপাদানগুলি বাহির করিয়া আনে। দাফনের এক স্থানে একত্রিত

এই উপাদানগুলি উর্বরাশক্তির সাথে মিশিয়া যায়। হয়তবা এই জন্যই কবরস্তান ও উহার আশেপাশে বৃক্ষলতা অধিক বৃদ্ধি পায়। আর তাহা কেন হইবে না? অথচ মানুষের মলমূল যাহা মানুষের খাদ্যের অসার পদার্থ। ইহার দ্বারাই তো যমীনের উর্বরাশক্তি কত বৃদ্ধি পাইয়া যায়। আর মানব দেহ যাহা মানবের খাদ্যের সার পদার্থের নির্ঝাস আর ইহার শক্তিও মলমুত্র অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং ইহা দ্বারা উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া তো স্বাভাবিক।

সারকথা– অগ্নির দ্বারা উর্বরাশক্তি ধ্বংস হওয়া আর মানব দেহ দ্বারা উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সন্দেহাতীত বিষয়। এই কারণেই হিন্দুদের শসনে বৃক্ষলতার নামনিশানাও পাওয়া যায় না। আর মুসলমানদের কবরস্তান সর্বদা বৃক্ষলতায় সবুজ শ্যামল হইয়া থাকে।

৩। সন্তানের কল্যাণকামী পিতা সফরে যাওয়ার সময় স্বীয় সন্তানদিগকে স্নেহময়ী মাতার কাছেই রাখিয়া যায়। তাহাদের মাতার সতীনের কাছে রাখিয়া যায় না। এই নীতির আলোকে বিচার করিলে মাটি দ্বারা প্রস্তুত মানব দেহকে মাটির কাছে সোপর্দ করাই সঙ্গত। অগ্নির হাতে সোপর্দ করা সঙ্গত নয়।

সারকথা; রূহ মাটির দেহের অভিভাবক ও যিম্মাদার। রূহের দ্বারাই ইহার নেগরানী ও লালন–পালন হয়। আর ভূমণ্ডল দেহের জন্য স্নেহময়ী মাতা। মানুষ মাটি হইতে সৃষ্টি হওয়াই মাটি মানব দেহের মাতা হওয়ার দলীল। আর রূহের উর্ধ্ব জগতের দিকে চলিতে থাকা উহার সফর। রূহ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় যদি দেহকে মাটির কাছে সোপর্দ না করিয়া অগ্নির কাছে সোপর্দ করে– তাহা হইলে ইহা পিতাকর্তৃক সন্তানকে স্নেহময়ী মাতার সতীনের কাছে সোপর্দ করার ন্যায় হইল।

৪। যদি কোন ব্যক্তির অনেকগুলি কবুতর থাকে আর অন্য এক ব্যক্তির একটি কবুতর স্ব ইচ্ছায় তাহার কবুতরগুলির সাথে আসিয়া মিলিয়া যায়, অথবা এক ব্যক্তির এক পাল ছাগল রহিয়াছে আর অন্য কোন এক ব্যক্তির একটি ছাগল তাহার ছাগলের পালের সাথে স্ব ইচ্ছায় মিলিত হইয়াছে– তাহা হইলে কবুতর বা ছাগলের মালিকের উচিত অন্যের হক পৃথক করিয়া অন্যকে ফেরত দিয়া দিবে। কিন্তু অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি মালিকের কবুতরগুলি বা ছাগলগুলি স্বীয় নিয়ন্ত্রণে লইয়া আসার বা মালিকের কবুতর বা ছাগলগুলি

ধ্বংস করিয়া দেওয়ার কোন অধিকার রাখে না। এই বিধান মোতাবেক মাটির এই দেহকে মাটিতে কবরস্থ করাই সঙ্গত, যাহাতে বাতাস এবং অগ্নিকে পৃথক করিয়া মুক্ত করিয়া দিতে পারে, যাহাতে ইহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। অথবা পানি, অগ্নি ও বায়ুমণ্ডলসমূহ স্ব স্ব জাতীয় জিনিসকে নিজের দিকে টানিয়া লইতে পারে। কেননা পানি, বায়ু এবং অগ্নির নড়াচড়া উল্লিখিত দুই অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহাদের নড়াচড়া সম্পর্কে পদার্থবিদদের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। অধিকাংশ ইউনানী হাকীমদের অভিমত হইল যে, আগুন, পানি, বাতাস নিজে নিজেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। ফিরিঙ্গী হাকীমদের অভিমত হইল যে, ইহারা স্বজাতীয়দের আকর্ষণ করিয়া নিজের সাথে মিলাইয়া লয়।

মোটকথা; মৃতদেহকে মাটির উদরে সোপর্দ করাই সঙ্গত, অগ্নির কাছে সোপর্দ করা সঙ্গত নয়। কারণ মানব দেহের আপাদমস্তক মাটি। অবশ্য দেহের আর্দ্রতা, বায়বীয় পদার্থের প্রভাব ও উষ্ণতা দেখিয়া বুঝা যায় যে, পানি, বায়ু এবং অগ্নি আসিয়া ইহার সাথে মিলিত হইয়াছে। মাটি জবরদস্তি করিয়া এইগুলিকে নিজের আয়ত্বাধীন করে নাই। মৃতব্যক্তিকে মাটির নীচে দাফন করার পর মাটি, পানি, বাতাস ও আগুনের সাথে মিলিয়া যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা খুলিয়া পৃথক পৃথক হইয়া যায়। অতঃপর এইসব উপাদান নিজেদের স্থানে চলিয়া যায়। অথবা ইহাদের স্বজাতীয় মূলপদার্থ ইহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া নিজের সাথে জুড়িয়া লয়। যদি মৃতদেহকে আগুনের কাছে সোপর্দ করা হয় তাহা হইলে আগুন এইসব উপাদান ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

৫। নিজেদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হওয়া তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, প্রায় সমস্ত মানুষের মধ্যেও একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, যাহা জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। কিন্তু অন্যান্য জাতির মধ্যে বিদ্যমান নাই। আর মানুষের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক হইবেই না কেন? সকল মানুষ তো একই পিতা আদম আর একই মাতা হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান। আর তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালবাসার কারণেই একজন অপরজনের রক্ষক ও হেফাজতকারী। জীবিতদের পরস্পর পরস্পরের হেফাজত করার

মধ্যে তো কোন কথা নাই; কিন্তু মৃত্যুর পরও দীলে চায় না যে, তাহার দেহটি তাহাদের থেকে পৃথক হইয়া থাক। আর এই কারণেই মৃত্যুর সময় কান্নার রোল পড়িয়া যায়। আর জানাযার খাট উঠানোর সময় তো কথাই নাই। এমতাবস্থায়ও যদি কাছে রাখার অপারগতার কারণে তাহাকে কাছে রাখা সম্ভব না হয়– তাহা হইলে কি ভালবাসার চাহিদা ইহা হইবে যে, তাহাকে আগুনে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেওয়া হউক? মহাব্বতকারী থেকে এমন কাজ কিভাবে হইতে পারে? ইহা তো ভালবাসার চাহিদার পরিপন্থী।

মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার হেকমত

মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার কারণ হইল যে, মৃতব্যক্তির গোসলকে জীবিত মানুষের গোসলের উপর কিয়াস করা হয়। কেননা এই মৃতব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় এইভাবে গোসল করিত। আর গোসলদাতাও এইভাবে গোসাল করিত। অধিকন্তু তাহাকে গোসল দেওয়ার মধ্যে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। গোসলের মাধ্যমে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইহা অপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি আর হইতে পারে না যে, বড়ইগাছের পাতা দ্বারা পানি সিদ্ধ করিয়া তাহাকে গোসল দেওয়া হয়। কেননা অসুস্থ ব্যক্তির দেহ অধিকাংশ সময় ময়লাযুক্ত থাকে। ফলে দেহ দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে। আর বড়ইগাছের পাতা মিশানো পানি ময়লা দূর করা আর দুর্গন্ধ দূর করার কাজে খুব উপকারী। গোসল করানোর সময় ডান দিক থেকে গোসল শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা মৃতদের গোসাল জীবিতদের গোসলের ন্যায়। অধিকন্তু ডান হাতের মর্যাদা বাম হাত অপেক্ষা অধিক।

মৃতব্যক্তির গায়ে কর্পূর ব্যবহারের হেকমত

১। মৃতব্যক্তির গায়ে কর্পূর ব্যবহারের নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, কোন জিনিসে কর্পূর ব্যবহার করিলে তাহা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না।

২। কর্পূর ব্যবহারের মধ্যে এই ফায়দাও রহিয়াছে যে, কোন কষ্টদায়ক জন্তু তাহার কাছে আসিতে পারে না।

৩। অধিকন্তু যেসব পোকামাকড় মাটিতে জন্মলাভ করে তাহা কর্পূরের গন্ধে দূর হইয়া যায়। অবশ্য মৃতব্যক্তির বদ আমলের কারণে যেসব সাপবিচ্ছু

কবরে তাহাকে দংশন করার জন্য রাখা হয়- তাহা কোন কিছুকে ভয় করে না। আবার কোন কারণে পলায়নও করে না। বরং দুনিয়ার কোন শক্তি ইহার মোকাবিলা করিতে পারে না। তবে দান এবং দোয়া করার দ্বারা এইগুলি ফিরিয়া থাকে।

সিজদা করিতে দেহের যে সাতটি অঙ্গ ব্যবহৃত হয় তাহাতে কর্পূর ব্যবহার করিতে হয়। অঙ্গ সাতটি হইল কপাল, দুই হাঁটু, দুই পা এবং দুই হাত। এই সাতটি অঙ্গ সিজদা করিতে ব্যবহার করা হয় বলিয়া ইহাদের উপর কর্পূর লাগানো হয়। যেহেতু ইহারা সিজদা করিতে ব্যবহৃত হয় তাই ইহারা অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল। কর্পূর ব্যবহারে সাত অঙ্গ নির্ধারিত হওয়ার ইহাও এক কারণ। অধিকন্তু এই সাত অঙ্গ থেকে সমুদয় দেহ প্রস্তুত করা হয়। ইহাদের উপর কর্পূর ব্যবহার করা সমগ্র অঙ্গে কর্পূর ব্যবহার করার সমতুল্য।

শহীদকে গোছল না দেওয়া এবং রক্তমাখা কাপড়সহ দাফন করার কারণ

১। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যক্তিকে গোসল না দেওয়ার এবং রক্তমাখা কাপড়ের সাথে দাফন করার তরীকা জারী রহিয়াছে, যাহাতে মানুষ তাহার শহীদ হওয়া সম্পর্কে অবগত হইতে পারে। আর বাহ্যিকভাবে হইলেও তাহার আমল অবশিষ্ট থাকার চিত্র তাহাদের সামনে আসিয়া যায়। অধিকন্তু মানুষের আত্মা যখন তাহার দেহ বর্জন করে তখন তাহার আভ্যন্তরিণ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে। অনুরূপভাবে নিজের জীবন সম্পর্কিত ইলমও বাকী থাকে। বরং যেসব জিনিস তাহার সাথে যায় ঐগুলি সম্পর্কেও তাহার অনুভূতি থাকে। যেহেতু তাহার এক মহান আমলের চিহ্ন তাহার সাথে বহাল রাখা হয় সেহেতু এই চিহ্নের বদৌলতে অবশ্যই তাহার নিজের আমল স্মরণ হইবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

جروحهم تَرى اللَّون لون دم و الرِّيْحُ رِيْحُ المِسْكِ

"শহীদদের ক্ষতস্থানসমূহের রক্ত প্রবাহিত হইবে। তাহাদের রক্তের রং রক্তের ন্যায়ই হইবে। আর গন্ধ মিশকের ন্যায় হইবে।"

২। মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া হয় এবং পাক করা হয়, যাহাতে সে পবিত্র অবস্থায় খোদা তা'আলার সাথে মিলিত হইতে পারে। আর মৃত্যুর পর শরয়ী পবিত্রতাসহ আলমে বরযখে আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাত করিতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ মরার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হইয়া যায়। তাহাকে গোসল দেওয়া হয় না, কারণ সে মৃত্যুর সাথে সাথেই আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হইয়া যায়।

জানাযার নামাযে মুক্তাদীকে দোয়া পড়িতে হয় কেন?

জানাযার নামায নিজের জন্য দোয়া নহে বরং অন্যের জন্য দোয়া। অর্থাৎ ইহা এক প্রকার সুপারিশ। আর সুপারিশকারীর সংখ্যা অধিক হইলে অধিক ফলপ্রদ হয়। এই জন্য জানাযার দোয়া পড়াতে সকলে শরীক হইতে হয়।

জানাযার নামাযে ইমাম মৃতব্যক্তির বক্ষ বরাবর খাড়া হয় কেন?

মানব দেহের আপাদমস্তক সকল অঙ্গই শরীয়তের নির্দেশ পালনের জন্য আদিষ্ট। আর বক্ষদেশের অভ্যন্তরে অন্তর অবস্থিত, যাহা সমুদয় দেহের নির্দেশদাতা বা বাদশাহ। ইহার নির্দেশেই সমস্ত অঙ্গ পরিচালিত হয়। নেকী বদীর সমস্ত নির্দেশ এখান থেকেই বাহির হয়। সুতরাং সুপারিশকারী ইমাম ইহার বরাবর খাড়া হওয়াই সঙ্গত, যাহাতে ইমাম আল্লাহ পাকের সামনে রাখিয়া ইহার সুপারিশ করিতে পারে। সুতরাং যখন অন্তরকে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে তখন সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ ইহার অধীনে থাকিয়া মাফ পাইয়া যাইবে। কেননা দেহের সমস্ত অঙ্গ ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে অন্তরের অধীন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اِنَّ فِيْ الجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ الجَسَدِ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِر الجَسَدِ اَلَا وَ هِيَ القَلْبُ *

"শরীরের মধ্যে গোশতের একটি টুকরা রহিয়াছে- যখন তাহা ঠিক হইয়া যায়- তখন সমুদয় দেহ ঠিক হইয়া যায়। আর যখন ইহা নষ্ট হইয়া যায় তখন সমুদয় দেহ নষ্ট হইয়া যায়। জানিয়া রাখ- ঐ টুকরাটি হইল- অন্তর।"

সুতরাং যখন অন্তরের জন্য সুপারিশ কবুল হইয়া যাইবে তখন সমুদয় দেহের জন্য সুপারিশ কবুল হইবে।

জানাযার নামায শেষ করিয়া ডানে বামে সালাম ফিরানোর কারণ

ইমাম সাহেব যেন এই জগত পরিত্যাগ করিয়া মৃতব্যক্তির সুপারিশের জন্য উর্ধ্বজগতে আল্লাহর দরবারে পৌছিয়া গিয়াছিলেন। যখন ঐ দরবার থেকে অবসর হইয়া মানুষ এবং ফিরিশতার দিকে ফিরিয়া আসেন তখন আগন্তুকের তরীকায় উপস্থিত সকলকে সালাম করেন। যেমন, সাধারণভাবে নামাযীরা এইরূপ করিয়া থাকে। অধিকন্তু কৃত সুপারিশ কবুল হওয়ার সুধারণা পোষণ করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে এবং মৃতব্যক্তিকে নিরাপত্তার ও সুপারিশ কবুল হওয়ার পয়গাম শুনাইতেছেন। কবি বলেন–

جاں سفر رفت و بدن اندر قیام + وقت رجعت زاں سبب گوید سلام

"অন্তর সফরে গিয়াছে এবং দেহ এখানেই রহিয়াছে। এই কারণেই ফিরিয়া আসার সময় সালাম বলে।"

জানাযার নামাযে রুকু, সিজদা ও তাশাহুদের জন্য বৈঠক না থাকার কারণ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, জানাযার নামায নিছক এক প্রকার সুপারিশ। মৃতব্যক্তির জন্য এই সুপারিশ করা হয়। কিন্তু রুকু সিজদার অবস্থা ইহার বিপরীত। কেননা রুকু সিজদাতে প্রচুর বিনয় নম্রতা প্রদর্শন করা হয় এবং আল্লাহ পাকের সীমাহীন বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করা হয় আর জানাযার নামাযে আল্লাহ পাকের প্রশংসা, তাসবীহ করা হয় এবং অন্যের অপরাধ মার্জনার জন্য আবেদন করা হয়। ইতিপূর্বে রুকু সিজদার হাকীকত বর্ণনা করার সময় আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায় / যাকাত

যাকাত ও সদকার নামকরণের তাৎপর্য্য

যাকাত শব্দটি তাযকিয়া শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে। তাযকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্র করা। যাকাতের অর্থ পবিত্রতার উন্নতি। যেহেতু যাকাত মানুষের জন্য কৃপণতা, গোনাহ এবং আযাব থেকে পবিত্র হওয়া, মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। আর সম্পদ ও অন্তরের উন্নতির পথ। তাই এই কার্যের নাম যাকাত রাখা হইয়াছে। আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا *

"তাহাদের সম্পদ থেকে আপনি সদকা গ্রহণ করুন। ইহা তাহাদিগকে পবিত্র করিবে আর আপনি ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে সংশোধন করিবেন।"

এই কার্যের নাম সদকা রাখা হইয়াছে। কারণ, এই কার্যের দ্বারা সদকা প্রদানকারীর ঈমানের সত্যতা প্রতিপাদন হয়। আর এই কার্য তাহার আন্তরিক অবস্থা অর্থাৎ তাহার নিয়তের সত্যতা ও পরিচ্ছন্নতার নিদর্শন।

যাকাতের নিগূঢ় রহস্যসমূহ

১। মানবের জীবন ধারণের ভিত্তিমূলক অবলম্বন হইল সম্পদ। কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের মাধ্যমে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ধনসম্পদ উপার্জন করিতে হয়। তাহার কষ্টার্জিত এই প্রিয় সম্পদ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ব্যয় করে তখন কৃপণতার কলুষতা তাহার অন্তর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সাথে সাথে তাহার ঈমানের মধ্যে মজবুতি ও দৃঢ়তা জন্ম লাভ করে। কেননা মেহনত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ–সম্পদ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা উত্তম কামাই। ইহার মাধ্যমে নফসের অপবিত্রতা অর্থাৎ কৃপণতা দূর হইয়া যায়। কারণ কৃপণতা মুক্ত হওয়ার জন্য স্বীয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে

উপার্জিত অর্থ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্যকে দিয়া দেওয়া অবস্থার উন্নতির পরিচায়ক। অধিকন্তু ইহার দ্বারা পরিষ্কারভাবে কৃপণতার কলুষতা হইতে পবিত্রতা অর্জিত হয় এবং মহান দয়াময় আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কের মধ্যে উন্নতি সাধিত হয়। কেননা স্বীয় প্রিয় সম্পদ আল্লাহর জন্য পরিত্যাগ করা মনের উপর চাপ পড়ে। ফলে সম্পদ দিয়া দেওয়া খুব কষ্ট হয়। এই কষ্টটুকু বরদাশত করার কারণেই আল্লাহর সাথে সম্পর্কে উন্নতি লাভ হয়। আর ইমানী দৃঢ়তা ও মজবুতিও বৃদ্ধি পায়।

২। যাকাত প্রদানের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সহমর্মিতা শিখানো হইয়াছে। এইভাবে ধনী গরীবের মিলনের দ্বারা মুসলমানদের অবস্থার সংশোধন হইয়া যায়। ধনীদের দায়িত্বে ফরয হইল যাকাত আদায় করা। যদি ফরয নাও হইত তবুও মানুষের সহমর্মিতার চাহিদা হইল- ধনীরা গরীবদিগকে সাহায্য সহযোগিতা করা সহমর্মিতা মানুষের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের গুণ। আর যাকাত প্রদানের কার্য সহমর্মিতার প্রভাবশীল নিদর্শনগুলি প্রকাশ করিতেছে। প্রতিটি নির্মল স্বভাব ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, এই কাজটি করার দ্বারা মানব-জাতির সাথে সহমর্মিতা হয়। ইহা এমন একটি গুণ, অনেক উত্তম চরিত্র অর্জন যাহার উপর নির্ভর করে। ইহার দ্বারা মানুষের মধ্যে উত্তম আচরণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে ব্যক্তির মধ্যে মানুষের প্রতি সহমর্মিতা নাই- তাহার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে। আর যাহার মধ্যে এই ত্রুটি রহিয়াছে- ইহার সংশোধন তাহার দায়িত্বে ওয়াজিব। আর গরীব ও দরিদ্র মানুষকে দান করার দ্বারা এই সংশোধন অর্জিত হয়।

৩। গোনাহ দূর করার জন্য এবং বরকত বাড়ানোর জন্য যাকাত প্রদান একটি উত্তম মাধ্যম।

৪। অনেক গরীব দুঃখী ও অভাবী লোকজনও শহরের মধ্যে বসবাস করে। এই বিপদ আজ একজনের উপর আর আগামীকাল অন্যের উপর পতিত হয়। যদি অভাব ও দরিদ্রতা মোচনের এই পন্থা না থাকিত তাহা হইলে গরীব ও অভাবীরা ধ্বংস হইয়া যাইত এবং ক্ষুধায় মারা যাইত।

রৌপ্যের যাকাতের নেসাব দুই শত দেরহাম নির্ধারণ করার কারণ

রৌপ্যের যাকাত প্রদানে নেসাব নির্ধারণ করা হইয়াছে দুই শত দেরহাম। কারণ, অধিকাংশ দেশে যদি খাদ্য শস্যের দর কাছাকাছি হয় আর ন্যায্য হয় তাহা হইলে এই পরিমাণ রৌপ্যের মূল্যের খাদ্যশস্য একটি ছোট্ট গোষ্ঠির পুরা এক বৎসরের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। তাই রৌপ্যের পরিমাণ যদি একশত নব্বই দেরহাম হইলেও ইহার যাকাত দিতে হয় না।

পাঁচ উটের দ্বারা যাকাতের নেসাব নির্ধারিত হওয়ার কারণ

উটের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য উটের সংখ্যা পাঁচ পর্যন্ত হওয়া শর্ত। সুতরাং উট পাঁচটি হইলে এক ছাগল যাকাত প্রদান করা ফরয। ইহার যাকাতের নেসাব পাঁচ উট নির্ধারিত হওয়ার কারণ- সম্পদের এক বিরাট পরিমাণের উপর যাকাতের নেসাব হয়। (অর্থাৎ এত পরিমাণ সম্পদ একটি ছোট গোষ্ঠির এক বৎসরের আহার চলে।) সমস্ত পশুর মধ্যে উট মোটামুটি বিরাটকায়। ইহা মানুষের জন্য খুব উপকারী। ইহাকে যবেহ করিলেও অন্যান্য জন্তু হইতে গোশত অধিক হয়। অধিকন্তু ইহা একটি উত্তম বাহন। ইহা দুধও দেয় যথেষ্ট পরিমাণে। বাচ্চাও দেয় অনেক। এমনকি ইহার লোম ও চামড়া উভয়টিই কাজে লাগে। ইহার উপকারের আধিক্যতার দিকে খেয়াল রাখিয়া ইহার পাঁটিকে যাকাতের নেসাবের জন্য উপযোগী মনে করা হইয়াছে। কেননা অতীতকালে কোন উট দশ ছাগলের, কোন উট আট ছাগলের আর কোন কোন উট বারটি ছাগলের সমপরিমাণ মনে করা হইত। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এইসব পরিমাণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। আর ছাগলের যাকাতের নেসাব হইল চল্লিশ ছাগল। এই হিসাবে কমপক্ষে পাঁচটি উট চল্লিশ ছাগলের সমপরিমাণ হয়। যেহেতু প্রতিটি উট আটটি ছাগলের সমপরিমাণ হওয়া সর্বাপেক্ষা নিম্ন তাই ইহার মাধ্যমে উটের নেসাব নির্ধারণ করা হইয়াছে।

ছাগলের যাকাতের নেসাব চল্লিশ হইতে শুরু হওয়ার কারণ

চল্লিশ হইতে শুরু করিয়া একশত ছাগল পর্যন্ত একটি ছাগল যাকাত প্রদান করিতে হয়। অতঃপর দুই শত পর্যন্ত দুই ছাগল। অতঃপর প্রতি শতে একটি

একটি করিয়া ছাগল যাকাত প্রদান করিতে হয়। যাকাতের নেসাব চল্লিশ থেকে শুরু হওয়ার কারণ– ছাগলের পাল ছোট হয় আবার বড়ও হয়। অধিকন্তু ছাগল লালন–পালন করাও সহজ। প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা অনুযায়ী ছাগল পালিতে পারে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচাইতে ছোট পাল দ্বারা যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। ছাগল চল্লিশের কম হইলে উহাকে পাল বলিয়া গণনা করা হইত না। অতঃপর প্রতি শতের উপর একটি একটি করিয়া ছাগল নির্ধারণ করা হইয়াছে, হিসাব সহজ করিবার নিমিত্তে।

গরুর নেসাব ত্রিশ হইতে শুরু হওয়ার কারণ

গরুর সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত পৌছিলে এক বৎসরের বাছুর আর সংখ্যা চল্লিশে পৌছিলে দুই বৎসরের বাছুর যাকাত হিসাবে প্রদান করিতে হয়। গরু; উট ও ছাগলের মধ্যবর্তী জন্তু। ইহার যাকাত এই পরিমান নির্ধারিত হইয়াছে। উভয়ের সাথে ইহার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। (চল্লিশ গরুর মধ্যে এক বাছুর হিসাবে চল্লিশভাগের একভাগ হইল, যাহা ছাগলের যাকাতের সাথে তুলনীয়। আবার ত্রিশ গরুর মধ্যে এক বছরের বাচ্চাও উপরের তুলনায় চল্লিশ ভাগের এক ভাগের ন্যায়। উটের যাকাতও প্রায় এই হিসাবে ছিল।)

যাকাতের নেসাব নির্ধারণ করা, আবার কি পরিমাণ যাকাত দিতে হইবে– ইহাও নির্ধারণ করার রহস্য

যাকাতের নেসাব নির্ধারণ করার কারণ হইল– মালের পরিমাণ কি পর্যন্ত পৌছিলে যাকাত প্রদান করিতে হইবে– যদি তাহা নির্ধারণ না করা হইত, তাহা হইলে যাকাত প্রদান ও যাকাত গ্রহণের ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু হইত না। ইহাতে বাকবিতণ্ডা, ঝগড়াবিবাদ ও মতপার্থক্যের কারণে যাকাতের ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যাইত। আবার কি পরিমাণ যাকাত প্রদান করিতে হইবে– তাহাও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে যাকাত উশুলকারী অধিক উশুল না করিতে পারে। কারণ অধিক উশুল করিলে যাকাত প্রদানকারীর জন্য যাকাত প্রদান ভারী হইয়া যায়। নির্মল বিবেক ও বিশুদ্ধ স্বভাবের চাহিদা হইল যে, মাল অধিক হইলে যাকাতও অধিক প্রদান করা অপরিহার্য। কিন্তু কি পরিমাণ যাকাত প্রদান করিতে হইবে তাহা যদি নির্ধারিত না হইত বরং যাকাত

প্রদানকারীর অভিমতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত– তাহা হইলে যেসব ধনী ব্যক্তির অধিক যাকাত প্রদান করা অপরিহার্য তাহারা অর্থের লোভে অল্প যাকাত দিয়াই রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করিত। ফলে ফকির মিসকীনদের প্রয়োজন মিটিত না।

ফসলের যাকাতের নেসাবের তাৎপর্য

যেসব জমিতে বৃষ্টির পানি এবং নদী, ঝর্ণার পানি দ্বারা শস্য উৎপাদন করে, এইসব জমির উৎপাদিত শস্যের এক দশমাংশ যাকাত হিসাবে প্রদান করা ওয়াজিব। আর যেসব জমিতে খাল, কূয়া প্রভৃতির পানি দ্বারা শস্য উৎপাদন করে– এইসব জমির উৎপাদিত শস্যের বিশভাগের এক ভাগ শস্য যাকাত প্রদান করিতে হয়। কারণ যেসব জমিতে পরিশ্রম কম কিন্তু উৎপাদন বেশী এইসব জমির খাজনাও বেশী হয়। আর যেসব জমিতে পরিশ্রম বেশী আর উৎপাদন কম– এইসব জমির খাজনাও কম হয়।

বৎসরে মাত্র একবার যাকাত আদায় করিবার রহস্য

যাকাত আদায় করার এমন একটি নির্ধারিত সময় থাকা অত্যন্ত জরুরী, যে সময়ে সকল লোকের যাকাত আদায় করা সম্ভব হয়। সাথে সাথে ইহাও জরুরী যে, সময় এত অল্প না হয় যে, আবার তাড়াতাড়ি যাকাত দিতে হয়। আর যাকাত উশুল করাও মুশকিল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সময় এত দীর্ঘও না হয় যে, এই সময়ে যাকাত আদায় করিতে গিয়া কৃপণতা না কমে। আর অভাবী লোকদেরও যাকাতের জন্য খুব অপেক্ষা করার পর যাকাত পাইতে হয়। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যতীত আর কোন পথ বাকী নাই যে, যাকাত উশুল করার জন্য এমন একটি নীতি নির্ধারণ করা হউক যাহা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণ স্বীয় প্রজাদের জন্য করিয়া থাকে। আর মানুষ ইহা সম্পর্কে অভ্যস্থ হয়। কেননা আরব ও আরবের বাহিরে অন্যান্য দেশের লোকেরা যে নীতি সম্বন্ধে অভ্যস্থ তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নীতির মর্যাদা রাখে। আর এই নীতি অবলম্বন করিলে তাহাদের কোন অসুবিধাও হইবে না। অধিকন্তু তাহারা ইহাকে অবলম্বন করিয়াছে বিধায় এই নীতির উপর চলা নিজেদের জন্য ভারীও মনে করিবে না। আর তাহাদিগকে এই নীতির জন্য আদিষ্ট করা আল্লাহ পাকের রহমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইহা গ্রহণ করিয়া লওয়াও তাহাদের জন্য

সহজ হইবে। সকল দেশের শাসক ও প্রজাদের সাধারণ নীতি হইল এই যে, মাশুল দিতে হয়– এমন বস্তুর জন্য এক বৎসর সময় নির্ধারণ করা। অর্থাৎ এই ধরনের বস্তু হইতে বৎসরে একবার মাশুল গ্রহণ করা। কারণ একটি বৎসর এমন একটি সময় যাহাতে বিভিন্ন ঋতু অতিক্রম করে। আর বিভিন্ন ঋতুতে ফসলও বিভিন্ন রকম হয়। কেননা কোন ঋতুতে অধিক দামী জিনিস উৎপন্ন হয়। আবার কোন ঋতুতে অল্প দামী। আবার কোন ঋতুতে মাল অধিক বিক্রি হয় আবার কোন ঋতুতে কম বিক্রি হয়। এই জন্য মাশুল আদায় করিতে এক বৎসর সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

অধিকন্তু এক বৎসরের মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য এই ধরনের কাজে এক বৎসরের সময় নির্ধারণ করা সঙ্গত। এইসব দিক লক্ষ্য করিয়া যাকাত প্রদানের জন্যও এক বৎসরের সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

মাঠে চড়িয়া বেড়ায়– এমন জন্তুর যাকাত প্রদান ওয়াজিব হওয়া আর কার্যে ব্যবহৃত জন্তুর যাকাত না থাকার কারণ

বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ দারে কুতনীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ বর্ণিত আছে যে–

لَيْسَ فِيْ الْاِبِلِ الْعَوَامِلِ وَ لَا فِيْ الْبَقَرِ الْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ *

"কার্যে ব্যবহৃত উটের এবং বোঝা বহনকারী গরুতে যাকাত নাই।"

এই বিধানের রহস্য হইল যে, মালিকের সেবার জন্য যে মাল নির্ধারিত যেমন, পরিধানের কাপড়, খেদমতের জন্য নির্ধারিত দাস, বসবাস করার ঘর, আরোহণ করার জন্য নির্ধারিত পশু, পড়ার গ্রন্থাদি, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও পশু, বাজারে যাওয়ার জন্য উট প্রভৃতি মালিকের হাত পায়ের ন্যায় প্রয়োজনীয় জিনিস। সুতরাং এইসব জিনিসের যাকাত নাই। কার্যে ব্যবহৃত পশু আর মাঠে চড়িয়া বেড়ায় এমন জন্তুর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কেননা যেসব জন্তু কার্যে ব্যবহার করা হয় এইগুলিকে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ প্রদান

থেকে বঞ্চিত করিয়া কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। আর যেগুলি সর্বদা মাঠে চড়িয়া বেড়ায় এইগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর বিস্তার লাভ করিতে থাকে। সুতরাং এইগুলিতে যাকাত নির্ধারিত হইয়াছে।

সারকথা, কাজে ব্যবহৃত জন্তু ঘরের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ন্যায়। এই জন্য ইহাদের যাকাত নির্ধারিত হয় নাই। আর যেসব জন্তু কার্যে ব্যবহৃত হয় না এইগুলি ব্যবসার মালের ন্যায়। এই জন্য ইহাদের যাকাত নির্ধারিত হইয়াছে। কারণ কোন সম্পদে দুইটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকিলে– তাহাতে যাকাত ওয়াজিব হয়। (১) সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে। (২) প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে। কার্যে ব্যবহৃত জন্তুর মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের একটিও বিদ্যমান নাই। এই কারণেই ইহাতে যাকাত ওয়াজিব করা হয় নাই।

তিন প্রকার সৃষ্ট জিনিসে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার হেকমত

আল্লাহ পাক তিন প্রকার সৃষ্ট জিনিসে যাকাত ওয়াজিব করিয়াছেন। জিনিস তিনটি হইল– (১) খনি (২) গাছপালা (৩) জন্তু।

স্বর্ণ, রৌপ্য খনির উদাহরণ। গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি গাছ পালার উদাহরণ। উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর উদাহরণ। সুতরাং সমস্ত সৃষ্ট জিনিস এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর বংশধরদের জন্য সদকা হারাম হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন–

اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِيَ مِنْ اَوْسَاخِ النَّاسِ وَ اِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ

"সদকা মানুষের ময়লা। এই জন্য ইহা মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর পরিবার পরিজনের জন্য হালাল নয়।" অন্য এক হাদীছে আসিয়াছে–

نَحْنُ اَهْلُ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ *

"আমরা আহলে বায়ত। আমাদের জন্য সদকা হালাল নহে।" আহলে বায়ত বলিয়া বনী হাশেম, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত জাফর, হযরত

আকীল, হযরত হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের পরিবার পরিজনকে বুঝান হইয়াছে।

সদকা ময়লা হওয়ার ভেদ হইল– সদকা করার দ্বারা গোনাহ দূরীভূত হয়। বালামুছীবত প্রতিহত হয়। এইসব ক্ষেত্রে সদকা মানুষের ফিদ্‌য়া হইয়া থাকে। এই জন্য ফিরিশতাদের কাছে সদকা মানুষের ময়লা হিসাবে প্রকাশ পায়। ইহার দ্বিতীয় ভেদ হইল– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজে সদকা গ্রহণ করিতেন এবং স্বীয় পরিবার পরিজনদের জন্য সদকা গ্রহণ করিতেন আর পরিবার পরিজনের ফায়দা প্রকারান্তে নিজের ফায়দা– তাহা হইলে এই অবস্থায় অন্যান্য লোকেরা তাঁহার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ না করার সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে এমন কথাও হয়ত বলিয়া ফেলিত, যাহা বেয়াদবীর পর্যায়ে পড়িয়া যাইত। এই জন্য তিনি এই রাস্তাটাই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন। আর পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিলেন যে, সদকা প্রদান করার ফলে প্রদানকারীই লাভবান হয়। মুসলমান মালদার ব্যক্তিদের থেকে সদকা উশুল করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহারা গরীব তাহাদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইহা তাহাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ ও মেহেরবানী এবং কল্যাণ। অধিকন্তু তাহাদিগকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা করা। যাহারা ভিক্ষা করার অভ্যাসী হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের তাকওয়া, পবিত্রতা, মনের সবলতা এবং অন্যান্য উত্তম গুণাবলী নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের মনোবৃত্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। পরিশ্রম ও উপার্জন করার ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শন করে। আর উত্তম গুণাবলী অর্জন হইতে দূরে দূরে থাকে। বিলাসিতা তাহাদের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়। আরামপ্রিয়তা, অলসতা তাহাদের রগরেশায় ঢুকিয়া পড়ে। এইসব দিকে খেয়াল করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশংকা পয়দা হইল যে, হয়ত বা তাঁহার বংশধরেরাও দান খয়রাতের মালের উপর ভরসা করিয়া উত্তম গুণাবলী অর্জন করার ব্যাপারে অলসতা করিবে। আর দানখয়রাত লাভের সুযোগ সত্যিই মানুষকে এই অবস্থার শিকার বানাইয়া ফেলে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তাঁহার পরিবার পরিজনকে সদকা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা এই নিকৃষ্ট অবস্থার অভ্যস্থ হইয়া শক্ত অন্তরওয়ালা না হইয়া যায়। আর অপদস্থতার আমদানীর প্রত্যাশী হইয়া অপমানিত ও লাঞ্ছিত না হইয়া পড়ে।

আল মাসালিহুল আকলিয়াহ লিল আহকামিন নাকলিয়াহ

(যুক্তির আলোকে শরয়ী আহকাম)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

প্রথম অধ্যায় / রোযা

মানুষের জন্য রোযা নির্ধারিত হওয়ার কারণসমূহ

মানব প্রকৃতির চাহিদা হইল যে, বিবেক সর্বদা প্রবৃত্তির উপর প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকিবে। কিন্তু বিভিন্ন মানবিক চাহিদার কারণে অনেক সময় প্রবৃত্তি বিবেকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া ফেলে। তাই প্রবৃত্তির এই সীমা লংঘন প্রতিহত করিয়া ইহাকে সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে ইসলাম রোযাকে স্বীয় মৌলিক স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

১। রোযার দ্বারা মানুষের বিবেক তাহার প্রবৃত্তির উপর পুরাপুরি প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

২। রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে খোদাভীতি এবং তাকওয়া জন্মলাভ করে। আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন– لعلكم تتقون "তোমাদের উপর রোযা এই জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইয়া যাও।

৩। রোযা রাখার ফলে মানুষের দৃষ্টি স্বীয় অসামর্থ্য ও অসহায়ত্বের দিকে আর আল্লাহ পাকের মহিমা ও শক্তির দিকে পতিত হয়।

৪। রোযা রাখার ফলে বান্দার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায়।

৫। দূরদর্শিতায় উন্নতি লাভ হয়।

৬। সমস্ত কিছুর সঠিক অবস্থা খুলিয়া সামনে আসে।

৭। হিংস্রতা ও পশুত্ব স্বভাব দূরীভূত হয়।

৮। আল্লাহর ফিরিশতাদের নৈকট্য অর্জিত হয়।

৯। আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ হয়।

১০। অন্তরে সমবেদনার প্রবল আগ্রহ পয়দা হয়।

ইহার তাৎপর্য হইল এই যে, যখন কোন ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসা কি তাহাই অনুভব করিতে সক্ষম নয় তখন সে কি করিয়া ক্ষুধার্ত ও পিপাসিতের অবস্থা অনুভব করিতে সক্ষম হইবে? সে মহান রিযিকদাতা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের প্রকৃত শুকরিয়া কিভাবে আদায় করিতে পারিবে? যদিও মুখে মুখে শুকরিয়া আদায় করে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার উদরে ক্ষুৎপিপাসার প্রভাব না পড়ে এবং তাহার শিরা ও ধমনীতে দুর্বলতা ও অক্ষমতা অনুভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর নেয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায়কারী হইতে পারে না। কেননা যখন কাহারও কোন প্রিয় জিনিস কিছু সময়ের জন্য তাহার থেকে নিখোঁজ থাকে তখনই সে এই নিখোঁজ জিনিসের দাম বুঝিতে পারে।

১১। রোযা দেহ ও আত্মার সুস্থতার মাধ্যম। কেননা চিকিৎসকগণ স্বল্পপানাহার দেহের সুস্থতার জন্য আর সুফীগণ অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য উপকারী বলিয়াছেন।

১২। রোযা মানুষের জন্য এক প্রকার রূহানী খাদ্য। ইহা পরকালে মানুষের জন্য আহারের কাজ দিবে। যাহারা এই দুনিয়া থেকে এই আহার সাথে করিয়া লয় নাই তাহারা পরকালে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকিবে এবং সেখানে তাহাদের রূহানী দরিদ্রতা প্রকাশ পাইবে। কারণ তাহারা তো সেখানকার খাদ্য সাথে লইয়া যায় নাই। আর ইহা তো গ্রহণযোগ্য কথা যে, যেহেতু মানুষ পানাহারের সমস্ত বস্তু আল্লাহ পাকের রহমতের ভাণ্ডার হইতে লাভ করে; আর এই দুনিয়াতে পানাহারের যেসব বস্তু পরিত্যাগ করে– উহার বিনিময় অবশ্যই পরকালে লাভ করিবে। আর পরকালের বিনিময় নিঃসন্দেহে ইহকালের পরিত্যক্ত বস্তু অপেক্ষা উত্তম হইবে।

১৩। রোযা আল্লাহ–প্রেমের একটি বড় নিদর্শন। যেমন কোন ব্যক্তি কাহারও প্রেমে পড়িয়া পানাহার ছাড়িয়া দেয়। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সাথের সম্পর্কও ভুলিয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রেমে রোযাদার ব্যক্তি অনুরূপ অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। এই জন্যই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে রোযা রাখা জায়েয নাই।

রমযান মাসে রোযা রাখার বিশেষত্বের কারণ

রমযান মাসে রোযা রাখার কারণ আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বর্ণনা করিয়াছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ *

"রমযান মাস এমন বরকতময় মাস যাহাতে কুরআন পাক অবতীর্ণ করা হইয়াছে।"

তাই এই মাস আল্লাহ পাকের বরকত নাযিল হওয়ার মাস। আর এই মাসে রোযা রাখার প্রকৃত উদ্দেশ্য لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আয়াতাংশে বর্ণনা করা হইয়াছে। আর রোযার মাসে পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জিত হয়।

রমযান মাসে কুরআন পাক খতম করা সুন্নত হওয়ার কারণ

এই মাসে কুরআন কারীম খতম করা এই জন্য সুন্নত যে, এই মাসেই কুরআন কারীমের অবতরণ হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই মাসে কুরআন কারীম খতম করে সে মৌলিক বরকত (অর্থাৎ কুরআনের বরকত) এবং ইহার সঙ্গীর বরকত (অর্থাৎ রমযানের বরকত) উভয়টি অর্জন করিতে পারে। কারণ রমযান সমস্ত ইসলামী বরকত ও কল্যাণের ধারক। কোন ব্যক্তি পূর্ণ বৎসরে যেসব দ্বীনী বরকত ও কল্যাণ লাভ করে তাহা এই মহান মাসের বরকত ও কল্যাণের রাস্তায় আগমন করে। এই মাসে নেক কার্যে অন্তর বসিয়া যাওয়া পূর্ণ বৎসর অন্তর বসিয়া যাওয়ার উপায় হয়। আর এই মাসে অন্তর বিশৃঙ্খল হইয়া যাওয়া পূর্ণ বৎসর অন্তর বিশৃঙ্খল হইয়া যাওয়ার কারণ হয়। কেননা সমস্ত বরকত ও কল্যাণের উৎস্য, ছোট দুনিয়া (মানুষ) ও বড় দুনিয়ার (পৃথিবীর) সংশোধনকারীর অর্থাৎ কুরআন কারীমের বরকতময় শুভাগমন এই মাসেই হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ *

"রমযান মাস, যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।"

তাড়াতাড়ি ইফতার করা আর দেরী করিয়া সেহরী খাওয়ার হেকমত

প্রতিটি আমল উহার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করাই সঠিকভাবে আদায় করা। যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা শুরু করার এবং রোযা শেষ করার সঠিক কার্যকর সীমা বর্ণনা না করিতেন, তাহা হইলে কোন লোক ইশার সময় পর্যন্তও ইফতার করিত না অথবা সূচনার সীমা পিছনে লইয়া যাইত। অতঃপর অন্যান্য লোকেরাও তাহাদের অনুকরণ করিয়া অনর্থক কষ্টে পতিত হইত।

রাত্রে রোযা বৈধ না হওয়ার কারণ

মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হইল যে, মানুষ রাত্রের সময় সাধারণতঃ কুপ্রবৃত্তিমূলক কার্য ও দুনিয়ার মনভোলানো ও লোভনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকে। সুতরাং যদি রাত্রেও রোযা রাখার বিধান জারী হইত, তাহা হইলে- ইবাদত অভ্যাসগত চাহিদার এবং শরীয়তের হুকুম পালন স্বভাবগত চাহিদার থেকে পৃথক হইত না। বরং তখন রোযা স্বভাবগত চাহিদার মোতাবেক হইয়া যাইত। আর রোযা বৈধ হইয়াছে স্বভাবগত চাহিদার পরিপন্থী হইয়া। কেননা মনে যাহা চাহিদা করে উহা হইতে বিরত রাখার জন্য রোযার বিধান জারী করা হইয়াছে। যেহেতু ইবাদত স্বভাবগত ও অভ্যাসগত চাহিদার পরিপন্থী নির্ধারিত হইয়াছে সেহেতু তাহাজ্জুদের নামায, কুরআন তিলাওয়াত, ও মোনাজাতের জন্য রাত্র নির্ধারণ করা হইয়াছে।

প্রত্যেক বৎসরে এক মাস রোযার জন্য নির্ধারিত করার কারণ

১। যেহেতু সকলের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও পারিবারিক কাজকর্মে জড়িত থাকার পর প্রতি দিনের রোযা সুষ্ঠুভাবে যথাযথ পালন করা সম্ভব নয়। তাই কিছু সময় পর পর এক নির্ধারিত সময় গুরুত্বের সহিত রোযা রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, যাহাতে এই সময় রোযা রাখার দ্বারা রোযাদারের মধ্যে ফিরিশতার গুণ জন্মলাভ করে এবং এই সময়ের পূর্বে যে

ত্রুটি হইয়াছে ইহারও ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। রোযাদারের অবস্থা একটি ঘোড়ার সাথে তুলনা করা যায়, যাহার সম্মুখ ভাগ ও পিছন ভাগ উভয়টি পেরেকের সাথে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সে দুই চার বার দুই চার কদম আগে পিছে গিয়া পড়ে আবার পূর্বস্থানে আসিয়া খাড়া হইয়াছে।

২। রোযা রাখার জন্য একটি সময়ও নির্ধারিত হওয়া জরুরী যে, এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রোযা রাখিবে, যাহাতে কেহ ইহার মধ্যে কমবেশী না করিতে পারে। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জরুরী হইল যে, এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন পূর্ণ দিবস পানাহার ও সহবাস হইতে নিজকে বিরত রাখিয়া রোযা পুরা করে। কেননা একদিনের কম সময়ে রোযা হইতে পারে না। কারণ, ইহা দুপুরের খাদ্য বিলম্ব করিয়া খাওয়ার সমতুল্য। রাত্রেও রোযা হইতে পারে না। কারণ, রোযার মধ্যে যেসব জিনিস হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে মানুষ সাধারণতঃ রাত্রে এই সব জিনিস থেকে এমনিতেই বিরত থাকে। সুতরাং রোযা সম্পর্কে তাহাদের কোন গুরুত্বই থাকিবে না। অধিকন্তু এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ এত সাধারণ সময় যে, এই সময়ে নফসের উপর কোন প্রভাবই পড়িবে না। আবার দুই মাস এত অধিক সময় যে, এই সময়ে রোযা রাখিলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে, আর রোযাদারও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। এইসব দিকে খেয়াল করিয়া জরুরী হইল যে, ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে শুরু করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত পূর্ণ দিন রোযার সময় নির্ধারিত হউক। কেননা আরববাসীরা এই সময়কেই এক দিন মনে করে।

৩। যেহেতু রোযা সর্বপ্রকার রূহানী দোষত্রুটি ধ্বংস করিবার জন্য এক প্রকার প্রতিষেধক বিশেষ। আর রোযা রাখার মধ্যে নফসের কষ্টও হয়। সুতরাং প্রয়োজন মাফিক রোযার জন্য একটি সময় নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাহা এত স্বল্পও না হওয়া চাই যে, এত অল্প সময় রোযা রাখার দ্বারা রোযাদারের কোন উপকার না হয়। আবার এই সময়টি এত দীর্ঘও না হওয়া চাই যে, এত দীর্ঘ সময় রোযা রাখিলে দেহের অঙ্গসমূহ দুর্বল হইয়া পড়ে। মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হইয়া যায়, মন দুর্বল হইয়া পড়ে। এমনকি এই পরিশ্রমের কারণে শেষ পর্যন্ত কবরেই যাইতে হয়। সুতরাং শরীয়ত ইহার জন্য যতটুকু সময় নির্ধারিত করিয়াছে উহাই সঠিক সময়।

রোযাতে পানাহার হ্রাস করা উদ্দেশ্য। পানাহার হ্রাস করার পন্থা দুইটিঃ

(ক) পরিমাণে কম করে দেওয়া। অর্থাৎ অল্প খাদ্য আহার করে আর অল্প পানীয় পান করে। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য ইহাকে মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা বড় মুশকিল। কেননা মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়। কেহ অল্প আহার করে আবার কেহ বেশী আহার করে। এক ব্যক্তি যে পরিমাণ আহার করিয়া সন্তুষ্ট হয় অপর ব্যক্তি একই পরিমাণ আহারে ক্ষুধার্ত থাকে। অনেকে প্রচুর খাদ্য আহার করিয়াও বলে যে, আমি ক্ষুধা নিবারণের পরিমাণ অপেক্ষা কম খাইয়াছি। সুতরাং ইহা মাপকাঠি হইতে পারে না।

(খ) দ্বিতীয় পন্থা হইল যে, আহার করার মধ্যে সময়ের যে পার্থক্য থাকে তাহা সাধারণ অবস্থা হইতে কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া। আর পানাহার হ্রাস করিবার এই পন্থাটি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। কেননা বিশুদ্ধ বিবেকের অধিকারী সকল মানুষ এই ব্যাপারে একমত যে, আহার করার মধ্যে সময়ের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার ফলে যে কষ্ট হয় তাহাই যথেষ্ট। তাই মানুষ সাধারণভাবে সকাল সন্ধ্যায় দুই বেলা আহার করে। অথবা দিন রাত একবার মাত্র আহার করে। তবে এতটুকু হইতে পারে না যে, প্রতিদিন মানুষকে অল্প খাওয়ার কষ্ট দেওয়া হইবে। উদাহরণ স্বরূপ এমন বলা যে, তোমরা এই পরিমাণ আহার কর যে, জীবনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এইরূপ নির্দেশ দেওয়া শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। (কেননা ইহাতে নফসকে নফসের বিরোধিতা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়)।

একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে– "যে ব্যক্তি ব্যাঘ্রকে রাখাল নির্ধারিত করিয়াছে– সে নিজেই জালেম।" তবে 'ওয়াজিব নয়', এমন বিষয়াদিতে অল্প আহারের নির্দেশ দেওয়া অসঙ্গত নয়।

আহারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সৃষ্টি করিতে গিয়া একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, সময়ের ব্যবধানটি যেন এত দীর্ঘ না হয় যে, ইহার ফলে রোযাদারের ক্ষতি হয় এবং তাহার শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ– রাত্র দিন ক্ষুধার্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া। কারণ এইরূপ নির্দেশ শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। সুতরাং এই ধরনের কষ্টে পতিত করা সঙ্গত হইতে পারে না।

তবে রোযাদারের জন্য বার বার ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকা চাই, যাহাতে আত্মশুদ্ধি ও আনুগত্যের যোগ্যতা পয়দা হয়। অন্যথায় শুধু মাত্র একবার ক্ষুধার্ত থাকার ফলে ক্ষুধা যত কঠিন হউক না কেন কোন লাভ নাই।

উল্লিখিত ভূমিকাসমূহ স্বীকার করিয়া লওয়ার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, পুরা দিবস রোযা রাখিয়া পরিপূর্ণ এক মাস রোযা রাখা চাই। কেননা এক দিনের কম সময়ের জন্য রোযা রাখার উদাহরণ দিনের বেলার খানা সামান্য বিলম্ব করিয়া খাওয়ার ন্যায়। আবার রাত্রের আহারের প্রতি পরওয়া না করাও আবার অনেক লোকের অভ্যাস। এক বা দুই সপ্তাহ অতি অল্প সময়। এই সময় রোযা রাখার পর নফসের উপর খুব একটা প্রভাব পড়ে না। পক্ষান্তরে দুই মাস রোযা রাখার ফলে দেহ মন দুর্বল হইয়া পড়ে।

৪। যেহেতু রোযার দ্বারা সকলকে আত্মশুদ্ধি ও সংযম শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য সেহেতু রোযার বিধান ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু বিধানটি এমন না হয় যে, যাহার যে মাসে ইচ্ছা সে মাসেই রোযা রাখা শুরু করিয়া দেয়, তাহা হইলে মানুষের ওযর পেশ করিবার সুযোগ বাড়িয়া যাওয়ার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়ার এবং ইসলামের একটি উচ্চ পর্যায়ের ইবাদতে অলসতা প্রবেশ করিবার আশংকা দেখা দিবে।

৫। রোযার জন্য সময় নির্ধারিত হওয়ার দ্বারা মুসলমানদের এই বিরাট জামাত একই সময়ে একটি কাজ সঠিকভাবে পালন করার সুযোগ পাইবে। ফলে এই কার্যে একে অপরকে সাহায্য করা সহজ হইবে। কাজ করিতে সাহস পাইবে।

৬। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ মিলিয়া একটি কাজ একই সময় সম্পাদন করা আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার উপায়। আর ইহা একতা ও ঐক্যমত সৃষ্টির জন্য উপকারী। এই কারণেই আল্লাহ পাক সমগ্র দুনিয়ার মানুষের রোযার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাস নির্ধারিত করিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন অসুবিধা ব্যতীত আল্লাহ পাকের নির্ধারিত এই ব্যবস্থাতে ফাটল সৃষ্টি করে, তাহার প্রতি রহমত নাযিল হওয়ার পরিবর্তে লা'নত নাযিল হইবে।

শাওয়ালের প্রথম দিনে রোযা রাখা হারাম হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ শাওয়াল মাসের প্রথম দিবসে রোযা রাখা হারাম আর রমযান মাসের শেষ দিবসের রোযা রাখা ফরয হওয়ার রহস্য কি? অথচ উভয় দিন একই ধরনের।

উত্তরঃ উল্লিখিত দিবসদ্বয় মর্যাদার দিক দিয়া এক পর্যায়ের নহে। যদিও সূর্যের উদয় ও অস্তের বিচারে এক পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে এক রকম নহে। কেননা রমযান মাস এমন এক মাস যাহাতে আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দার জন্য রোযা রাখা ফরয করিয়াছেন। আর শাওয়ালের প্রথম দিবসকে মানুষের জন্য ঈদ ও খুশীর দিন নির্ধারিত করিয়াছেন। আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ এই দিবসে পাঁনাহার বৈধ করা হইয়াছে। এইজন্যই এই দিবসে সকল মানুষ আল্লাহর মেহমান। সুতরাং আল্লাহ পাকের মেহমানের কর্তব্য হইল– তাহার দাওয়াত ও নিমন্ত্রণ কবুল করা। অতএব তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া এই দিবসে রোযা রাখা তাঁহার কাছে বড় নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়।

অধিকন্তু নিমন্ত্রণকারীর অনুমতি সাপেক্ষে নিমন্ত্রণ দিবসে রোযা রাখা মেহমানের বিশেষ আদব ও কর্তব্য। সুতরাং যেহেতু শাওয়াল মাসের প্রথম দিবসে সকল মুসলমান আল্লাহ পাকের মেহমান, সেহেতু এই দিনে রোযা রাখা বৈধ হইতে পারে না। রমযান মাসের শেষ দিবসে রোযা রাখা ফরয করিয়া দেওয়া ইসলামী শরীয়তের বিশেষ সৌন্দর্যের পরিচায়ক। কারণ এই দিবসটি আল্লাহ পাকের নেয়ামত পরিপূর্ণ হইবার এবং আমল সমাপ্ত করিবার দিবস। আর শাওয়াল মাসের প্রথম দিবসে রোযা রাখা হারাম। কারণ ইহা এমন একটি দিবস যে দিবসে সকল মুসলমান আল্লাহর মেহমান। যদিও সকল সৃষ্টি সর্বদার জন্য আল্লাহ পাকের মেহমান কিন্তু এই দিবস বিশেষ মেহমানদারী ও নিমন্ত্রণের দিবস। ইহা প্রত্যাখ্যান করা মারাত্মক অপরাধ।

রমযান মাসের রাত্রসমূহে তারাবীহর নামায নির্ধারিত হওয়ার কারণ

১। রমযান মাসের রাত্রসমূহে তারাবীহর নামায এই জন্য নির্ধারিত

হইয়াছে, যাহাতে প্রবৃত্তির স্বভাবগত চাহিদাগুলির পুরাপুরি বিরোধিতা হয়। কেননা রোযা থাকার পর দেহের মধ্যে অলসতা, দুর্বলতা ও ক্লান্তি আসে। এই অবস্থা দূর করার জন্য দেহ আরাম ও স্বস্থি চায়। এই অবস্থায় তারাবীহর নামাযের নির্দেশ আসিয়াছে, যাহাতে স্বভাব ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায়।

২। রমযান মাস অধিক বরকত ও নূর অবতীর্ণ হওয়ার মাস। এই মাসের রাত্রে এক বিশেষ ইবাদত নির্ধারণ করা হইয়াছে। কেননা বরকত ও নূরে এলাহী সাধারণতঃ রাত্রেই অধিক অবতীর্ণ হয়।

রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফে বসার কারণ

ইতিকাফ শব্দটির মূলধাতু 'আকফ'। ইহা আরবী শব্দ। আকফ শব্দের অর্থ আবদ্ধ করিয়া রাখা, বাধা দেওয়া। যেহেতু ই'তিকাফকারী রোযা থাকা অবস্থায় সর্বপ্রকার পার্থিব এবং মানবিক প্রয়োজনাদি থেকে ইচ্ছা করিয়া নিজকে বিরত রাখিয়া আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আবদ্ধ হইয়া তাহার দরবারে পড়িয়া থাকে, তাই এই কার্যটির নাম ই'তিকাফ রাখা হইয়াছে। ই'তিকাফ করা সুন্নত। বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ ইবনে মাজাতে হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফে বসিতেন।

অতএব রোযা হইল প্রেমিকের রঙ্গে এক বিশেষ চিত্রের ভাষায় দোয়া ও বিলাপ করা। আর ইতিকাফ হইল কাকুতিমিনতি করিয়া বিলাপ করার অবস্থায় প্রেমিক প্রেমাষ্পদের দ্বারে হাযির হওয়া, যেন ই'তিকাফকারী নিজকে আল্লাহর দরবারে এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে যেমন, এক অনুনয়বিনয়কারী ভিক্ষুক কাহারও বাড়ীর দরজায় নাছোড় বান্দার ন্যায় বসিয়া যায় এবং স্বীয় উদ্দেশ্য পুরা না হওয়া পর্যন্ত দরজা পরিত্যাগ করে না।

অথবা ই'তিকাফকারী এমন পাগলপরা প্রেমিকের সাথে তুলনীয় যে, সংসারের সমস্ত কাজকর্ম ও প্রয়োজনাদি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর অবসন্ন ও ক্লান্ত দেহে শুধু মাত্র প্রেমাষ্পদের সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে তাহার ঘরের দরজার সামনে পড়িয়া রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখ দর্শন

না করিতে পারিবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দরজা পরিত্যাগ করিবে না। শুধু মাত্র তাহার দর্শন ও সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহে স্বীয় সকল প্রকার আশা–আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাহার দরজার সামনে মাথা রাখিয়া দিয়াছে। এই জন্যই ই'তিকাফ আল্লাহর ঘর অর্থাৎ মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথায়ও বৈধ নয়। কেননা প্রেমাষ্পদের মুখ দর্শনে আকুলিত প্রেমিকের প্রেমাষ্পদের দরজার সামনে পড়িয়া থাকাই উচিত। এই জন্যই ইতিকাফকারী ইতিকাফের অবস্থায় রাত্রে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয নহে। কেননা সত্যিকার প্রেমিকের এইসব বিষয়ের চিন্তাও তো হইতে পারে না। অধিকন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, রমযান মাসের শেষ দশকে শবে কদর প্রকাশ হয়। ইহা এমন এক তাজাল্লী, যাহার প্রকৃত প্রকাশ এমন প্রেমিকের সামনেই হইয়া থাকে।

ভুলে পানাহার ও সহবাসকারীর রোযা নষ্ট না হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ রোযার অর্থ পরিত্যাগ করা, বিরত থাকা। যদি কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃও পানাহার করিয়া ফেলিল, সে তো পরিত্যাগ করার গুণ নষ্ট করিয়া দিল। রোযার গুণ তাহার মধ্যে পাওয়া গেল না। সুতরাং তাহার রোযা কিভাবে বহাল থাকিতে পারে?

উত্তরঃ যদি রোযাদার ভুলবশতঃ রোযা নষ্টকারী কোন কার্য করিয়া ফেলে– তবুও তাহার মধ্যে শরয়ী বিরত থাকা ও পরিত্যাগ করা বিদ্যমান থাকে। কেননা শরীয়ত প্রবর্তক তাহার এই কার্যকে নিজেরই দিকে সম্পর্কিত করিয়াছেন। যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ হইয়াছে–

اِنَّ اللّٰهَ اَطْعَمَهُ وَ سَقَاهُ *

"আল্লাহ পাক তাহাকে আহার ও পান করাইয়াছেন।"

এই হাদীছ হইতে বুঝা গেল যে, বান্দা প্রকৃতপক্ষে কাজ করিয়া থাকিলেও এখানে তাহার দ্বারা কাজ হয় নাই– এমনই মনে করা হইয়াছে।

সুতরাং রোযা নষ্টকারী বিষয়াদি হইতে প্রকৃতপক্ষে বিরত না থাকিলেও তাহাকে বিরত থাকার কাতারে শামিল করিয়া রোযা বহাল থাকার হুকুম জারী করা হইয়াছে।

বৎসরে ছত্রিশ রোযা রাখার দ্বারা বান্দা সারা বৎসর রোযাদার বলিয়া পরিগণিত হওয়ার হেকমত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন–

مَنْ صَامَ صِيَامَ رَمَضَانَ فَاَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসের মধ্যে ছয়টি রোযা রাখে তাহার এই কার্য সর্বদা রোযা রাখার ন্যায় হইল।"

শাওয়ালের এই ছয় রোযা রাখার বিধান জারী করার ভেদ হইল এই যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সাথে সুন্নত নামাযও সংযুক্ত করা হইয়াছে। ফরয নামায আদায় করিতে গিয়া যাহারা পুরা ফায়দা অর্জন করিতে পারে নাই সুন্নত নামাযের মাধ্যমে তাহাদের এই ক্ষতি পুরা করিতে পারে– এই উদ্দেশ্যে সুন্নত নামায সংযুক্ত করা হইয়াছে। শাওয়াল মাসের ছয় রোযাও অনুরূপ যে, রমযানের রোযার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে নির্ধারিত করা হইয়াছে।

এই রোযাগুলি রাখার ফলে রোযাদার সর্বদা রোযা রাখার সওয়াব লাভ করে। কেননা সওয়াব লাভের নীতি হইল যে, একটি নেক কার্যের সওয়াব হয় দশটি। রমযানের রোযার সাথে এই ছয় রোযা সংযুক্ত করার দ্বারা রোযার পরিমাণ দাঁড়ায় ছত্রিশে। আর ছত্রিশকে দশ দ্বারা গুণ করিলে গুণফল হয় তিনশত ষাট। আর তিনশত ষাট দিনে এক বৎসর হয়।

রমযান মাসে দোযখের দ্বার খোলা না থাকার আর বেহেশতের দ্বার খোলা থাকার কারণ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে,

اِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ غُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ *

"রমযান মাস আসিলে বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় আর

জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তান বন্দী করিয়া রাখা হয়।"

ইহা বাস্তব যে, মানুষ দুনিয়াতে যেসব বদকাজ ও অপরাধ করিয়া থাকে তাহা তাহাদের উদর পূর্ণ করিয়া আহার করার কারণে এবং দৈহিক শক্তির লাগামহীন ব্যবহারের কারণেই করিয়া থাকে। কিন্তু যখন রোযার দ্বারা দৈহিক শক্তির মধ্যে ভাটা পড়িয়া যায় তখন গোনাহ ও অপরাধ হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকে এবং গোনাহ বর্জন করিতে থাকে, তখন তাহাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ঝুঁকিয়া পড়ে। বেহেশতের দ্বার তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। অতএব এই সময় তাহাদের জন্য দোযখের দ্বার বন্ধ হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কেননা গোনাহের কারণে আল্লাহর গোস্বার অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এখন যখন গোনাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে– তাই দোযখের দরজাও বন্ধ হওয়া স্বাভাবিক।

যখন বনী আদমের শিরা–উপশিরায় শক্তি বিদ্যমান থাকে আর তাহাদের উদর পূর্ণ থাকে– তখন তাহারা গোনাহের দিকে ঝুকিয়া পড়ে এবং গোনাহে মজা পায়। ভিতরে শিরা–উপশিরার প্রভাবে শয়তানী চালচলন ও আচার ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু যখন সমগ্র দেহে ক্ষুধা ও পিপাসার প্রভাব পড়ে আর আল্লাহর নির্দেশে রোযার মাধ্যমে বাসনা ও কামনার রিপুগুলি সংযত হইয়া পড়ে– তখন ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এইভাবে শয়তান বন্দী হইয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ بَنِىْ أٰدَمَ كَمَجْرَى الدَّمِ

"শয়তান বনী আদমের শিরা–উপশিরায় রক্তের ন্যায় সঞ্চলিত হয়।"

এই হাদীছ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, শয়তানের জায়গা হইল বনী আদমের শিরা–উপশিরা। আর শিরা–উপশিরার শক্তি হ্রাস পাইয়া যাওয়া এবং রোযার কারণে শয়তানী চালচলন প্রকাশ পাইতে না পারাই কাহারো কাহারো মতে শয়তান বন্দী হইয়া যাওয়া। আর হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তানকে এইভাবে বন্দী করিয়া রাখা হয়, যেমন কোন মানুষকে শিকল দ্বারা বন্দী করিয়া রাখা হয়।

যখন কোন সম্মানী ব্যক্তির আগমন হয় তখন এলাকার ফাসাদকারীদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। সুতরাং রমযানের মধ্যে বিশেষ তাজাল্লী ও বরকতের আগমনকেও অনুরূপ মনে করা হইয়াছে। তাই ফাসাদকারী শয়তানকে বন্দী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরও গোনাহের যে সকল কাজ হয় তাহা প্রবৃত্তির তাড়নায় হয়; শয়তানের কারণে নয়।

দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরুতে রমযান মাসের রোযা পালনের বিধান জারী না হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুতে ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত্র থাকে। ইহার কারণ নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে পরিষ্কার হইয়া সামনে আসিবে।

সূর্য যখন বিষুব রেখার উপর অবস্থান করে তখন উহার কিরণ উভয় মেরুতে সমভাবে পতিত হয়। কিন্তু বিষুব রেখা হইতে হটিয়া সূর্য যতই উত্তর দিকে আসিতে থাকে সূর্যের কিরণ ততই উত্তর দিকে প্রসারিত হইতে থাকিবে– আর দক্ষিণ মেরু হইতে সরিয়া পড়িতে থাকিবে। এই জন্যই উত্তর মেরুতে দিন হইতে থাকে আর দক্ষিণ মেরুতে রাত্র হইতে থাকে। সূর্য তিন মাস পর্যন্ত উত্তর দিকে আসিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর মেরু রেখাতে আসিয়া থামিয়া পড়ে। অতঃপর তিন মাসে মেরু রেখা হইতে সরিয়া পুনরায় বিষুব রেখাতে ফিরিয়া আসে। এই ছয় মাসে উত্তর দিক আলোকিত হয় আর দক্ষিণ দিক অন্ধকার থাকে। অনুরূপভাবে সূর্য অবশিষ্ট ছয় মাস দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে। ফলে দক্ষিণ দিক আলোকিত হয় আর উত্তর দিক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। এই জন্য এই দিনগুলিতে দক্ষিণ মেরুতে দিন আর উত্তর মেরুতে রাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ ২১শে মার্চ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সূর্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে বিধায় উত্তর মেরুতে দিন আর দক্ষিণ গোলার্ধে রাত্র থাকে।

সুতরাং যেখানে ছয় মাস রাত্র আর ছয় মাস দিন থাকে সেখানে রোযা রাখার কি ব্যবস্থা হইবে? কোন মানুষের এতটুকু শক্তি নাই যে, এত বড় দিনে অর্থাৎ ছয় মাস পর্যন্ত রোযা রাখিতে পারে, আর এই দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত সূর্যাস্তের অপেক্ষা করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কষ্ট করে। উদাহরণ স্বরূপ– যাহারা গ্রীণল্যাণ্ডে যায় তাহারা কিভাবে রোযা রাখিতে পারিবে?

উত্তরঃ উভয় মেরুতে এবং গ্রীণল্যাণ্ডে রোযা রাখার বিষয়টির আলোচনা কুরআন পাক ভুলে নাই; বরং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছে। কুরআনে পাকে বলা হইয়াছে–

مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাস পাইবে সে যেন উহাতে রোযা রাখে।

সুতরাং যে স্থানে রোযা রাখার সুযোগই পাওয়া যায় না এবং যেখানে রমযান মাসই বিদ্যমান নাই সেখানে রোযাও নাই। এই ধরনের স্থানসমূহে নামাযেরও একই হুকুম, কেননা আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا *

"নিশ্চয়ই নির্ধারিত ওয়াক্তে মুসলমানদের উপর নামায ফরয।"

সুতরাং যেখানে এমন নির্ধারিত ওয়াক্ত নাই, সেখানে সে ওয়াক্তের সাথে নির্ধারিত নামাযও নাই। ইহার উদাহরণ হাত–কাটা চোরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চোরের হাত কাটিয়া দেওয়া কুরআনী হুকুম। ইসলামের একটি উজ্জ্বল আমল। হাত–কাটা চোর অনেক সময় মুসলমান হয় আবার অনেক সময় হাত কাটার পরও মুসলমান হইয়া যায়। তাহারা নামায পড়ে। ওযু ও তায়াম্মুমের সময় উভয় হাত ধৌত করা অথবা মসেহ করা কুরআনী নির্দেশ। কিন্তু যখন হাত–কাটা মানুষের হাতই নাই তখন ধৌত করার কি প্রশ্ন হইতে পারে? অর্থাৎ তাহাদের হাত ধৌত করার নির্দেশ নাই। অনুরূপভাবে যেখানে রমযান মাসই নাই সেখানে রমযানের রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়ার কি অর্থ? অর্থাৎ তাহাদের দায়িত্বে রোযা নাই। ইহা কোন কোন আলেমদের অভিমত।

অন্যান্য ওলামাগণ বলেন যে, নামায ও রোযা হইল আসল উদ্দেশ্য। নামায রোযার জন্য ঐ স্থানে ওয়াক্ত নির্ধারিত রহিয়াছে, যে স্থানে নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করা সম্ভব। যেখানে ওয়াক্ত নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, সেখানেও ইবাদত আদায় করিতে হইবে। ইবাদত আদায় করা ব্যতীত দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারিবে না। তথায় অনুমান করিয়া নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণ করিয়া নামায আদায় করিবে। অনুরূপভাবে অনুমান করিয়া রোযার ওয়াক্ত নির্ধারণ করিয়া

রোযা আদায় করিবে। অভিমতদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় অভিমত মোতাবেক আমল করা অধিক সতর্কতার পরিচায়ক।

যদি কেহ বলে যে, উল্লিখিত আয়াতে মেরুদেশে রোযা রাখার মাসআলার কোন সমাধান নাই, এমনকি এই মাসআলার কোন সমাধান কুরআনে উল্লেখ নাই, তখন এই প্রশ্নের জবাব হইল যে, উভয় মেরু যেহেতু শীত প্রদান এলাকা, অধিকন্তু উভয় মেরু সর্বদা বরফ ঢাকা থাকে– তাই মেরুদ্বয়ে মানুষ তো বসবাস করিতে পারেই না এমনকি অন্যান্য জীব–জন্তুর অস্তিত্বও প্রায় অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহ পাক যে স্থানটি মানুষ বসবাসের উপযোগীই করেন নাই– সেখানে রোযাও নির্ধারিত করেন নাই। খুব চিন্তা করিয়া দেখ যে, বাদশাহের নির্দেশ সেখানেই জারী করা হয় যেখানে প্রজা আছে। যেখানে প্রজা নাই সেখানে তাহার নির্দেশ জারীই করা হয় না।

প্রথম জবাবের ব্যাখ্যা– রমযান যেহেতু রোযার মাস তাই ইহা চন্দ্র–মাস। আল্লাহ পাক রমযানের রোযা ওয়াজিব করার পর ইহার ওয়াক্ত বর্ণনা করিবার জন্য বলিলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

"রমযান মাস এমন এক মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।"

আর রমযান মাস চন্দ্র–মাস। আর প্রতিটি চন্দ্র–মাসের পরিমাণ ২৯ দিন ১২ ঘন্ট ২৪ মিনিট। আর মেরুতে চন্দ্র–মাস নাই। কারণ একাধারে ছয় মাস পর্যন্ত রাত্র। আর যেখানে চন্দ্র–মাস নাই সেখানে রোযাও নাই। কারণ যখন শর্ত পাওয়া যাইবে না তখন শর্তযুক্ত বিষয়টিও পাওয়া যাইবে না। চন্দ্র–মাস শর্ত। যখন চন্দ্র–মাস নাই– তখন চন্দ্র–মাসের সাথে শর্তযুক্ত রোযাও নাই। এই সম্পর্কে ওলামাদের মতপার্থক্য উপরে আলোচিত হইয়াছে।

ফিতরা নির্ধারণের কারণ

১। ঈদুল ফিতরের ফিতরা নির্ধারণের কারণ– ঈদুল ফিতর আল্লাহর নিদর্শন। ইহা শারিরীক ইবাদত। ইহাতে কোনরূপ ত্রুটি হইলে ফিতরা প্রদানের দ্বারা ঈদ ত্রুটিমুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং ফিতরা প্রদান আল্লাহর এই নিদর্শনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

২। রোযাদার হয়তবা গোনাহ ও রোযার চাহিদার পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হইয়া আন্তরিকভাবে অপবিত্রতায় জড়াইয়া পড়িয়াছে। ফিতরা এমন ব্যক্তির জন্য পবিত্রকারক এবং তাহার রোযার পরিপুরক। যেমন ফরয নামাযের ত্রুটি পূরণ করার জন্য সুন্নত নামাযের প্রচলন করা হইয়াছে। ফিতরা ও রোযার জন্য তদ্রূপ।

৩। এই দিনে ধনী, বিত্তশালী লোকদের ঘরে ঈদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মিসকীন ও গরীবদের ঘরে তাহাদের দরিদ্রতার কারণে রোযার অবস্থাই থাকিয়া যায়। যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টিজীবের প্রতি অনুগ্রহ করা অপরিহার্য কর্তব্য তাই ঈদের নামাযের পূর্বে ফকীর মিসকীনদেরকে ফিতরা প্রদান করা বিত্তশালী লোকদের অপরিহার্য দায়িত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের ঘরেও ঈদ পরিলক্ষিত হয়, এই জন্যই ঈদের নামায পড়ার পূর্বেই ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। যদি মিসকীনের সংখ্যা অনেক হয় তাহা হইলে ফিতরা বায়তুল মালে জমা করিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যাহাতে মিসকীনদের একীন হইয়া যায় যে, তাহাদের অধিকার হেফাজত করা হইতেছে।

প্রত্যেক বিত্তশালী ব্যক্তির উপর ফিতরা হিসাবে এক ছা' পরিমাণ যব বা খেজুর অথবা অর্ধ ছা' পরিমাণ গম নির্ধারিত হওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী, গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তির দায়িত্বে ফিতরা হিসাবে এক ছা' পরিমাণ খেজুর বা যব নির্ধারণ করিয়াছেন। এক ছা' এমন একটি পাত্র যাহাতে সাড়ে তিন সের নির্ভেজাল গম আঁটিতে পারে। এমন একটি পাত্র ভর্তি খেজুর বা যব ফিতরা হিসাবে প্রদান করা অপরিহার্য। এই পরিমাণ জিনিস ফিতরা হিসাবে নির্ধারণ করার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিমাণ খাদ্য এক ছোট গোষ্ঠীর লোকের একদিনের খাদ্যের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। ইহার দ্বারা ফকীর মিসকীনের প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে পুরা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে এক ছা' পরিমাণ খাদ্য প্রদান করাতে দাতার কোন কষ্টও হয় না। কিন্তু এক ছা' পরিমাণ যবের পরিবর্তে গম দিতে হয় অর্ধেক ছা'। কারণ তৎকালে যবের পরিবর্তে গমের মূল্য

অনেক বেশী ছিল। এই জন্য আমীর ওমারাহগণ গম আহার করিতেন। আর ফকীর মিসকীনরা তাহা খাইত না।

ঈদদ্বয়

ঈদুল ফিতর নির্ধারিত হওয়ার রহস্য

১। প্রত্যেক জাতিতে কোন না কোন দিন অবশ্যই থাকে যে দিনে জাতির লোকেরা আনন্দ করে, ভাল ভাল পোশাক পরিধান করে এবং ভাল ভাল খাদ্য আহার করে। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدٌ وَ هٰذَا عِيْدُنَا *

"প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ঈদের দিন রহিয়াছে; আর ইহা আমাদের ঈদের দিন।"

২। ইহা এমন একদিন যেই দিনে মানুষ রোযা থেকে পৃথক হইতে পারে। ইহাতে জীবনের বার্ষিক যাকাত (ফিতরা) আদায় করিতে পারে। এই দিনে মানুষের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে। প্রকৃতিগত আনন্দ আর বিবেক সম্মত আনন্দ।

প্রকৃতিগত আনন্দ এইভাবে অর্জিত হয় যে, কঠিন ইবাদত রোযা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে আর ফকীর–মিসকীন সদকা পাইতেছে। বিবেকসম্মত আনন্দ এইভাবে অর্জিত হয় যে, আল্লাহ পাক তাহাকে একটি মহান কর্তব্য আদায় করার তৌফিক দিয়াছেন। আর তাহাদের পরিবার পরিজনকে এই বৎসর পর্যন্ত বাকী রাখিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এইজন্য এইসব আনন্দ প্রকাশ করিবার হুকুম হইয়াছে।

দুই ঈদ নির্ধারণ করিবার কারণ

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কিছু নিয়ম–নীতি, প্রথা এবং অভ্যাসগত বিষয় থাকে। তন্মধ্যে একটি হইল মেলা। সভ্য ও অসভ্য প্রায় সকল জাতির মধ্যেই মেলার প্রচলন রহিয়াছে। মেলার দিনে খানাপিনা, পোশাক পরিচ্ছদ এবং পরস্পর সাক্ষাতের মধ্যে বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। ইহা মানবের জন্মগতভাবে পাওয়া জিনিসের ন্যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে

ইহাতে কুপ্রবৃত্তি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া লইয়াছে। অনেক মেলা ব্যবসার উদ্দেশ্যে কায়েম হইতেছে। পাক ভারত উপমহাদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে অনেক মেলা কায়েম হয়। এমনকি প্রতি সপ্তাহেই কোন কোন স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন কোন মেলাতে বিভিন্ন ধরনের পশু জমা করা হয়।

মোটকথা; এইসব মেলাতে আশ্চর্য ধরনের কাজ কর্ম হইতে থাকে। কেহ কেহ তো নিজেদের উপার্জনের উপায় হিসাবে মেলা কায়েম করিতেছে। কেহ তো কায়েম করিতেছে চাঁদা সংগ্রহ করার জন্য। আবার কেহ কেহ নিজের মানমর্যাদা বৃদ্ধির আশা লইয়া করিতেছে।

আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল বড় বড় অনুগ্রহ ও এহসান রহিয়াছে– তন্মধ্যে একটি বড় এহসান হইল যে, তিনি মেলা অনুষ্ঠানের কুপ্রথাকে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। যেহেতু ইহা একটি জন্মগত অভ্যাস তাই তিনি ইহাকে বন্ধ করিয়া দিলেন না; বরং ইহা নীতি–নিয়মে সংশোধনী আনিলেন।

মানবের পালনীয় যেসব বিষয়ে কুপ্রথা প্রচলিত আছে তিনি সেসব বিষয়ে এমন নীতি চালু করিলেন যাহা আল্লাহর মহত্ব, সম্মান এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও রহমত প্রকাশ করে। তিনি মেলার মধ্যে অনুরূপ নীতি চালু করিলেন। তাই তিনি ঈদের মধ্যে তাকবীর বলা অপরিহার্য করিয়া দিলেন। আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এমন এক শব্দ নির্ধারণ করিলেন, যাহার উপরে আর কোন শব্দ হইতে পারে না। যেমন, "তাকবীর"। আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনার জন্য ইহার উপরে আর কোন শব্দ হইতে পারে না।

আর আল্লাহ পাকের সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলীর ধারক হিসাবে "আল্লাহ" শব্দ হইতে বাড়িয়া আর কোন শব্দ হইতে পারে না। ঈদের মধ্যে 'আল্লাহ' এবং 'আকবার' উভয় শব্দ তাঁহার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করিবার জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। মুসলমানগণ শব্দদ্বয় উচ্চারণ করিয়া করিয়া এই দিনে তাঁহার বড়ত্ব ও মহত্বের স্বীকৃতি প্রদান করিবে।

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও রহমত প্রদর্শনের জন্য রমযানের ঈদে ফিতরা প্রদানের প্রথা চালু করিয়াছেন। এমনকি নামাযে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা প্রদান করিয়া নামাযে যাওয়া সুন্নত। অবশ্য কোন কোন স্থানে ফিতরা এক

নির্ধারিত বিশেষ স্থানে জমা করা হয়, যাহাতে মিসকীনদের একীন হইয়া যায় যে, তাহাদের অধিকার হেফাজত করা হইতেছে। আর কুরবানীর ঈদে গরীব মিসকীনদের জন্য প্রধান খাদ্য গোশতের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সব জিনিসের প্রচলন করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের যে দায়িত্ব রহিয়াছে আর সৃষ্টির ব্যাপারেও তাহাদের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা যেন আদায় করিতে পারে। দুনিয়ার যে কোন মেলা দেখ– ইহাতে অধিকার সংরক্ষণ এবং উল্লিখিত হেকমতসমূহ পাওয়া যাইবে না। অথচ এইগুলি পূর্ণ মাত্রায় ঈদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুরবানীর ঈদ নির্ধারিত হওয়ার কারণ

ইবাদতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করার মধ্যে এই হেকমতও রহিয়াছে যে, এই নির্ধারিত ওয়াক্তে নবীগণ আল্লাহ পাকের যে ইবাদত ও আনুগত্য করিয়াছেন, আর আল্লাহ পাক তাহা কবুল করিয়াছেন এই ওয়াক্ত সামনে আসার পর তাহাদের জান–মালের উৎসর্গতার কথা স্মরণ করিয়া যেন মানুষ ইবাদতের দিকে এবং জান–মাল উৎসর্গ করার দিকে অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারে। অতএব ঈদুল আযহার দিবস এমন একদিবস, যাহাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরওয়ারদিগারের নির্দেশে স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)–কে যবেহ করিয়া তাঁহার দরবারে পেশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত ইসমাঈল (আঃ)–এর পরিবর্তে যবেহকৃত একটি বড় জিনিস দান করিলেন। তাই এই ঈদে কুরবানী করা নির্ধারিত করার কারণ হইল– এই দিনে মিল্লাতে ইবরাহীমীর ইমামগণের (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল [আঃ]–এর) অবস্থা, আল্লাহ পাকের নির্দেশে তাহাদের জান–মালের ব্যয় এবং তাহাদের অপরিসীম ধৈর্য ও সবর করা স্মরণ করাইয়া মানুষকে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করা।

অধিকন্তু এই দিনে হজ্জব্রত পালনকারীদের সাথে সামঞ্জস্যতা পয়দা হয় এবং তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। আর তাহারা যে কার্যে লিপ্ত আছে সে কার্যের দিকে অন্যান্য লোকদিগকে অনুপ্রেরণা প্রদাণ করা হয়।

ঈদদ্বয়ে নামায ও খুতবা নির্ধারিত হওয়ার কারণ

ঈদদ্বয়ে নামায ও খুতবা এই জন্য নির্ধারিত হইয়াছে, যাহাতে মুসলমানদের কোন সমাবেশ আল্লাহর যিকির, দ্বীনের নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মস্তিষ্কে আল্লাহর মহত্ব উপস্থিত হওয়া থেকে খালি না হয়।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ হইল যে, প্রত্যেক জাতির জন্য এমন একটি দিবস নির্ধারিত থাকে যে দিবসে উক্ত জাতির লোকেরা নিজেদের আড়ম্বর প্রকাশ করে এবং খুব সুন্দর সুন্দর ভুষণে সাজাইয়া গুছাইয়া শহরের বাহিরে বাহির হইয়া আসে। আরবী বা অনারবী এমন কোন জাতি নাই যাহারা এই ধরনের প্রথা অনুসরণ করে না।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মদিনাবাসীরা দুইটি নির্ধারিত দিবসে খেলাধুলা ও আনন্দ উল্লাস করিতেছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক এই দুইটি দিনের পরিবর্তে তোমাদিগকে তদাপেক্ষা উত্তম দুইটি দিন দান করিয়াছেন। সেই দুইটি দিন হইল– কুরবানীর ঈদের দিন। আর ফিতরার ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মদিনার দুই দিনকে পরিবর্তন করিবার এই জন্য প্রয়োজন ছিল যে, সাধারণ মানুষ যে দিনটি আনন্দ করার জন্য নির্ধারিত করে তাহাতে তাহাদের দ্বীনের কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশ করা বা দ্বীনের কোন বড় ব্যক্তিত্বের আনুকূল্য করা অথবা এই ধরনের কোন কার্য সম্পাদন করা উদ্দেশ্য হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবিলেন যে, যদি তিনি তাহাদিগকে এই অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে হয়ত তাহারা জাহিলী যুগের কোন কুপ্রথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকিবে অথবা জাহিলী যুগের কোন বড় ব্যক্তিত্বের প্রদর্শিত তরীকা চালু করিয়া বসিবে। তাই তিনি তাহাদের নির্ধারিত দিবসদ্বয়ের পরিবর্তে ঈদের দুই দিন নির্ধারিত করিলেন। ইহাতে ইবরাহীম (আঃ)–এর ধর্মমতের বিশেষ নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। তিনি এই দিনের সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের সাথে আল্লাহর যিকির ও অন্যান্য ইবাদত যোগ করিয়া দিলেন, যাহাতে মুসলমানদের কোন সমাবেশ শুধু খেলা–ধূলার জন্য না হয়; বরং ইহাতে একত্রিত হওয়ার ফলে আল্লাহর কলেমা উচ্চ হয়। এই জন্যই ঈদের দিনে তাকবীর বলা সুন্নত। আল্লাহ পাক বলেন–

وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ *

"আল্লাহ পাক তোমাদিগকে যেসব কার্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ইহার জন্য তাঁহার বড়ত্ব বর্ণনা কর।"

উভয় ঈদের দিনে ভাল ভাল জিনিস আহার করা এবং মূল্যবান মনোরম পোশাক পরিধান করিবার কারণ

ঈদের দিন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে বান্দাদের জন্য বিশেষ নিমন্ত্রণের দিন। যেহেতু ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে বান্দাদের জন্য বিশেষ নিমন্ত্রণের দিন– সেহেতু এই দিনে আহারও দামী ও উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই খাদ্যের কদর করাও উচিত। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের দ্বারা আল্লাহর পক্ষ হইতে উত্তম ও ভাল খানা রান্না করা উচিত। খানা, পিনা ও পোশাক পরিচ্ছদে শরীয়তের সীমার ভিতরে থাকিয়া যথাসম্ভব ব্যয় করা উচিত। সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিধান করা উচিত। কারণ ইহার দ্বারা আল্লাহ পাকের নিমন্ত্রণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়। যেহেতু ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণের দিন তাই মুমিন ব্যক্তিদের উচিত খানাপিনায় প্রশস্ততা সৃষ্টি করা অর্থাৎ গরীব দুঃখীদের খোঁজ খবর লওয়া

উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলার কারণ

আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করিতে অর্থাৎ তাকবীর বলিতে মূল লক্ষ্য হইল– তাঁহার বড়ত্ব মহত্ব ও নিজের বিনয় আর আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে ছাড়িয়া আল্লাহর মধ্যেই নিজকে নিবদ্ধ করা। ইহা সম্পূর্ণ সত্য ও সন্দেহহীন যে, মানুষ উভয় ঈদের দিনে নিজের মর্যাদা, শানশওকত এবং সৌন্দর্য যথাসাধ্য বেশী প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য তাহাদের শানশওকত ও আড়ম্বরের মোকাবিলায় আল্লাহ পাকের বড়ত্ব বর্ণনা করা ও তাঁহারই প্রতি মূল লক্ষ্য রাখার বিধান চালু করা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ পাকই মানুষকে এই দিনে শান শওকত প্রদর্শনের অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং বড়ত্ব এবং গৌরবের হকদার তিনিই। তাকবীর বলার সময় কান পর্যন্ত হাত উত্তোলন করা অহংকার ও গর্ব বর্জন করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু পরিত্যাগ করার প্রতি ইঙ্গিত। পক্ষান্তরে স্বীয় বড়ত্ব এবং মর্যাদার ধারণা হইতে তাওবা করার শিক্ষা।

অধিকন্তু যখন কোন জায়েয কাজ বেশী বেশী হইতে থাকে তখন ইহার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইহার বিপরীত কাজসমূহও নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু উভয় ঈদের মধ্যে আল্লাহ পাকের নেয়ামত বেশী বেশী ভোগ করিবার ও সাজসজ্জা বেশী বেশী করা বৈধ করা হইয়াছে, তাই ইহার মোকাবিলায় বেশী বেশী তাকবীর বলার বিধান চালু করা হইয়াছে, যাহাতে আল্লাহর প্রতি বেশী বেশী মনোনিবেশ হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি দৃষ্টি বর্জিত হয়।

কুরবানী

কুরবানী করার বিধান চালু হওয়ার রহস্য

কুরবানী শব্দটি আরবী قربان (কুরবান) শব্দ হইতে নির্গত। বিখ্যাত অভিধান 'সুরাহ'তে লিখা হইয়াছে–

قرِبَان بِالضَم وَ هُوَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إلَى اللّٰهِ تعَالٰى يُقَال قربت لِلّٰهِ قربَانًا

অর্থাৎ কুরবান এমন একটি জিনিস যাহার দ্বারা মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য অনুসন্ধান করে। এই জন্যই কথিত আছে, আমি আল্লাহর জন্য কুরবানী দিয়াছি। যেহেতু মানুষ কুরবানীর দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য অনুসন্ধান করে, এই জন্যই এই কাজটির নাম কুরবানী রাখা হইয়াছে।

১। বাস্তব ক্ষেত্রে কুরবানী কি? চিত্রের ভাষায় এমন এক শিক্ষা যাহা জ্ঞানী–মুর্খ সকলেই গ্রহণ করিতে পারে। সেই শিক্ষা হইল এই যে, আল্লাহ পাক রক্ত এবং গোশত ইহাদের কোনটার ক্ষুধার্ত নহেন। বরং তিনি আহার করান; কিন্তু তিনি নিজে আহার করেন না। তিনি এমন পবিত্র সত্তা যে, তিনি চামড়ার মুখাপেক্ষী নহেন। আবার তাহার প্রতি গোশত নযর ও মান্নত করারও মুখাপেক্ষী তিনি নহেন। বরং তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন যে, তোমরাও এইভাবে খোদার সামনে কুরবান হইয়া যাও। অধিকন্তু পশু কুরবানী করাও প্রকারান্তে তোমাদের নিজেদের কুরবানী হইয়া যাওয়া। কেননা তোমাদের জীবনের বিনিময়ে মূল্যবান আদরের পশু কুরবানী করিতেছ।

২। যাহারা মনে করে যে, কুরবানী বিবেক পরিপন্থী। তাহারা যেন আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করে যে, সমস্ত পৃথিবীতেই কুরবানীর প্রথা চালু আছে। বিভিন্ন

জাতির ইতিহাসের পাতা উলটাইলে এই মহাসত্য দৃষ্টিগোচর হয় যে, সর্বদাই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসের জন্য নিম্ন মর্যাদার জিনিস কুরবানী হইতেছে। জিনিস ছোট হউক বা বড় হউক সর্বপ্রকার জিনিসে এই নীতিটি চালু রহিয়াছে। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম যে, কাহাকেও বিষাক্ত সর্প দংশন করিলে তাহার আঙ্গুল কাটিয়া দেওয়া হইত, যাহাতে আঙ্গুলের বিনিময়ে হইলেও তাহার সমুদয় দেহ বিষের প্রভাব হইতে রক্ষা পাইয়া যায়। যেন সমুদয় দেহের জন্য আঙ্গুল কুরবানী করিয়া দেওয়া হইল।

৩। অনুরূপভাবে আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করিতেছি যে, যখন আমাদের কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় অথবা বন্ধু আগমন করে, তখন আমাদের কাছে যাহা কিছু থাকে আমরা তাহা তাহার জন্য কুরবানী করি। ঘি, আটা, গোশত প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসও তখন তাহার সামনে কোন মূল্য রাখে না। একবারে মূল্যহীন জিনিসের ন্যায় আগত বন্ধুর উদ্দেশ্যে খরচ করিতে থাকি।

৪। যদি উল্লিখিত বন্ধু হইতে আরও অধিক প্রিয় কোন বন্ধু আগমন করে তখন তো মোরগ, মুরগী তাহার জন্য কুরবানী করিতে থাকি। এমনকি কখনও কখনও ছাগল–ভেড়া বরং আরও সামনে বাড়িয়া গরু–মহিষ পর্যন্ত কুরবানী করিয়া দেওয়া হয়।

৫। দুনিয়াতে এমন কতক সম্প্রদায় রহিয়াছে, যাহারা 'জীব–হত্যা' বৈধ মনে করে না। তাহারা একটু নিজের দিকে খেয়াল করিলে তাহাদের এই অভিমতের ভ্রম স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। কেননা তাহাদের দেহের ক্ষতস্থানের হাজার হাজার পোকা মারিয়া তাহারা স্বীয় জীবন রক্ষা করে। এইভাবে তাহারা স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে শত কুটি পোকা কুরবানী করিয়া থাকে। যদি জীব–হত্যা বৈধ না হয়– তাহা হইলে ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? আরও একটু সামনে অগ্রসর হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, নিম্ন পর্যায়ের মানুষকে পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের মানুষের খাতিরে কুরবানী করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মেথর। জাতির সকল মানুষের ঈদের দিন সকলে নিজ দায়িত্ব হইতে অবসর হইয়া আনন্দ ও খুশিতে লিপ্ত। কিন্তু তাহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নাই। তাহারা নিজেদের দায়িত্বে লাগিয়াই আছে; বরং এমন দিবসে দায়িত্ব পালনে আরও বেশী তাগীদ করা হয়, যাহাতে আজ মানুষের চলাফেরার পথে

সামান্য ময়লা আবর্জনাও না থাকিতে পারে। যেন এই ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা আনন্দের খাতিরে নিম্ন পর্যায়ের লোকের আনন্দ কুরবানী করিয়া দেওয়া হইল।

৬। কোন কোন হিন্দুরা 'গাভী-রক্ষা' আন্দোলন খুব জোরে করিয়া থাকে। অর্থাৎ গাভী পালন করে কিন্তু তাহা যবেহ করিতে দেয় না। এমনকি গাভীর দুধও পান করে না। কারণ তাহারা বলে যে, দুধ বাচ্চার হক। কিন্তু এই এলাকার হিন্দুরা ধোঁকা দিয়া গাভীর দুধ দোহন করিয়া ফেলে। অতঃপর গাভী এবং গাভীর বাচ্চার দ্বারা খুব শক্ত কাজ করায়। এমনকি ইহাদিগকে মারিয়া মারিয়া নিজেদের কার্যে ব্যবহার করে। ইহাও এক প্রকার কুরবানী।

৭। সাদারণ সৈনিক তাহার উপরস্থ অফিসারের জন্য, আর এই অফিসার উচ্চ পর্যায়ের অফিসারের জন্য, উচ্চ পর্যায়ের অফিসার রাষ্ট্র প্রধানের জন্য কুরবান হয়। আল্লাহ পাক মানবের এই স্বভাবজাত ব্যবস্থাকে কায়েম রাখিয়াছেন। এই কুরবানীর শিক্ষা হইল যে, বড়র জন্য ছোটকে কুরবান করা হোক।

কুরবানীর জন্তু যবেহ করা নির্দয়তা নয়

আল্লাহ পাকের অনুগত কোন জাতি কখনো এই মত পোষণ করে না যে, আল্লাহ পাক অত্যাচারী জালেম; বরং তাহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যে, আল্লাহ পাক অসীম কৃপাময়, দয়ালু। করুণার মহাসমুদ্র।

এখন আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা দেখ; শূন্যের দিকে লক্ষ্য কর- সেখানে বাজ, চিল, শকুন প্রভৃতি শিকারী পক্ষী রহিয়াছে। ইহারা ছোট ছোট দুর্বল পাখীর গোশত খায়। দুনিয়াতে কত সুন্দর সুন্দর মজাদার ফল রহিয়াছে- তাহা ভক্ষণ করে না। ঘাষ খায় না। অতঃপর অগ্নি দেখ যে, পতঙ্গের সাথে ইহার কি আচরণ হয়? পানির দিকে চাহিয়া দেখ যে, ইহাতে কি পরিমাণ রক্তপিপাসু জন্তু রহিয়াছে। কুমীর, বড় বড় মৎস্য, উদ প্রভৃতি ছোট ছোট জলচর প্রাণী ভক্ষণ করিয়া ফেলে। বরং কোন কোন মৎস্য তো এমনও রহিয়াছে যাহা শিকার করার উদ্দেশ্যে এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত যায়। এখন ভূ পৃষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য কর; দেখিবে যে, পিপীলিকা ভক্ষণকারী জানোয়ার জিহবা বাহির করিয়া কিভাবে ওৎপাতিয়া রহিয়াছে। ইহার জিহবাতে এক প্রকার মিষ্টি দ্রব্য মিশানো

আছে। এই মিষ্টির লোভে পিপীলিকা ইহার জিহবার উপরে যায়, তখন ইহা চট করিয়া জিহবা ভিতরে লইয়া যায় আর সমস্ত পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। মাকড়সা মশা-মাছি শিকার করে। মশা-মাছি শিকারী প্রাণী মশা-মাছি মারিয়াই স্বীয় আহারের উপযোগী করিয়া তোলে। বাঘ বাঁদর মারিয়া খায়। জঙ্গলের মধ্যে বাঘ, সিংহ এবং চিতাবাঘের খাদ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা সকলেরই জানা আছে। বিড়াল কিভাবে ইঁদুর মারিয়া আহার করে তাহা সকলেই জানে।

এখন বল তো; বিশ্ব নিখিলের এই ব্যবস্থাপনা দেখিয়া কি কেহ বলিতে পারে যে, যবেহ করিবার যে সাধারণ কানুন দুনিয়াতে জারী রহিয়াছে- ইহা কি জুলুমের উপর ভিত্তি করিয়া হইয়াছে? কখনও নহে। ইহা নিঃসন্দেহে জুলুম নয়। তাহা হইলে মানুষ যখন পশু যবেহ করে তখন তাহার উপর জুলুমের দোষ চাপাইয়া দেওয়ার কি অর্থ হইতে পারে? মানুষের দেহে উকুন হয়, পোকা হয়- কিন্তু কত বেপরোয়াভাবে ইহাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়? তবে কি ইহার নাম জুলুম হইতে পারে।

উচ্চ মর্যাদাশীলের উদ্দেশ্যে নিম্ন মর্যাদাশীলকে হত্যা করা যখন জুলুম নয় তখন যবেহের উপর কিভাবে আপত্তি উথাপিত হইতে পারে? বরং একটু চিন্তা করিয়া দেখ যে, মালাকুল মওত কি নির্দ্বিধায়ভাবে নবী-রাসূল, আমীর-গরীব, ছোট-বড়, সাধারণ ও সওদাগর সর্বপ্রকার লোককে মারিয়া মারিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় করে।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয়ে একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখ যে, যদি ঈদুল আযহাতে পশু যবেহ করা নির্দয়তার পরিচায়ক হয়- আর আমরা ঈদুল আযহাতে পশু যবেহ করা পরিত্যাগ করি- তাহা হইলে কি আল্লাহ পাক ইহাদিগকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখিবেন? আর ইহারা না মরিলেই কি ইহাদের প্রতি দয়া করা হইবে? এই ভূমিকা উল্লেক করার পর আমাদের জিজ্ঞাসা হইল যে, যদি যবেহ করা দয়া ও কৃপণতার পরিপন্থী হইত, তাহা হইলে আল্লাহ পাক শিকারী এবং মাংসভোজী প্রাণী সৃষ্টিই করিতেন না। অধিকন্তু যদি যবেহ না করা হয়, তাহা হইলে তো এই সব প্রাণী রোগে পড়িয়া মারাই পড়িবে। এখন চিন্তা কর যে, মৃত্যুর সময় ইহাদের কত কষ্ট হইত।

দুনিয়াতে আমরা প্রত্যোক্ষ করিতে পাই যে, প্রতিটি জিনিস সীমাহীন বৃদ্ধি পাইতে চায়। বট গাছের যতগুলি বীজ মাটিতে পতিত হয়। যদি ইহার বীজসমূহ নষ্ট না হইয়া প্রতিটি বীজ হেফাজতে থাকিত তাহা হইলে দুনিয়া বট গাছে ভরিয়া যাইত। অন্য কোন গাছ উৎপন্ন হওয়ার স্থানই পাওয়া যাইত না। অধিকন্তু হাজারো জন্তু ইহার ফল ভক্ষণ করিয়া ফেলে- ইহা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক ইহার বৃদ্ধি রোধ করিতে চান। অনুরূপভাবে যদি আল্লাহ পাক সমস্ত গাভীসমূহ রক্ষা করেন, ইহাদের যবেহ করার কোন ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর গাছপালাও ইহাদের আহারের জন্য যথেষ্ট হইবে না; বরং শেষ পর্যন্ত ইহারা ক্ষুৎপিপাসায় ধ্বংস হইতে থাকিবে। যখন যবেহ না করার ফলে এমন দৃশ্যের অবতারণা হয় তখন ইহাদের যবেহ করা আল্লাহ পাকের মর্জির পরিপন্থী কেন হইবে?

মানুষ যবেহ করা না জায়েয হওয়ার কারণ

উপরে উল্লিখিত রহস্য বর্ণনা শুনিয়া কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, তাহা হইলে তো মানুষ যবেহ করাও বৈধ হওয়া উচিত। অবশ্য নিঃসন্দেহে যবেহ মানুষের জন্য উত্তম। এই জন্যই আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া উত্তম হওয়া সম্বন্ধে সকলে একমত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সাধারণভাবে মানুষ যবেহ হওয়া বা মানুষকে যবেহ করা নিষিদ্ধ। ইহার পক্ষে মজবুত মজবুত দলীল রহিয়াছে।

সারকথা, মানুষের সাথে অন্যান্যদের অধিকার সম্পর্কিত রহিয়াছে। কাহারও সাথে তাহার লালন-পালনের সম্পর্ক, কাহারও সাথে অন্য কিছু, আবার অন্য কাহারো সাথে আবার অন্য কিছু। যদি মানুষ যবেহ করার বিধান চালু করা হইত- তাহা হইলে অসুবিধার একটি বিরাট ধারা চালু হইয়া যাইত। অর্থাৎ বিভিন্ন দিক দিয়া অসুবিধা দেখা দিত। এইজন্য মানুষের হত্যাকারী শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাজা প্রাপ্য। আবার সামাজিক ভাবেও সাজা প্রাপ্য। তাই শরয়ী ও সামাজিক উভয় কানুনে ইহা মারাত্মক অপরাধ।

মোটকথা; মানুষ হত্যা করা বৈধ না হওয়ার কারণ- মানুষের সাথে অনেক কিছুর অধিকার সম্পর্কিত রহিয়াছে। যদি মানুষ হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে অধিকারসমূহ নষ্ট হইয়া আরও অধিক দুঃখের কারণ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় / হজ্জ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জ ও কাবার তওয়াফের কারণ

১। বনী আদমের জন্য হজ্জপালন করা নির্ধারিত হওয়ার হেকমত হইল যে, আল্লাহ পাকের সাধারণ নীতি হইল- রূহানী বিষয়ের প্রকাশক বাহ্যিক নমুনা স্বরূপ দৈহিক আমল নির্ধারিত করেন, যাহাতে এই বাহ্যিক দৈহিক আমলটি রূহানী বিষয়ের ধরনের ইঙ্গিতবহ হয়। এই নীতি অনুযায়ী তিনি কাবাঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আসল কথা হইল যে, মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। ইবাদত দুই প্রকার। এক প্রকার হইল নিজকে বশীভূত, বিনয়ী, ছোট প্রকাশ করা। দ্বিতীয় প্রকার হইল মহব্বত এবং উৎসর্গ। নিজকে বিনয়ী, ছোট ও বশীভূত বলিয়া প্রকাশ করার জন্য নামাযের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

নামায মানুষের প্রতিটি অঙ্গকে বিনয় ও ধ্যান মগ্ন অবস্থায় নিপতিত করে, যাহা মানবের দৈহিক অঙ্গ দ্বারা প্রকাশ পায়। এমনকি অন্তরের সিজদাকে প্রকাশ করার জন্য নামাযীর দেহের ও সিজদা রাখা হইয়াছে, যাহাতে অন্তর এবং দেহ উভয় ইবাদতে শামিল হয়।

২। দৈহিক সিজদা বেকার ও অর্থহীন নয়। রূহ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি দেহেরও সৃষ্টিকর্তা। রূহ এবং দেহ উভয়ের উপর আল্লাহ পাকের সৃজন কর্তৃত্বের অধিকার রহিয়াছে। এই বিষয়ে সকলে একমত। অধিকন্তু রূহ ও দেহ ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রভাব কবুল করিয়া থাকে। কখনও কখনও দৈহিক সিজদা রূহানী সিজদাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। আবার কখনও কখনও রূহ দেহের মধ্যে সিজদার অবস্থা পয়দা করে। কেননা রূহ এবং দেহ সামনা-সামনি রাখা দুইটি আয়নার ন্যায়। যেমন সামনা-সামনি রক্ষিত দুইটি আয়নার একটির মধ্যে কোন বস্তু দেখা গেলে অপরটির মধ্যেও দেখা যায়। রূহ ও দেহ তদ্রূপ। উদাহরণ স্বরূপ- যখন কোন

ব্যক্তি বানোয়াটি করিয়াও স্বীয় দেহে হাসির আকৃতি সৃষ্টি করে তখন এমন সময় তাহার বাস্তব হাসিও আসিয়া যায়। ফলে তাহার অন্তরে আনন্দের সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি বানোয়াটি করিয়া তাহার দেহে অর্থাৎ চক্ষুতে ক্রন্দনের ভাব সৃষ্টি করে তখন এমন সময় তাহার সত্যিকার কান্নাও আসিয়া যায়। ফলে তাহার অন্তরে ব্যথা ও নম্রতার সৃষ্টি হয়।

যখন প্রমাণ হইল যে, এক প্রকার ইবাদত অর্থাৎ নিজকে ছোট, বশীভূত এবং বিনয়ী প্রকাশ করার প্রভাব অন্তরে পতিত হয়। অর্থাৎ এই প্রকার ইবাদতে রূহের প্রভাব দেহের উপর, আবার দেহের প্রভাব রূহের উপর পতিত হয়। তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রকার ইবাদতে অর্থাৎ মহব্বত আর উৎসর্গের ক্ষেত্রেও রূহ এবং দেহ একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে।

৩। প্রেমের জগতের নীতি হইল যে, মানব-মন সর্বদা স্বীয় প্রিয়ার আশেপাশে চক্কর খাইতে থাকে। প্রিয়ার ঘরের চৌকাঠ চুম্বন করিতে থাকে। সুতরাং প্রেমের জগতে সত্যিকার প্রেমিক মানবের প্রেমময় অন্তরের অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশের নমুনা হইল- খানায়ে কাবা। এই জন্য কাবা সম্পর্কে বলা হইয়াছে- দেখ; ইহা আমার ঘর। এই হজরে আসওয়াদ আমার ঘরের চৌকাঠের পাথর। মানুষকে এই ঘরের তাওয়াফ করা এবং এই ঘরকে কেন্দ্র করিয়া হজ্জ পালন করার নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে মানুষ দৈহিকভাবে স্বীয় প্রেম ও ভালবাসার আবেগ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্যই হজ্জ পালনকারী হজ্জ পালন করার স্থানে গিয়া দৈহিকভাবে প্রেমিকের আকৃতি গ্রহণ করিয়া এই ঘরের চারিদিকে চক্কর লাগাইতে থাকে। যেন সে আল্লাহর প্রেমে বিভোর ও পাগলপরা। সে তথায় সাজসজ্জা, মনোরম ভুষণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলে এবং আত্মহারা ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করিয়া প্রেমে উচ্ছলিত ব্যক্তির ন্যায় এই ঘরের চারিদিকে তাওয়াফ করিতে থাকে। তাহার এই দৈহিক আবেগ তাহার মধ্যে রূহানী আকর্ষণ ও মহব্বত পয়দা করে। এই কারণেই মানব দেহ এই ঘরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে এবং কাল পাথর চুম্বন করে।

৪। অধিকাংশ মানুষ খোদার প্রেমে অস্থির হইয়া থাকে। এই সময় তাহাদের কোন না কোনভাবে এই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ করিয়া অস্থিরতা থেকে

মুক্তি লাভের প্রয়োজন হয়। তখন এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাহার হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন জিনিস সামনে থাকে না।

৫। প্রত্যেক জাতির ও সম্রাজ্যের জন্য সর্বদা এমন কোন সমাবেশের প্রয়োজন হয়, যাহাতে একে অপরের সাথে পরিচিত হইতে পারে এবং পরস্পরে লাভবান হইতে পারে। আর এই জাতি বা সাম্রাজ্যের বড় বড় নিদর্শনসমূহকে সম্মান করিতে পারে। অনুরূপভাবে ধর্মের জন্য হজ্জের প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহাতে পরস্পরের সাথে মিলিত হইয়া একে অপরের থেকে ফায়দা অর্জন করিতে পারে। কারণ পরস্পরের সাক্ষাৎ এবং মিলামেশার দ্বারাই একে অপর থেকে উপকার লাভ করিতে পারে। আর ইহার মাধ্যমে দ্বীনের বড় বড় নিদর্শনগুলির সম্মান প্রকাশ হয়।

৬। দ্বীনের ইমামগণ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের অবস্থা স্মরণ করা এবং তাহাদের তরীকা অবলম্বন করার প্রস্তুতির জন্য হজ্জ অপেক্ষা অধিক লাভবান আর কোন জিনিস নাই।

৭। হজ্জ করিতে গিয়া দীর্ঘ পথ সফর করিতে হয়। তাই ইহা খুব কষ্টকর আমল। ইহাতে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আর হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয় উহা খালেছ ইবাদত হিসাবে গণ্য হইবে। এই ধরনের ইবাদতের দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়।

৮। আল্লাহ পাকের অতিনিকটতম কতক ফিরিশতা রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ পাকের আরশের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহার তাওয়াফ করিতেছে। যাহারা আল্লাহ পাকের ঘরের তাওয়াফ করে- তাহারা ঐ সকল ফিরিশতার সাথে তুলনীয়।

৯। কাবাঘর তাওয়াফ করার দ্বারা শুধু দেহকে কাবার চারিদিকে ঘুরানো উদ্দেশ্য নয়; বরং ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কাবার প্রভু মহান আল্লাহ পাকের তাওয়াফ করা। আর আল্লাহ পাকের তাওয়াফ অন্তরের দ্বারা হয়। সুতরাং উত্তম তাওয়াফ হইল অন্তর দ্বারা আল্লাহ পাকের তাওফ করা। কাবাঘর এই দুনিয়াতে আল্লাহর দরবারের নমুনা। আল্লাহর দরবার তো চোখের সামনে দৃশ্যমান নহে। ইহা চোখের অন্তরালে অবস্থিত। তাই দৃশ্যমান জগতে কাবা ইহার নমুনা। যেমন দেহ আত্মার নমুনা।

১০। আনুগত্য দুই প্রকার। এক প্রকার আনুগত্য সেবামূলক। যেমন সেবক তাহার মনিব বা বাদশাহের সামনে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় প্রকার আনুগত্য প্রেমমূলক। যেমন প্রেমিক স্বীয় প্রেমাষ্পদের সাথে করিয়া থাকে।

প্রথম প্রকারের আনুগত্যের চাহিদা হইল– মনিব বা বাদশাহের দরবারের উপযুক্ত পোশাক পরিধান করিয়া খুব আদব ও গাম্ভীর্যের সাথে তাহার দরবারে উপস্থিত হওয়া। সকল উপরস্থ এবং মুরুব্বীদের আনুগত্যের ইচ্ছা প্রকাশার্তে কানের উপর হাত রাখিয়া তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করা। হাত বাঁধিয়া নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষা করিতে থাকা। তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে যমীনের উপর ললাট রাখিয়া দেওয়া। ইহা হইল নামাযের আকৃতি প্রেমমূলক আনুগত্যের জন্য জরুরী হইল– প্রেমিক স্বীয় প্রেমাষ্পদের সামনে নিজের ক্ষুধা-পিপাসার প্রতিও লক্ষ্য না রাখে। অতি নিকটতম লোক এমনকি পিতা-মাতাকে ছাড়িয়া পর্যন্ত প্রেমাষ্পদের সাথে মিলিয়া একদেহ হইয়া যায়। যখন কোন স্থানের কথা অবগত হয় যে, সে স্থান তাহার প্রেমাষ্পদের দৃষ্টি পতিত হওয়ার এবং অনুগ্রহ অবতীর্ণ হওয়ার স্থান তখন সে ঐ স্থানের দিকে উম্মাদের ন্যায় দৌড়াইতে থাকে। টুপি-পাগড়ীর প্রতিও খেয়াল থাকে না। আলো দেখিয়া পতঙ্গ যেভাবে দৌড়াইয়া আসে অনুরূপভাবে সে ঐ স্থানের দিকে দৌড়াইয়া আসিতে থাকে। যদি কোথায়ও শত্রুর পক্ষ হইতে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে সেখানে শত্রুর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ইহা হজ্জের আকৃতি।

১১। সকল জাতির মধ্যেই মেলা অনুষ্ঠানের প্রথা চালু রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল মেলা শুধু মাত্র পার্থিব ফায়দার উপর ভিত্তি করিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। যত জাতির মধ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে– তাহাদের সবগুলি মেলা বিশুদ্ধ তাওহীদ হইতে অনেক দূরে; বরং ইহাদের উদ্দেশ্য হয়– খেল-তামাসা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করা। আল্লাহ পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কোন সম্পর্ক ইহাদের সাথে নাই। পক্ষান্তরে হজ্জের সমাবেশ একটি ইসলামী মেলা। ইহা আগাগোড়া পুরাটাই রূহানীয়াত ও আল্লাহ প্রেমে ভরপুর।

হজ্জ বিত্তশালীদের উপর ফরয হওয়ার কারণ

১। আরাম প্রিয়তা এবং অহংকার [illegible] ব্যাধি।

উন্নতির পথে অন্তরায়। আর দীর্ঘ পথ সফর করা, স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজন পরিত্যাগ করা, সফরের অবস্থায় শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা, বিভিন্ন দেশের ইলম, চালচলন, বিভিন্ন ধর্মের এবং রীতিনীতির সাথে পরিচিত হওয়া প্রভৃতি তাহাদের অলসতা এবং সংকীর্ণতার মূলোৎপাটন করে।

২। হজ্জের বিভিন্ন আমল অহংকার ও আমিত্বের বড় শক্ত দুশমন। সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য বর্জন করা, মাথা মুণ্ডাইয়া দরিদ্র ও অসহায়দের সাথে চলা দুনিয়া-লোভী আরামপ্রিয়দের সাহস বৃদ্ধি করার মাধ্যম হয়।

মোটকথা– হজ্জ হইল মুসলমানদিগকে অভিজ্ঞ এবং সতর্ক করিয়া গড়িয়া তোলার মাধ্যম।

৩। এক দেশ হইতে অন্য দেশে ফায়দা পৌছানের ক্ষেত্রে বিত্তশালীরা যে ভূমিকা রাখিতে পারে, নিঃসন্দেহে সাধারণতঃ দরিদ্ররা সে ভূমিকা রাখিতে পারে না।

এহরাম বাঁধিতে সেলাই বিহীন মাত্র দুইটি চাদর ব্যবহার করিবার রহস্য

বিত্তশালীদের উপর হজ্জ ফরয। তাহারা হজ্জে গমন করার সময় তাহাদের সাথে তাহাদের চাকর-সেবকদেরও হজ্জে যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমনকি তাহাদের সাথে চাকর-সেবক গিয়াও থাকে। আর এমন কতক দরিদ্র লোকও রহিয়াছে যাহারা সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রেমে বাধ্য হইয়া হজ্জে গমন করিয়া থাকে। ধনী-গরীব সকল হজ্জ পালনকারীদের মধ্যে ঐক্য ও একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলাম সকলের জন্য সাধারণ পোশাক নির্ধারণ করিয়াছে। যেমন সকলে মাত্র দুইটি সাদা চাদর ব্যবহার করিবে। আমীর গরীব সকলেই মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলিবে। গায়ের জামা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সাদাসিদা পোশাক পরিধান করিবে, যাহাতে তাহাদের ঐক্য ও একতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

হজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) হাত দ্বারা স্পর্শ করা এবং ইহা চুম্বন করার উপর আপত্তি ও উহার জবাব

মুর্খরা বলে যে, মুসলমানরা পাথরের পূজা করে। কিন্তু আর্যরা আর খৃষ্টানরা বলে যে, ইবাদত হইল প্রশংসা ও গুণকীর্তন, দোয়া এবং ধ্যান করা। বল তো দেখি, মুসলমানরা কখন পাথরের কাছে দোয়া করে? কখন ইহার প্রতি ধ্যান করে আর কখন ইহার প্রশংসা করে? অধিকন্তু কোন ইসলামী ইবাদতে ইহার উল্লেখও নাই। বরং ইসলামী ইবাদতে মক্কারও আলোচনা নাই। তাহা হইলে ইহার ইবাদতের তো কথাও হইতে পারে না। যদি ইহা স্পর্শ করা বা ইহাতে চুম্বন করা ইবাদত হয় তাহা হইলে মানুষ স্বীয় স্ত্রীর ইবাদতকারী আর যমীনের পূজারী সাব্যস্ত হইবে?

প্রকৃতপক্ষে ইহা পবিত্র স্থানে চিত্রের ভাষা কথা যে, নবুয়তের বিরাট প্রাসাদের এক কোণার পাথর এখান থেকে বাহির হইয়াছে। বরং হযরত ঈসা (আঃ) মাত্তা বাবে ৩৩–এ নিজেই বলিয়াছেন যে, ইহা একটি উপমামাত্র।

নোটঃ সকল নবীগণ একটি প্রাসাদের সাথে তুলনীয়। কিন্তু এই প্রাসাদের এক কোণে একটি পাথর বা ইটের জায়গা খালি ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা ইহা পূর্ণ করা হইয়াছে। হজরে আসওয়াদ স্বীয় চিত্রের ভাষায় বলিতেছে যে, নবুয়তের প্রাসাদের কোণের এই পাথরটি এখান থেকে অর্থাৎ মক্কা থেকে বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ আখেরী নবী এখান থেকে প্রকাশ পাইয়াছেন। তাই এই পাথর সম্মান পাওয়ার যোগ্য। এই সম্মানের বহিঃপ্রকাশ ইহা স্পর্শ করা ও চুম্বন দ্বারা করা হয়।

হজরে আসওয়াদ চিত্রের ভাষার নমুনা

প্রাচীন কাল হইতেই দুনিয়াতে চিত্রের ভাষার প্রচলন রহিয়াছে। আর এখনও আছে। রামচন্দ্র এবং শাইয়ুজীর চিত্র–কাহিনী এখনও হিন্দুদের কাছে বিশেষ করিয়া প্রাচীন হিন্দু চিত্রকরদের কাছে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। হযরত দানিয়েলরুমী সেকান্দর রুমীকে স্বপ্নে এক শিংওয়ালা ছাগল দেখিয়া ছিলেন। ইহা চিত্রের ভাষার সাক্ষ্য। (দানিয়েল ৮ বাব)

অনুরূপভাবে ইরানের বাদশাহ দ্বারা চিত্রের ভাষার আলোচনা বিভিন্ন

কবিতার মধ্যেও পাওয়া যায়। হিন্দুস্তানের চিত্রের ভাষার গ্রন্থটি এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মিশরের এক পত্রিকা সম্পাদক পুরানকালের চিত্রের ভাষা সম্পর্কে একটি ছোট্ট পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে শুধু জীবজন্তু, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতির ছবি রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে দুনিয়াতে এই ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখনও যেসব এলাকায় শিক্ষাদীক্ষার চর্চা কম অথবা চর্চাই নাই সেসব এলাকাতে চিত্রের ভাষার যথেষ্ট প্রচলন রহিয়াছে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রের ভাষা লিখার ভাষা হইতে সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। এই জন্য স্মরণীয় জিনিসগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

ইউশা ইবনে নুন ইয়ারদান এলাকা দিয়া যাওয়ার সময় বারটি পাথর বহন করিয়া যাইতেছিলেন। (ইউশা বাব ৬) খৃষ্টানদের অভিমত হইল যে, এই বারটি পাথর ভবিষ্যত বাণী ছিল যে, হযরত ঈসা এর হাওয়ারী বারজন হইবেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা অন্যান্য সম্প্রদায়দিগকে এবং কোন কোন বিশেষ ব্যক্তিকে পাথর বলিত। ইহা তাহাদের পরিভাষা। বতরসকে তাহারা পাথর বলিয়াছে। কারণ সে তাহাদের গীর্জার বুনিয়াদী পাথর হইয়াছে। উল্লিখিত কথাগুলি খুব চিন্তা করিয়া দেখ।

এই ভূমিকার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুন; যাহা খৃষ্টানদের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। লাওকা ২০ বাব ১৬, ১৭ দেখ তথায় লিপিবদ্ধ আছে "ঐ পাথর যাহা বাদশাহরা প্রত্যাখান করিয়াছে। তাহা কোণের পরিপূরক হইল।" যবুরঃ১৮–২২ দেখ। তথায় লিপিবদ্ধ আছে, "ঐ পাথর যাহা মিস্ত্রী প্রত্যাখান করিয়াছে তাহা কোণের পরিপূরক হইল।" (মাত্তা ২১ বাব, তৌরিয়াত ৪২, ৪৪)

মোটকথা, এই সুসংবাদটি কয়েকটি খৃষ্টীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সুসংবাদ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ ও সত্যতার সাক্ষী স্বরূপ মক্কা মোয়াজ্জমার এই মহান ইবাদতখানার মধ্যে চিত্রের ভাষা হিসাবে হজরে আসওয়াদকে এক কোণায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অস্তিত্বের শত শত বৎসর পূর্বে এই পাথরটি ইবরাহীমী ইবাদত খানার সামনে রাখা হইয়াছিল। আরবের লোকেরা ইহা চুম্বন করিত এবং ইহাতে হাত লাগাইত।

সারকথা, আরবী নবীর আগমনের অনেক পূর্বে দূর-অতীত হইতেই এই পাথরটি মক্কার পবিত্র মসজিদের সামনে চিত্রকথা হিসাবে রাখা হইয়াছিল যে, এই শহর হইতে নবুয়তের প্রাসাদের কোণার পাথর প্রকাশ পাইবে। ইহাকে এইভাবেও বলা যায় যে, আম্বিয়া ও রাসূলগণের দ্বারা নবুয়ত ও রিসালাতের যে সুউচ্চ ও সুদৃঢ় ইমারত গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা এই পাথরের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করিবে। কোণের এই পাথরের এত মর্যাদা হইবে যে, তাহার বশ্যতা আল্লাহ পাকের বশ্যতা এবং তাহার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। মিশকাত শরীফে দেখ; রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَثَلِىْ وَ مَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَل قَصْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُه وَ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ

إِلٰى ان قَالَ فَكُنْتُ أَنَا سَدَّدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةِ

"আমার ও অন্যান্য নবীগণের উদাহরণ এক প্রাসাদের উদাহরণ, যাহা খবু সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে এক ইট পরিমাণ স্থান খালি রাখা হইয়াছে।" হাদীছের শেষাংশে তিনি বলেন– "আমি ঐ ইটের স্থানটি বন্ধ করিয়াছি।" এক রেওয়ায়েতে আছে যে, "আমিই সেই ইট।"

সাফা ও মারওয়া পর্ববতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করার রহস্য

১। সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান খানায়ে কাবার চত্বর। এখানে সায়ী (দৌড়াদৌড়ি) কারীর উদাহরণ এক গোলামের উদাহরণ যে, বাদশাহের প্রাসাদের চত্বরে বার বার আসা যাওয়া করিতেছে। বার বার আসা-যাওয়ার পিছনে তাহার উদ্দেশ্য হইল বাদশাহের সামনে তাহার ইখলাস প্রদর্শন করা, যাহাতে বাদশাহের কৃপা-দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়।

২। এক ব্যক্তি রাজদরবারে প্রবেশ করিল। অতঃপর বাহির হইয়া আসিল। তাহার মনের অবস্থা এইরূপ যে, সে জানে না বাদশাহ তাহার সম্পর্কে কি ফয়সালা করেন। তাহার আবেদন মঞ্জুর করেন না প্রত্যাখান করেন– তাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। এই জন্য রাজদরবারের চত্বরে বার বার এই আশা লইয়া

আসা-যাওয়া করিতেছে যে, যদি একবার কৃপার দৃষ্টি না করেন হয়তবা দ্বিতীয় বার করিবেন। সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ীকারীর অবস্থা অনুরূপ। কবি কতইনা সুন্দর বলিয়াছেন, যাহার মর্মার্থ এইঃ

★ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন এক দরজাতে আঘাত করিতে থাকিবে– শেষ পর্যন্ত এই দরজা হইতে কোন না কোন মাথা বাহিরে আসিবেই।

★ বান্দাদের মাথার উপর আল্লাহ পাকের ছায়া থাকে। শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানকারী পাইয়া থাকে।

★ যদি তুমি গলির এক কিনারায় বসিয়া যাও; তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত তুমি কাহারও চেহারা দেখিবেই।

★ যখন তুমি কোন কূপ হইতে প্রতিদিন মাটি খুদিতে থাকিবে। তখন শেষ পর্যন্ত তুমি সাফ পানি পর্যন্ত পৌছিবেই।"

৩। সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ী করার রহস্য এই যে, হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর মাতা হযরত হাজেরা যখন শক্ত পেরেশানীতে পড়িয়াছিলেন তখন তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে চিন্তাযুক্ত মানুষের ন্যায় দ্রুত কদম ফেলিয়া ফেলিয়া চলিতেছিলেন। আল্লাহ পাক দুইভাবে তাহার মনের চিন্তা দূর করিলেন। একঃ তাহার জন্য যমযমের পানি বাহির হইয়া আসিল। দুইঃ মানুষের অন্তরে এই জনমানবহীন মরুভূমিতে বসবাস করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়া দিলেন। এই জন্য এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং তাঁহার এই মর্যাদার কথা স্মরণ করা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সন্তানাদি ও তাঁহার অনুসারীদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত হইল, যাহাতে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের এবং তাহার মর্যাদার কথা স্মরণ করার ফলে তাহাদের মধ্যে নিহিত পশুত্বশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে আর ইহা তাহাদিগকে আল্লাহ পাকের প্রতি পথ প্রদর্শন করে।

শুকরিয়া আদায় ও মর্যাদার কথা স্মরণ করার জন্য সর্বাধিক উত্তম পন্থা হইল ইহা কোন বিশেষ কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা। আর কার্যটিও যেন সাধারণ স্বভাব পরিপন্থী হয়। আর সে কার্যটি হইল, হযরত হাজেরার কষ্টক্লেশ মিশ্রিত পদচারণার অনুকরণ করিয়া দেখানো। এমন ক্ষেত্রে কোন এক অবস্থার অনুকরণ করিয়া দেখানো মৌখিক বর্ণনা অপেক্ষা অনেক উপকারী হয়।

হজ্জের জন্য মক্কার ভূমি নির্ধারিত হওয়ার কারণ

হজ্জব্রত পালন করিবার জন্য এমন এক স্থানে একত্রিত হওয়া প্রয়োজন যেখানে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। মক্কাতে আল্লাহর ঘর অবস্থিত। আর আল্লাহর ঘর আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শন। তাই এই স্থানটি হজ্জের জন্য সর্বাধিক উপযোগী স্থান। কেননাঃ

(ক) হযরত ইবরাহীম (আঃ) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাহার সততা ও গুণাবলী অধিকাংশ জাতি স্বীকার করে। আর তিনিই আল্লাহর নির্দেশে এই ঘরের ভিত্তি কায়েম করিয়াছেন।

(খ) এই স্থান ইসলামের সূচনা কেন্দ্র। অধিকন্তু এখানে এমন এমন ব্যক্তিত্বের স্মারক রহিয়াছে, যাহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে শক্ত হইতে শক্ত প্রতিমা পূজার মূলোৎপাটন হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ তাওহীদ কায়েম হইয়াছে।

(গ) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাওহীদের বাণী মক্কা মোকাররমা হইতেই প্রচার হওয়া শুরু হইয়াছে। এই মর্যাদাশীল স্থানই তাওহীদের সহায়তা করিয়াছে আর শিরকের শিকড় উপড়াইয়া ফেলিয়াছে। জাতির নেফাকী, অনৈক্য, গৃহযুদ্ধ, দ্বিমুখী নীতি, নারী-হত্যা, মদ্যপান, ধ্বংসাত্মক জুয়া খেলা প্রভৃতির চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিয়াছে। নেফাকী, ধোঁকাবাজি, অলসতা ও অকর্মন্যতা প্রভৃতির পরিবর্তে স্বাধীনতা, ধৈর্য্য, সাহস, ভ্রাতৃত্ব, মহানুভূতি, বীরত্ব, স্বাতন্ত্র্যতা এবং দৃঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে।

হজ্জের মধ্যে মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলার কারণ

হজ্জের মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত মাথা খোলা থাকে বিধায় মাথায় ধূলি বালি জমা হয়। সর্বসাধারণের জন্য মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলা অথবা চুল কাটিয়া ফেলা ব্যতীত মাথা পরিষ্কার করিবার উত্তম পদ্ধতি আর কিছুই হইতে পারে না। মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলার হুকুম কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত আছে। অনুরূপভাবে ইহার প্রথা এবং ইহার প্রমাণ খৃষ্টানদের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। যেমন আইয়ুব ১০ বাবে দেখ; তথায় লিপিবদ্ধ আছে, "মান্নতকারী জমাতের তাবুর দরজার সামনে মাথা মুণ্ডাইবে।"

কাবার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ার কারণ

১। আল্লাহ পক কুরআন করীমে এই রহস্যটির প্রতি দিক নির্দেশনা করিয়াছেন-

وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ

"এবং আমি আপনার জন্য ঐ কেবলা নির্ধারণ করিয়াছি যাহার প্রতি আপনি পূর্বে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন; শুধু এই জন্য যে, আমি অবগত হইতে পারি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছনের দিকে ফিরিয়া যায়।"

২। ইহা পরিষ্কার কথা এবং সত্য ও বাস্তব অনুধাবনকারী বিবেকবান ব্যক্তি এই কথার মধ্যে কোন সন্দেহও পোষণ করিবে না যে, ইবাদতের জন্য দুনিয়ায় প্রচলিত বিভিন্ন পন্থা হইতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের পন্থা পৃথক করা অতীব প্রয়োজন ছিল। কেননা শিরক ও মাখলুক পূজা অন্যান্য পন্থাগুলির বড় অংশ ছিল। তাই শিরকমুক্ত একটি বিশুদ্ধ ও পৃথক ইবাদতের পন্থা কায়েম করা অপরিহার্য ছিল। এই জন্য স্বীয় উম্মতের বাহ্যিক রূখকে এমন একটি দিকের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল যেদিকে রূখ করিলে রূহানী শক্তিগুলিতে জাগরণের সৃষ্টি হয়।

৩। কাবার দিকে রূখ করিয়া নামায আদায় করার ফলে জাতীয় ঐক্য ও একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য সকলকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যেন তাহারা এক অন্তর হইয়া প্রকৃত মাবুদের ইবাদত করে। প্রত্যেক মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তাওহীদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রবক্তা হযরত ইবরাহীম (আঃ) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করিয়াছেন। আর শেষযুগে তাঁহারই বংশ হইতে এক মহান পরিপূর্ণ নবী পূর্ণ শরীয়ত লইয়া আগমন করিবেন। তিনি পূর্ববর্তী শিক্ষাদীক্ষাকে পুনরায় সতেজ ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবেন। সুতরাং নামাযের মধ্যে যখন কাবার দিকে রূখ করিবে তখন এইসব বিষয় নামাযীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে। আর বিশ্ব সংস্কারক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনে যে পরিশ্রম ও মেহনত এবং দুঃখ কষ্ট করিয়াছেন- তাহা তাহাদের স্মরণ হইতে থাকিবে।

৪। মুসলমানগণ খানায়ে কাবাকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলেন। যদি কেহ কাহারও ঘরে যায় তাহা হইলে আগমনকারীর উদ্দেশ্য ঘর হয়না বরং ঘরের মালিক উদ্দেশ্য হয়। সিংহাসনে উপবিষ্ট কোন বাদশাহ এবং বড় লোকের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করার অর্থ সিংহাসনের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন নয়; বরং সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন। যেহেতু কাবা আল্লাহর ঘর। তাই কাবার দিকে রূখ করিয়া নামায পড়ার অর্থ আল্লাহর দিকে রূখ করিয়া নামায পড়া।

৫। ইহাতে এই বিষয়টি প্রকাশ করার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে যে, এই পরিপূর্ণ দ্বীন, তৌহিদের এই সূর্য এই পবিত্র ভূমি হইতে উদিত হইয়াছে। এখন নামাযের মধ্যে কাবার দিকে রূখ করার দ্বারা এই খোদায়ী হেকমতটি স্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্যথায় সকল মুসলমানদের বিশ্বাস যে, আল্লাহ পাক কোন বিশেষ স্থানে বা কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি পদার্থিক বৈশিষ্ট্য ও জাগতিক অস্তিত্ব হইতেও মুক্ত। তিনি কোন নির্ধারিত দিকে আছেন– এমন নহে। তাঁহার অবস্থানের জন্য কোন নির্ধারিত স্থান নাই। কুরআন করীমে তিনি এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং স্বীয় পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহ গোড়া থেকেই উৎপাটিত করিয়াছেন। কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে–

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ *

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আল্লাহরই জন্য। যেদিকে মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর তাওয়াজ্জুহ রহিয়াছে।"

৬। আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা করিয়া দেখার যোগ্য। নামায শুরু করার সময় যখন মুসলমান কেবলা রূখ হইয়া দণ্ডায়মান হয় তখন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে–

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"সমস্ত বাতিল হইতে মুখ ফিরাইয়া শুধু এমন এক সত্তার দিকে রূখ করিয়া লইয়াছি যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

এতটুকু পরিষ্কার বর্ণনার পরও মুসলমানদের সম্বন্ধে এই সন্দেহ কিভাবে করা যায় যে, মুসলমানরা কাবার পূজা করে?

৭। সকলকে কাবার দিকে রূখ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে জামাতের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি দেখা না দেয় আর সকল মুসলমান এক রূখী হইয়া যায়।

মিকাত থেকে এহরাম বাঁধা আর লাব্বায়েক বলার রহস্য

হজ্জ করার জন্য মক্কাতে এমন এক অবস্থায় আগমন করা উচিত যে, এখানে আগমন করার সময় যেন হজ্জ পালনকারীর মাথায় ধুলিবালি ভরা থাকে, শরীর ময়লাযুক্ত হয় এবং মানসিক অবস্থা নীচ থাকে। অপদস্থতা ও লাঞ্ছনা তাহাকে ছাইয়া ফেলে। শরীয়ত–প্রবর্তক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহাই চান। আর এই অবস্থা এহরাম বাঁধার পর সৃষ্টি হয়। তাই মক্কা পৌছার পূর্বেই এহরাম বাঁধার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু হজ্জ পালনের জন্য আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি এই নির্দেশ দেওয়া হইত যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ শহর হইতে এহরাম বাঁধিয়া মক্কায় আসিবে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য কত কষ্টের বিষয় হইত– তাহা সহজে অনুমেয়। কেননা কোন কোন শহর মক্কা হইতে এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত। আবার কোন কোন শহর ইহা হইতেও অধিক দূরত্বে অবস্থিত রহিয়াছে। তাই এহরাম বাঁধার জন্য মক্কার আশেপাশের কয়েকটি স্থান নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যাহাতে এহরাম না বাঁধিয়া এই নির্ধারিত স্থান অতিক্রম না করে। কিন্তু এই স্থানগুলি সকলের কাছে পরিচিত ও খ্যাতনামা হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে কেহ এই সকল স্থান সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকে।

লাব্বায়েক বলার ভেদঃ মিকাত হইতে এহরাম বাঁধিয়া লাব্বায়েক বলা শুরু করিতে হয়। লাব্বায়েকের অর্থ আল্লাহ পাকের আহবানের জবাব দিতেছি যে, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হইয়াছি। লাব্বায়েক বলার সময় তাহার জবাব কবুল হওয়ারও আশা রাখিতে হইবে আবার এই ভয়ও করিতে হইবে যে, নাজানি বলিয়া দেওয়া হয় যে, 'লা লাব্বাইকা ও লা সায়দাইকা' অর্থাৎ তোমার জবাব কবুল করা হয় নাই। এই জন্য আশা ও ভয়ের মধ্যে উৎকণ্ঠ থাকিবে। নিজের শক্তি সামর্থ্য হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে। একমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও

দয়ার উপর নির্ভর করিবে। কেননা লাব্বায়েক বলার সময় থেকেই হজ্জ শুরু হয়। লাব্বায়েক বলিয়া যে আহবানের জবাব দেয়– তাহা হইল কুরআনে উল্লিখিত আহবান। যেমন– اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ "মানুষকে হজ্জের জন্য আহবান কর।"

আরাফার ময়দানে অবস্থান করার ভেদ

১। আরাফার ময়দানে অবস্থানের উদ্দেশ্য হইল একই সময়ের একই স্থানে মুসলমানদের সমবেত হওয়া। আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা এবং বিনয়, নম্রতা ও খোদাভীতির সাথে তাঁহার কাছে দোয়া করা। ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে বরকত নাযিল হওয়ার এবং রূহানীয়াতের উন্নতির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব রাখে। এই কারণে এই দিবসে শয়তান সবচেয়ে বেশী অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই সমাবেশের ফলে মুসলমানদের শানশওকত প্রকাশ হয়। সকল নবীগণ হইতে এই দিনের এবং এই স্থানের বিশেষত্ব বর্ণিত আছে। হযরত আদম (আঃ) ও তাঁহার পরবর্তী নবীগণও এই প্রথা পালন করিয়াছেন বলিয়া রেওয়ায়েত আছে।

২। আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময় যখন জনতার সমাবেশ হয়, মানুষের স্বর উচ্চ হয়, বিভিন্ন ভাষাভাষী একত্রিত হয়, আর আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শনে আসা-যাওয়া করার সময় প্রত্যেক দল স্ব স্ব ইমামের পিছনে পায়ে পায়ে চলিতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে হাশরের ময়দানের কথা স্মরণ হয়। হাশরের ময়দানেও সকল উম্মত নিজেদের নবীর পিছনে সমবেত হইবে। প্রত্যেক উম্মত স্ব স্ব নবীর অনুসরণ করিবে। তাহাদের থেকে সুপারিশ লাভের আশা পোষণ করিবে। তথায় ইহা কবুল হওয়া আর না হওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকিবে। যখন মানুষের মধ্যে এই খেয়াল সৃষ্টি হইবে তখন তাহার উচিত, সে যেন নিজের অন্তরে বিনয় এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়ার অবস্থা পয়দা করে। আর নিজের মধ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহার হাশর হইবে সফলকাম ও আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত দলের সাথে।

অধিকন্তু আরাফার ময়দানে নিজের আকাঙ্ক্ষা কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা পোষণ করিতে হয়। কেননা ইহা খুব মর্যাদাশীল ময়দান। এই ময়দানে আল্লাহর মাখলুকের প্রতি তাঁহার রহমত অবতীর্ণ হয়। এই ময়দান ওলী ও আবদালের

জমাত হইতে খালি হয় না। নেককারদের জমাত এই ময়দানে অবশ্যই উপস্থিত থাকে। সুতরাং যখন মানুষ রূহানী সাহস লইয়া আল্লাহ পাকের সামনে বিনয়ের সাথে ক্রন্দন করিতে থাকে, আর তাঁহার দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দেয়। নিজেদের গর্দান তাঁহার সামনে নীচু করিয়া রাখে, রূহানীভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার রহমতের ভিক্ষুক হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এই অবস্থায় তোমরা ধারণা করিও না যে, তাহারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হইতে বঞ্চিত থাকিবে, তাহাদের এই প্রয়াস নিষ্ফল হইবে; বরং জানিয়া রাখ যে, তাহাদের প্রতি এমন রহমত অবতীর্ণ হয় যাহা সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। এই জন্য কোন কোন বুযুর্গ বলেন, কোন ব্যক্তি আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকার পরও এই ধারণা করা বড় গোনাহ যে, আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করেন নাই।

হজ্জের চূড়ান্ত পর্যায়ের উদ্দেশ্যও ইহা যে, হজ্জের মাধ্যমে সাহস জমা হয়। (অর্থাৎ রূহানীভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হয়।) এবং বিভিন্ন দেশের ওলী ও আবদাল একত্রে সমবেত হয়। আর তাহাদের নৈকট্য সাহস জমা হওয়ার মধ্যে সাহায্য করে।

সারকথা, আল্লাহর রহমত আকর্ষণ করার জন্য রূহানীভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এবং একই স্থানে একই সময় সমস্ত অন্তর সমবেত হইয়া একে অপরকে সহযোগীতা করার সমকক্ষ আর কোন পন্থা বিদ্যমান নাই।

আরাফার ময়দানে গমন করা হজ্জের একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্ম। আর সেখানে কোন পাথরও নাই। আবার কোন গাছপালাও নাই। সেখানে শুধু আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাহার কাছে দোয়া করাই একমাত্র কাজ।

মিনায় সমবেত হওয়ার রহস্য

জাহিলিয়াতের যুগে আরবের মধ্যে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। তন্মধ্যে উককায মাজান্না, যিলমাজায প্রভৃতি। মিনাও তদ্রূপ একটি প্রসিদ্ধ বড় বাজার। তাহাদের এই বাজার বসানের পিছনে কারণ ছিল যে, হজ্জের মৌসুমে অনেক দূরের দূরের দেশসমূহ হইতে বিরাট পরিমাণ জিনিসপত্র মক্কায় আসিয়া জমা হইত। এইসব জিনিস পত্রের ব্যবসার উদ্দেশ্যে হজ্জের সমাবেশকালেই সময় ও

স্থান নির্ধারণ করা অপরিহার্যছিল। আর এই জন্য তাহারা মিনাকে বাছিয়া
লইয়াছিল। কেননা বেচাকেনার সময় যে বিরাট সমাবেশের সম্ভাবনা ছিল মক্কার
মধ্যে কোন স্থান এই সমাবেশ ধারণ করিবার যোগ্য ছিল না। যদি তাহারা
সকলে মিনার ন্যায় এক প্রশস্ত ও খালি স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য একমত না
হইত তাহা হইলে তাহাদের জন্য বড় কষ্ট ও অসুবিধা হইত। অধিকন্তু তাহারা
তথায় সমবেত হইয়া স্ব স্ব বংশের যশ ও গৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতা
করিত। মোটকথা, এই সব কারণে তাহারা তথায় সমবেত হইত।

মুসলমানদের শানশওকত এবং ইসলামের খ্যাতি ও মর্যাদা প্রকাশ
করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামের মধ্যেও এমন একটি সমাবেশের প্রয়োজন ছিল।
এই জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমাবেশকে বাতিল
করিলেন না; বরং ইহা বহাল রাখিলেন। আর ইহাতে যে সকল কুপ্রথা ও
খারাপ উদ্দেশ্য ছিল ইহাদের স্থানে শরয়ী উদ্দেশ্য কায়েম করিয়া ইহাদের
সংশোধন করিয়া দিলেন। মিনার সমাবেশ কায়েম করার পিছনে আরও একটি
উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইল– সকলে একই স্থানে সমবেত হইয়া যেন মত বিনিময়
করিতে পারে এবং একে অপরের সাথে পরিচিত হইতে পারে।

মাশআরে হারামে অবস্থান করিবার কারণ

জাহিলীয়াতের যুগে মাশআরে হারাম নামক স্থানে আরবরা নিজেদের
গৌরব ও অহংকার প্রকাশ করিবার জন্য এবং নিজেদেরকে সঠিক মর্যাদা
হইতে আরও উচ্চ করিয়া বর্ণনা করার জন অবস্থান করিত। হজ্জের সময়
মুসলমানদিগকেও এখানে অবস্থান করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে,
জাহেলদের এই কার্যের পরিবর্তে বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করিবার জন্য,
যাহাতে তাহাদের এই বদ অভ্যাস বন্ধ হইয়া যায়। এখানে তাওহীদ বর্ণনা
করার যেন তাহাদিগকে এই কথার দিকে সতর্ক করা যে, দেখ; তোমরা
আল্লাহর স্মরণ বেশী করিতেছ না; জাহেলদের ন্যায় নিজের গৌরব বেশী
করিতেছ?

কংকর নিক্ষেপের রহস্যঃ

১। কংকর নিক্ষেপ করার রহস্য এক খাছ হাদীছের মধ্যে আসিয়াছে যে,

আল্লাহ পাকের যিকির করার জন্য কংকর নিক্ষেপ করার বিধান চালু করা হয়েছে। যিকির দুই প্রকার। এক প্রকার যিকির হইল; যাহার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দ্বীনের আনুগত্যের ঘোষণা করা উদ্দেশ্য হয়। এই প্রকার যিকির লোক সংখ্যা অধিক হওয়া জরুরী। এখানে শুধু যিকির করা উদ্দেশ্য নয়। কংকর নিক্ষেপ করা এই প্রকার যিকির। এই জন্যই কংকর নিক্ষেপের সময় অধিক যিকির করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং সমাবেশের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু যিকিরের মধ্যে সমাবেশ উদ্দেশ্য তাহা হইলে কংকর নিক্ষেপ করার কারণ কি? ইহা নির্ধারণ করা হইয়াছে সাধারণ যিকিরের জন্য। এই কারণেই প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলিতে হয়।

বিখ্যাত হাদীছ–গ্রন্থ আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ لِاِقَامَةِ
ذِكْرِ اللّٰهِ لَا لِغَيْرِهٖ *

“কাবার তাওয়াফ করা, সাফা–মাওয়ার মধ্যে সায়ী করা এবং কংকর নিক্ষেপ করা শুধু মাত্র আল্লাহর যিকির কায়েম রাখার জন্য; অন্য উদ্দেশ্যে নয়।”

আর দ্বিতীয় প্রকার যিকির হইল যাহা দ্বারা অন্তর আল্লাহর রঙ্গে রঞ্জিত করা উদ্দেশ্য হয়। এখানে যিকিরের আধিক্য করাই বিধান।

২। কংকর নিক্ষেপকারী কংকর নিক্ষেপ করার সময় নিয়ত করিবে যে, যদিও কংকর নিক্ষেপে বিবেক ও মনের কোন স্বাদ নাই তবুও স্বীয় গোলামী ও বন্দেগী প্রকাশ করিবার জন্য এই নির্দেশ মান্য করিতেছি এবং শুধু নির্দেশ পালন করিবার জন্যই উঠিয়াছি।

৩। কংকর নিক্ষেপের দ্বারা হজ্জ পালনকারীর কাজ হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর কাজের সাদৃশ হইবে। কেননা এই স্থানেই তাঁহার হজ্জ পালনের কাজের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বা তাহাকে কোন বিপদে ফেলার জন্য শয়তান তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়াছিল। শয়তানকে বিতাড়িত করিবার জন্য এবং তাহার ইপ্সিত লক্ষ্য নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক হযরত

ইবরাহীম (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন,তিনি যেন শয়তানকে কংকর মারেন।

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সামনে শয়তান প্রকাশ পাইয়াছিল। আর তিনিও শয়তান দেখিয়া ছিলেন। এই জন্য তিনি শয়তানকে কংকর মারিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তো শয়তান দেখিতে পাই না। সুতরাং আমরা কংকর নিক্ষেপ করিব কেন?

এই প্রশ্নের জবাব এই যে, তোমাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টিকারী এই প্রশ্নও শয়তানের পক্ষ হইতে। শয়তান তোমাদের অন্তরে এই সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে তোমরা কংকর নিক্ষেপের দায়িত্বে অলসতা কর। আর তোমাদের এমন এক খেয়াল পয়দা হয় যে, এই কার্যে তো কোন লাভ নাই। ইহা তো একটি খেলা। সুতরাং এই কার্যে কেন লিপ্ত হইব?

সুতরাং এখন আরও অধিক প্রয়াস ও দৃঢ়তার সাথে শয়তানকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার নিয়তে কংকর নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় অন্তর হইতে শয়তান বিতাড়িত কর। আর বিশ্বাস কর যে, পাথরের উপর কংকর যে কংকরটি নিক্ষেপ করিতেছ বাস্তবে তাহা শয়তানের মুখের এবং পীঠের উপর মারিতেছ। আল্লাহ পাকের যে নির্দেশে মন এবং বিবেকের কোন দখল নাই, যাহা শুধু আল্লাহ পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে করা হয় এমন নির্দেশ পালন করার মধ্যেই শয়তানের অপমাননা ও লাঞ্ছনা।

বতনে মুহাসসারে দ্রুত চলিবার রহস্য

বতনে মুহাসসারে বাহন দ্রুত চালাইয়া যাওয়ার কারণ হইল- এই স্থানটি আবরাহা বাদশাহের হস্তী-বাহিনী ধ্বংস হওয়ার স্থান। সুতরাং যাহার মধ্যে আল্লাহ পাকের ও তাঁহার বড়ত্বের ভয় রহিয়াছে সে ভীত হইয়া আল্লাহর গযব হইতে পলায়ন করিতে থাকে। যেহেতু তাহার অন্তরের ভয় অবগত করা একটি অদৃশ্য ও গোপনীয় বিষয় তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এমন একটি প্রকাশ্য আমল নির্ধারণ করিলেন যাহা তাহাকে ভয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আর তাহাকে সতর্ক করে।

হরম শরীফের জানোয়ার শিকার না করার রহস্য

১। হরম শরীফের জানোয়ারের গোশত না খাওয়া এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনীয় যে, মাংসভোজী হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় প্রেমিকার বাসগৃহের গলির জানোয়ারের গোশত খাওয়ার কথা কল্পনাও করে না।

২। মক্কার জন্য হরম নির্ধারিত হওয়ার ভেদ এই যে- প্রত্যেক জিনিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পন্থাও পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। কোন ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হইল- এই ধর্মের কোন জিনিস নষ্ট করার উদ্দেশ্যে উহার পিছনে না লাগা। সুতরাং হরম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ইহার কোন জানোয়ার শিকার করা যায় না। হরম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই পন্থা বাদশাহদের চারি দেওয়াল পরিবেষ্টিত বিশেষ স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হইতে উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

যখন কোন জাতির লোক তাহাদের বাদশাহের অনুগত হয়, তাহার নির্দেশ মান্য করিয়া চলে, তাহাকে সম্মান করে- তখন তাহার অনুগত হওয়ার মধ্যে এতটুকু অপরিহার্য যে, তাহারা নিজেদের জন্য এই বিধান নির্ধারিত করিয়া লয় যে, তাহারা তাহার চারি দেওয়াল পরিবেষ্টিত স্থানের ভিতর যে সকল গাছপালা ও জানোয়ার পাইবে- উহাদের ধ্বংস করা বা নষ্ট করার জন্য উহাদের পিছনে পড়িবে না। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে-

اِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً وَ حِمىَ اللّٰهِ مَحَارِمُهٗ *

"প্রত্যেক বাদশাহের জন্য একটা সীমা রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের সীমা হইল তাহার দ্বারা হারামকৃত জিনিসসমূহ। হরম শরীফের সম্মান প্রদর্শনও অনুরূপ। ইহার সীমার ভিতরের কোন জিনিস নষ্ট করিবার পিছনে পড়া যাইবে না। তাই হরম শরীফের ভিতরের কোন জন্তু শিকার করার অনুমতি নাই।

সওয়ারী হইতে হজ্জে গমনকারীর শিক্ষা

সওয়ারী যখন সামনে আসিবে তখন অন্তরে অন্তরে আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি আমাদের সফরের জন্য চতুষ্পদ জন্তু এবং আগুন, পানি, বাতাস প্রভৃতি, যাহা দ্বারা জল-যান চালিত হয়- আমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে আমাদের কষ্ট

না হয় অথবা কষ্ট হালকা হয়। সাথে সাথে ইহাও স্মরণ কর যে, ইহার ন্যায় একদিন আমাদের আখেরাতের সওয়ারীও সামনে উপস্থিত হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ জানাযার খাট প্রস্তুত করা হইবে, যাহার উপর সওয়ার হইয়া আখেরাতের দিকে পাড়ি জমাইতে হইবে।

সারকথা, হজ্জের সফর আখেরাতের সফরের ন্যায়। তাই হজ্জের সফর করার সময় খুব সূক্ষ্মভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে যে, হজ্জের সফর যেন আখেরাতের সফরের পাথেয় হওয়ার যোগ্য হয়। কেননা আখেরাতের সফর খুব দূরে নয়; বরং বান্দার অতি নিকটে অবস্থিত। মৃত্যু সম্পর্কে কাহার জানা আছে? হয়তবা মৃত্যু একবারে সামনে উপস্থিত। উটের উপর সওয়ার হওয়ার পূর্বেই আখেরাতের সফরের জন্য কাষ্ঠ-নির্মিত খাটের উপর সওয়ার হইতে হইবে। আর খাটের উপর সওয়ার হওয়া সন্দেহাতীত ভাবে সত্য। সফরের পাথেয় ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের হইয়া থাকে। কিন্তু সন্দেহযুক্ত সফরের সতর্কতা অবলম্বন করা এবং পাথেয় ও সওয়ারীর সাহায্য গ্রহণ করা আর নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত সফরের ব্যাপারে গাফেল থাকা কিভাবে সুন্দর হইতে পারে?

এহরামের চাদরের পরিচয়ঃ

এহরামের জন্য দুইটি চাদর খরিদ করিবার সময় স্বীয় কাফনের কথা এবং কাফনের কাপড়ে নিজের পেঁচাইয়া যাওয়ার কথা স্মরণ কর। কেননা খানায়ে কাবার নিকটে পৌছার পর এহরামের চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করিবে। হইতে পারে যে, এহরাম অবস্থায় তোমার এই সফর পুরা হওয়ার পূর্বেই কাফনের কাপড়ে পেঁচাইয়া আল্লাহ পাকের সাথে তোমার সাক্ষাৎ নিশ্চিত হইয়া পড়িবে। এহরাম অবস্থায় মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়ার কারণ এই যে, মৃত্যুর পর যে পোশাক পরিধান করিয়া আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহা দুনিয়ার সাধারণ পোশাক হইতে পৃথক হয়। যেমন এহরামের পোশাক। সুতরাং এহরামের কাপড় কাফনের কাপড়ের সদৃশ।

মিকাত ও হজ্জের মধ্যে বিভিন্ন কষ্টের রহস্য

মিকাত পর্যন্ত দুর্গম পথে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিয়া দেখিয়া মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলি

ভয়ানক ও ভীতিপ্রদ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে সেগুলি স্মরণ করিতে থাকিবে। মিকাত পর্যন্ত প্রত্যেকটি অসুবিধা কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, পথে ডাকাতের ভীতি দেখিয়া কবরে মুনকার নকীরের প্রশ্নের ভীতিকে স্মরণ কর। জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার দেখিয়া কবরের সাপ বিচ্ছুর ধ্যান কর। স্বীয় ঘরবাড়ী, আত্মীয় স্বজন থেকে পৃথক হওয়াকে ভিত্তি করিয়া কবরের আতঙ্ক, কষ্ট এবং নির্জনতার কথা চিন্তা কর।

এহরাম বাঁধা ব্যক্তির অপরাধের কারণে কাফফারা অপরিহার্য হওয়ার কারণ

হজ্জের সমস্ত কার্য প্রেম জগতের আদব। আল্লাহ পাকের প্রেমিকরা স্বীয় প্রকৃত প্রেমাষ্পদের ঘরের কাছে এইসব কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে এইসব নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রেমাষ্পদের পছন্দনীয় এইসব আদবের পরিপন্থী কোন কাজ করে তাহার প্রেমসূচক আদব বর্জন করার এবং স্বীয় প্রেমাষ্পদের সামনে অসঙ্গত কাজ করার কারণে তাহার দায়িত্বে কাফফারা প্রদান অপরিহার্য হয়।

সুতরাং এহরাম বাঁধা ব্যক্তি যদি স্বীয় কোন অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহার সদকা প্রদান করা উচিত। যদি পূর্ণ একদিন সেলাই করা কাপড় পরিধান করে অথবা মাথা ঢাকে তাহা হইলে কুরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব হয়। যদি পূর্ণ একদিন অপেক্ষাকম সময় এইসব কাজ করে তাহা হইলে শুধু সদকা করিতে হয়। যদি মাথার এক চতুর্থাংশ বা ইহা অপেক্ষা অধিক মুণ্ডাইয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কম মুণ্ডাইলে সদকা করিতে হয়। নখ কাটানের মধ্যেও অনুরূপ হুকুম।

ইহার বিবরণ এই যে, এই সকল কার্য প্রেমিকের বিনয় ও ভঙ্গ হৃদয়ের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, মাথা মুণ্ডানো, নখ কাটানো প্রভৃতি সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য ধারণের উপাদান এবং মনের স্বাদ মিটান ও নিজের শোভা বর্ধনের পন্থা। আর এইসব কার্য প্রেমমূলক বিনয়ের পরিপন্থী এবং এহরাম অবস্থায় প্রেমাষ্পদের

দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। সুতরাং এইসব চাহিদা পরিপন্থী কার্যের ক্ষতিপূরণ হিসাবে কাফফারা নির্ধারণ করা হইয়াছে।

কবি খুব সুন্দর বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইঃ

"১। সাজসজ্জার সৌন্দর্য বর্জন করা আরও সুন্দর করিয়া তোলে প্রেমের সংশোধন নিজেই আর প্রেম।

২। যে ব্যক্তি নিজকে বর্জন করিবে সে খোদাকে পাইয়া যাইবে। বেসাল প্রেমাস্পদের সাথে মিলন কি জিনিস? ইহা হইল নিজকে নফস হইতে পৃথক করা।

৩। কিন্তু নিজকে নিজে বর্জন করা কি এত সহজ? মরিয়া যাওয়া আর নিজ থেকে পৃথক হওয়া একই রকম।

৪। সে উচ্চ মর্যাদাবান সত্তা সীমাহীন উচ্চ। তাহার মিলনের জন্য বাহ্যিক আড়ম্বর ছুঁড়িয়া মারিতে হয়।"

সাজসজ্জা, জাকজমক এবং সম্মান সম্ভ্রমের উপকরণ প্রেম, প্রণয় ও এশকের পরিপন্থী। ইহা এক প্রকার বানোয়াটি। সুতরাং হজ্জের এহরামের অবস্থায় অর্থাৎ প্রেমাস্পদের গলিতে ঘুরাফিরার সময় এই গুলি বর্জন করা উচিত, বরং সত্যিকার প্রেমিক ও খালেছ আশেকের উচিত, সে যেন এমন সব কার্য করে আর এমন পন্থা অবলম্বন করে যাহা প্রেমাস্পদের গলিতে পৌছার সময় প্রেমাস্পদের মহব্বত, প্রেম ও অনুগ্রহের দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়।

এহরাম অবস্থায় স্ত্রী–সহবাস করার দ্বারা হজ্জ নষ্ট হওয়ার কারণ

আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক কাজগুলির মধ্যে সহবাসের স্থান সর্বোচ্চে। ইহা অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি ও আনন্দদায়ক আর কোন কাজ নাই। পক্ষান্তরে হজ্জ এমন একটি ইবাদত যাহাতে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক সমস্ত কাজগুলি বর্জন করিতে হয় কেননা সমস্ত আমল ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। হজ্জের মধ্যে প্রেমমূলক পদ্ধতি ও ভূষণ অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে পরিষ্কার বুঝায় যে, হজ্জ পালনকারী চিরস্থায়ী প্রেমপাত্র এবং সত্যিকার [illegible] ব্যতীত অন্য সমস্ত তৃপ্তিকর ও আনন্দদায়ক বিষয় বর্জন করিয়াছে। সুতরাং হজ্জ পালনকারী

নিজের মধ্যে উল্লিখিত অবস্থার দাবী করার পরও যদি হজ্জের এহরাম অবস্থায় সহবাসের ন্যায় সর্বাধিক তৃপ্তিকর ও আনন্দদায়ক কার্যটি করিয়া থাকে তাহা হইলে সে স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী। তাই তাহার হজ্জ নষ্ট হইয়া যায়। কেননা সে নির্ভেজাল প্রেমিকের কাতারে শামিল নহে; বরং সে খেয়ানতকারী।

কবি বলেন–

هرکه بیبا کي کند در راه دوست + رهزن مردان شد ونامرداوست

"যে ব্যক্তি মাহবুবের রাস্তায় বেয়াদবী করে, সে প্রেমের রাস্তায় পথিকের জন্য ডাকাত আর নিজে এই রাস্তায় বঞ্চিত থাকে।"

এখানে বিধান হইল এই যে, কতক হালাল কাজ এবং কোন কোন ইবাদত করা হারাম হইয়া যায়। কেননা এইসব কার্য নিজে নিজে হালাল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ইবাদত নষ্ট করিয়া দেয় অথবা ইবাদতে ত্রুটির সৃষ্টি করে। যেমন কথা বলা, পানাহার করা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু নামাযের মধ্যে এইগুলি হারাম। অনুরূপ স্ত্রী–সহবাস করা, পানাহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু রোযার দিনে এইসব কার্য হারাম। কেননা এইসব কার্য উল্লিখিত ইবাদতসমূহ নষ্ট করিয়া দেয়। অনুরূপভাবে হজ্জের জন্য কতগুলি নিষিদ্ধ কার্য রহিয়াছে যাহা দ্বারা হজ্জ নষ্ট হইয়া যায়। এইসব কার্যের দ্বারা হজ্জ নষ্ট হওয়ার কারণ হইল, এইসব কার্যের অস্তিত্ব হইয়াছে হজ্জের আমলের পরিপন্থী হইয়া। যদি এইসব কার্য হজ্জের মধ্যে করা জায়েয হইত, তাহা হইলে হজ্জ একটি তামাসার আড্ডায় পরিণত হইত।

চিল, কাক, বিচ্ছু, সাপ, ইঁদুর, বাঘ এবং পাগলা কুকুর হরম শরীফের অভ্যন্তরে হত্যা করা জায়েয হওয়ার কারণ

এই সকল প্রাণী কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর। খোদা প্রেমিকদের কষ্ট দেয়। মাহবুবের গলির প্রবেশ পথের প্রতিবন্ধক। যেহেতু ইহারা আল্লাহ–প্রেমিকদের আল্লাহর গলিতে প্রবেশ করিতে পতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় তাই মাহবুবে হাকিকী আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে ইহারা ঘৃণিত ও অভিশপ্ত। তাই ইহাদের এই কাজটি তাঁহার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। সুতরাং যে বিষয়টি প্রকৃত মাহবুবের দৃষ্টিতে

ঘৃণিত ও অভিশপ্ত তাহা নিঃসন্দেহে প্রেমিকের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত ও ঘৃণিত। এই জন্যই যদি ইহাদিগকে হরম শরীফের অভ্যন্তরেও মারিয়া ফেলে তাহা হইলে ইহাদের বিনিময়ে কোন খেসারত বা জরিমানা দেওয়া অপরিহার্য নয়; বরং ইহা সওয়াবের কাজ, মাহবুবের সন্তুষ্টির মোতাবেক বলিয়া গণ্য হয়।

হজ্জের এহরামে থাকা অবস্থায় গালিগালাজ, ঝগড়া–বিবাদ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

হজ্জ পালনকারীরা অভিসারের আশায় প্রেমাস্পদের গলিতে বার বার আগমনকারী প্রেমিকের সাথে তুলনীয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদা প্রেমিকদের গালিগালাজ করে বা তাহাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করে– সে তো আল্লাহ পাকের কাছে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত বলিয়া সাব্যস্ত। অনুরূপ এক হজ্জ পালনকারী যদি অন্য এক হজ্জ পালনকারীর সাথে ঝগড়া–বিবাদ করে বা তাহাকে গালিগালাজ করে তাহা হইলে সে খোদা প্রেমিকের তালিকা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। কেননা ঝগড়া–বিবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মর্যাদা, ইয্যত–সম্মান, আরাম–আয়েশের চাহিদা এবং দেহ–পালন প্রভৃতি কারণে হইয়া থাকে। সুতরাং এই ধরনের ব্যক্তি দুই কারণে খোদা প্রেমিকের তালিকার বহির্ভূত হইয়া পড়ে। একঃ সে খোদা–প্রেমিকদের কষ্ট দিয়াছে। দুইঃ সে স্বীয় ইযযত–সম্মান, আরাম–আয়েশের পিছনে পড়িয়াছে। আর মাহবুবে হাকিকী হইতে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই অনেক মানুষ হজ্জ পালন করিতে তথা পর্যন্ত যায়। কিন্তু সেখানে গিয়া এমন কোন কার্য করিয়া বসে যাহার কারণে শক্ত অন্তর হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। কারণ সে প্রেমাস্পদের গলিতে গিয়া প্রেমের শর্ত নষ্ট করিয়াছে। ফলে তাহার দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। কেননা সে এমন কোন নিষিদ্ধ কার্য করিয়া বসিয়াছে যাহা চিরস্থায়ী প্রেমাস্পদের দৃষ্টিতে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত। আর এইসব নিষিদ্ধ বিষয়গুলি প্রথমেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে কেহ অজ্ঞতাবশতঃ আকস্মাৎ এমন কোন কার্য করিয়া ঘৃণিত ও বিতাড়িত সাব্যস্ত না হইয়া পড়ে। আল্লাহ পাক বলিতেছেনঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا جِدَالَ فِيْ الْحَجِّ *

"হজ্জের মাসসমূহ জ্ঞাত এবং প্রসিদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই মাসসমূহে নিজের উপর হজ্জ ফরয করিয়া লইয়াছে তাহার উচিত সে যেন হজ্জের মধ্যে সহবাস ও সহবাসের দিকে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কার্য না করে এবং কাহাকেও গালি না দেয় আর কাহারও সাথে ঝগড়া না করে।"

হজ্জের বরকত

হজ্জের বরকতসমূহের মধ্যে একটি হইল হজ্জের শিক্ষা। হজ্জের বিভিন্ন রোকন পালন করার ফলে এই শিক্ষা অর্জিত হয় যে, ইহাতে আমলের মাধ্যমে আড়ম্বরহীনতা অবলম্বন, বানোয়াটি ও কৃত্রিমতা বর্জন, অহংকার ও গর্ব পরিত্যাগ প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার বিবরণ হইল এই যে, হজ্জের সবগুলি অপরিহার্য আমল অহংকার ও আমিত্বের বড় শত্রু। ইহাতে দীর্ঘ পথের সফর করিতে হয়, আত্মীয় স্বজন বন্ধু–বান্ধব ছাড়িতে হয়। প্রভৃত্তির সেবা, অলসতার মূলোৎপাটন হয়। সবচেয়ে বড় কথা হইল যে, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আল্লাহ পাকের কাছে মানুষের এক প্রতিশ্রুতি [১] চলিয়া আসিতেছে, হজ্জের মাধ্যমে তাহা পুরা করা সম্ভব হইতেছে। এইভাবে হজ্জ পালন করার মধ্যে ওয়াদা পুরনেরও শিক্ষা হইতেছে।

১। হযরত আদম (আঃ)–এর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাহার পৃষ্ঠ হইতে পিপিলিকার ন্যায় সমস্ত রূহ বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তখন আল্লাহ পাক তাহাদের থেকে এই কথার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন– আমি তোমাদের প্রতিপালক কিনা? তাহারা সকলে বলিয়াছিল– নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক। এখানে প্রতিশ্রুতি বলিয়া ইহাকে বুঝানো হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় / বিবাহ-শাদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিবাহের উদ্দেশ্য

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের ২১ পারায় বলিয়াছেনঃ

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً

"আল্লাহ পাক তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য জুড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা ইহাদের কাছে আরাম পাইতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও অনুগ্রহ রাখিয়া দিয়াছেন।" অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন-

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ *

"তোমাদের নারীগণ তোমাদের সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র।"

১। পুরুষের আরাম আয়েশ ও শান্তির জন্য নারীদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাদের সংশ্রবে পুরুষের দুঃখবেদনা দূরীভূত হয়। তাহারা পুরুষের হাজারো চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আরামের মাধ্যম। প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসা মানুষের মধ্যে একটি জন্মগত স্বভাব। প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার ক্ষেত্র হিসাবে স্ত্রী একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। নারীর দেহ জন্মগতভাবে দুর্বল ও সহজ ভঙ্গুর। তাহারা সন্তান জন্ম দেওয়ার এবং ঘরের কাজের ব্যবস্থা পনার দায়িত্বশীলা। পুরুষের জন্য সুদৃঢ় বাহু। সুতরাং তাহাদের সাথে অনুগ্রহের আচরণ কর। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন অনুগ্রহ লাভের জন্য। তাহাদের অসতর্কতামূলক আচরণ এবং জনগত দুর্বলতা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ।

২। মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে কামভাব রহিয়াছে। আর ইহা পুরা করার জন্য নারীদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন- নারী ক্ষেত্র স্বরূপ। ইহা বীজ বপনের যোগ্য। যেমন ক্ষেত্রে চাষ করা হয়। ক্ষেত্র চাষে বিশেষ বিশেষ

উদ্দেশ্য থাকে। অনুরূপভাবে নারীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এইসব উদ্দেশ্য হইতে ফায়দা অর্জন করা উচিত।

৩। নারী ইযযত-সম্মান ও মাল-আওলাদের রক্ষিকা এবং ব্যবস্থাপক।

৪। অধিকন্তু কুরআনে পাকের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, চারিত্রিক পবিত্রতা, পরহেযগারী, দেহের সুস্থতা এবং বংশধারার হেফাজতের জন্য বিবাহ-প্রথা চালু করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন-

وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ *

"যাহারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না (যাহা পরহেযগারীর মূল মাধ্যম) তাহাদের উচিত (অন্যভাবে হইলেও যেন) পবিত্রতা অনুসন্ধান করে। আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তাহাদিগকে মুখাপেক্ষীহীন করিয়া দেওয়া পর্যন্ত।"

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি বিবাহ করিবার সামর্থ্য রাখে না তাহার পরহেযগার থাকার পদ্ধতি হইল সে যেন রোযা রাখে।" তিনি আর বলিয়াছেন, "হে নওজোয়ানের জমাত! তোমাদের মধ্যে যে কেহ বিবাহ করিবার সামর্থ্য রাখ- তাহার উচিত সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে খুব নীচ করিয়া রাখে আর লজ্জাস্থানকে যিনা ইত্যাদি থেকে হেফাজত করে। অন্যথায় রোযা রাখ; ইহা কামভাবকে হ্রাস করিয়া রাখে।

ইহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, নারীদের প্রতি পুরুষদের অন্তরে কামভাবের যে আকর্ষণ আর পুরুষদের প্রতি নারীদের অন্তরে কামভাবের যে আকর্ষণ রহিয়াছে- তাহা মানুষের জন্মগত চাহিদা। বিবাহের মাধ্যমে এই কামভাবটুকু পূর্ণ করিলে মানুষের অন্তরে সত্যিকার ভালবাসা ও পবিত্র ধারণা জন্মলাভ করে। কিন্তু অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে ইহা পুরা করার দ্বারা মানুষ অপবিত্রতার দিকে চলিয়া যায়। আর তাহার অন্তরে কুচিন্তার সৃষ্টি হয়। সুতরাং মানুষ পবিত্রতার দিকে লইয়া যাওয়ার আর অপবিত্রতা হইতে দূরে রাখার এক মাধ্যম। আর ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, জন্মগতভাবে পুরুষ এবং নারীর অন্তরে কামভাবের যে আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে উহাকে অপবিত্র বলা মারাত্মক ভুল। কেননা মানুষের স্বভাবে এইভাবটুকুর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ

পাক। তিনি হেকমত ও যুক্তির মাধ্যমে কোন না কোন উদ্দেশ্যে ইহা মানুষের ভিতর রাখিয়াছেন। তবে অবৈধ উপায়ে ইহা ব্যবহার করা অর্থাৎ নাজায়েয পন্থায় ইহা পুরা করা নিঃসন্দেহে মানুষকে অপবিত্রতা ও বদ কাযের দিকে লইয়া চলে।

সারকথা, রিবাহ প্রথা চালু করার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য তাহাই যাহা আল্লাহ পাক কুরআনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পরহেযগারী অর্জন করার উদ্দেশ্যে বিবাহ কর এবং নেককার সন্তান চাহিবার জন্য দোয়া কর। যেমন কুরআন পকে ইরশাদ করিয়াছেনঃ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ "তোমাদের বিবাহ যেন এই নিয়তে হয় যে তোমরা তাকওয়া ও খোদাভীতির দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া যাও। এমন যেন না হয় যে, পশুপক্ষীর ন্যায় শুধু বীর্য নির্গত করা তোমাদের উদ্দেশ্য হয়।" অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন, وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ "স্ত্রী-সহবাসের দ্বারা সন্তান লাভের আশা কর, যাহা আল্লাহ পাক (তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন।"

অধিকন্তু বিবাহ করার দ্বারা মানুষ নিয়মিত কার্যের অভ্যাসী হইয়া পড়ে। পুরাপুরি প্রস্তুতির সাথে উপার্জনের ফিকির করিতে থাকে। অনর্থক কাজ করিতে ভয় পায়। তাহার মধ্যে লজ্জা-শরম, ভালবাসা ও আনুগত্য পাওয়া যায়। সে খুব মিতব্যয়িতার সাথে জীবন কাটাইতে থাকে। অগণিত রোগ হইতে পরিত্রাণ পায়। বিবাহ স্বাস্থের জন্য উপকারী, মনের স্থিরতা প্রদানকারী, প্রশান্তিদায়ক, আনন্দ উৎপাদক, ইহকাল ও পরকালীন জীবনের উন্নতির উপায়।

চারিত্রিক সংশোধনী এবং ধর্মীয় দৃষ্টি কোণ হইতে ইহা সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহা নির্ভেজাল ফায়দা দ্বারা ভরপুর। তাহযীব তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা উত্তম কোন কাজ নাই। স্বদেশ-প্রেমের ইহাই শিকড়। জাতি ও দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেবা। রোগ হইতে বাঁচানের এবং হাজারো রোগশোক হইতে হেফাজতে রাখার ইহা একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনা। যদি এই খোদায়ী কানুন বনী আদমের মধ্যে চালু না হইত- তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া আজ শসনে পরিণত হইত। কোন বাগান, কোন ঘরবাড়ী, কোন জাতির চিহ্ন পর্যন্ত থাকিত না।

একাধিক বিবাহ করার রহস্য

১। একাধিক বিবাহ করার যেসব কারণ রহিয়াছে তন্মধ্যে প্রধান কারণ হইল- তাকওয়ার হেফাজত করা অর্থাৎ পরহেযগার মুত্তাকী থাকা গোনাহ থেকে দূরে থাকা। তাকওয়া এমন একটি প্রিয় গুণ যে সকল মানুষ ইহার আকাঙ্ক্ষী হওয়া আর ইহাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কতক মানুষ জন্মগতভাবে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিক কামসক্ত থাকে। এই ধরনের মানুষের জন্য এক স্ত্রী যথেষ্ট নয়। যদি তাহাকে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ বিবাহ হইতে বিরত রাখা হয় তাহা হইলে ইহার ফল দাঁড়াইবে যে, সে তাকওয়া ছাড়িয়া বদ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

যিনা এমন একটি বদ কার্য যাহা মানুষের অন্তর হইতে পবিত্রতার ধারণাকে মুছিয়া ফেলে। ইহাতে মারাত্মক বিষের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য যাহাদের মধ্যে কামভাবের প্রাবল্য রহিয়াছে, তাহাদের জন্য এমন চিকিৎসা হওয়া চাই যে, তাহারা যেন যিনার ন্যায় মারাত্মক বদ কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অবশ্য প্রবল কামাসক্ত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রীর প্রয়োজন কিনা ইহার জবাব তো দুপুরের সূর্য হইতেও পরিষ্কার।

২। স্ত্রী সর্বদা সহবাসের যোগ্যতা রাখে না। কেননা প্রতেক মাসে নারীদের জন্য অপরিহার্যভাবে এমন কয়েকটি দিন আসে (অর্থাৎ ঋতুকাল) যেসব দিনে স্বামী স্ত্রী হইতে দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরী। অধিকন্তু নারীদের গর্ভ ধারণের দিনগুলিও অনুরূপ। বিশেষ করিয়া সন্তান প্রসবকালের পূর্ববর্তী কয়েকটি মাস স্ত্রীর গর্ভে অবস্থিত সন্তানের সুস্থতার জন্য স্বামী স্ত্রী হইতে দূরে থাকা জরুরী। এই অবস্থা কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান প্রসব হয়। প্রসবের পর এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকা অপরিহার্য দায়িত্ব। উল্লিখিত সময়গুলি তো নারীদের জন্য কুদরতী প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু পুরুষদের জন্য তো কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। সুতরাং যদি এই সময়ের মধ্যে পুরুষদের কামশক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে তখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ব্যতীত আর কি চিকিৎসা হইতে পারে?

অবশ্য আমরা স্বীকার করি অনেক পুরুষ এমনও রহিয়াছে যাহারা এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা ব্যতীতও স্বীয় তাকওয়া ও পবিত্রতা বহাল

রাখিতে পারে। কিন্তু সাথে সাথে ইহাও বলিতে চাই এবং ইহা কোন বিবেকবানও অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, দুনিয়াতে অনেক মানুষ রহিয়াছে যাহাদের কামভাব প্রবল। আর ইহা প্রবল হওয়া কোন দোষের কথা নয়। যদি এই সময়গুলিতে বা এই ধরনের অন্য কোন অবস্থাতে কামভাবের উতেজনা থাকাকালে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না দেওয়া হয়– তাহা হইলে তাহার কামভাব পুরা করার জন্য সে নিশ্চয়ই কোন অবৈধ পন্থা বাছিয়া লইতে বাধ্য হইবে।

৩। উষ্ণ আবহাওয়ার বিশিষ্ট দেশগুলিতে নারীরা সাধারণতঃ আট, নয় বা দশ বৎসর বয়সে বিবাহ যোগ্য হইয়া পড়ে। এইসব দেশে নারীদের বিবাহের সময় তাহাদের সাধারণ বয়সের তুলনায় অনেক কম। যেন শিশুকালেই তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়া হইতেছে। বিশ বৎসর বয়সে তাহারা প্রায় বুড়ীর ন্যায় হইয়া যায়। এই জন্য এইসব দেশের নারীর মধ্যে বিবেক এবং সৌন্দর্য উভয় গুণ একত্রিত হয় না। নারীর সৌন্দর্য দ্বারাই নারী পুরুষের উপর রাজত্ব করে। আর এই সময় তাহাদের মধ্যে বিবেক এবং অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় না বলিয়া তাহাদের রাজত্বের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আর বিশ–পঁচিশ বৎসর বয়স্কা হওয়ার পর যখন বিবেক ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তখন সৌন্দর্য মওজুদ থাকে না, তাই নারী অপরিহার্যভাবে পুরুষের কাছে দুর্বল হইয়া থাকে। কেননা বিবেক ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়ার সময় রাজত্ব করিবার জন্য যে গুণের প্রয়োজন তাহা বহাল থাকে না। কারণ রাজত্ব করার গুণ হইল যৌবন আর সৌন্দর্য।

সারকথা, এইসব দেশের নারীরা স্বীয় অবস্থার ভাষায় নিজেরা একা একা স্বামীর জন্য যথেষ্ট না হওয়ার কথা স্বীকার করিতেছে। কেননা জন্মগতভাবে পুরুষের এই দুই গুণের প্রয়োজন রহিয়াছে। আর নারীরা দুই গুণ বিশিষ্টা নয়। তাই পুরুষের প্রয়োজন পুরা হয় না। এই জন্য পুরুষের প্রয়োজন হয় দুই নারীর, যাহাতে দুই নারী পুরুষের দুই গুণের চাহিদাকে মিটাইতে পারে। নারীদ্বয় এমন হওয়া চাই যাহাদের একজন সৌন্দর্য ধারিণী হয় আর অপরজন অভিজ্ঞতাসম্পন্না হয়, যাহাতে পুরুষ উভয় গুণ হইতে ফায়দা হাসিল করিতে পারে। এক স্ত্রী তাহার মন খুশী করে আর অপর স্ত্রী তাহার সেবা করে। এই

জন্য এইসব দেশে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার প্রথা প্রাকৃতিক ফয়সালা।

৪। প্রত্যেক দেশেই বৃদ্ধ অবস্থায় পুরুষের তুলনায় নারীর শক্তি অধিক তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। ফলে নারী দুর্বল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে পুরুষের শক্তি সম্পূর্ণ অটুট থাকে। অবশ্য ইহা সর্বক্ষেত্রে নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ হয়। স্ত্রী বুড়ী হইয়া যাওয়ার পর কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে বিবাহের এমন চাহিদা দেখা দেয় যে পূর্বে প্রথম বিবাহ করার সময় যেমন চাহিদা দেখা দিয়াছিল। তাই চাহিদা পূরণের জন্য পুনরায় বিবাহ করা তাহার জন্য অপরিহার্য।

যাহারা আইন করিয়া একাধিক বিবাহের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহারা ঐ সকল পুরুষকে বৃদ্ধ অবস্থায়ও যাহাদের শক্তি অক্ষত থাকে তাহাদিগকে যিনার মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য পথ নির্দেশ করে। এই ধরনের আইন সাধারণ মানুষের অবস্থার মোতাবেক কি করিয়া হইতে পারে? বরং ইহা দেশ ও জাতির জন্য ধ্বংসাত্মক এবং পরিবেশ দুষিত কারক।

৫। একাধিক বিবাহের যেসব প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইল পুরুষের প্রয়োজন। কিন্তু কখনও কখনও নারীদের মধ্যেও এমন সব অসুবিধা দেখা দেয়; যদি তাহাদের জন্য পূর্বে বিবাহিত পুরুষের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধা হওয়ার রাস্তা খোলা না থাকে তাহা হইলে তাহারা অবৈধ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। একটা বিষয়ের উপরই চিন্তা করিয়া দেখ যে, প্রতি বৎসর দুনিয়ার কোন না কোন অংশে যুদ্ধ বিগ্রহে কত লক্ষ লক্ষ পুরুষের জীবন নষ্ট হইতেছে। অথচ নারীরা সম্পূর্ণরূপে ইহা হইতে নিরাপদ। এইভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে সর্বকালেই পুরুষের জীবন নষ্ট হইয়া আসিতেছে। যত দিন পর্যন্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিভিন্ন জাতির লোক বসবাস করিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনা ঘটিতে থাকিবে। সর্বদাই পুরুষের সংখ্যায় ঘাটতি আর নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন জাতিতেই সর্বদার জন্য নারীদের সংখ্যা কখনও কম থাকে নাই। তাহা হইলেও আমরা ইহা তো অস্বীকার করিতে পারি না যে, সর্বদা আধিক্য না থাকিলেও এক সময় তো অবশ্যই নারীর আধিক্য ও পুরুষের ঘাটতি অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। তখন ঐ

সকল নারী সম্পর্কে কি চিন্তা করা যাইবে, যাহাদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার উপরে রহিয়াছে? একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার অবস্থায় তাহাদের কি অবস্থা হইবে? যদি কোন নারীর অন্তরে পুরুষের প্রতি কামাসক্তি পয়দা হয় আর ইহা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম; তাহা হইলে এই নারী স্বামী না পাওয়ার কারণে নিশ্চিয়ই অবৈধ পন্থায় নিজের চাহিদা পুরা করিবে– এই ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহে বাধা সৃষ্টিকারীরা কি জবাব দিবে? নিঃসন্দেহে এই অবৈধ পন্থা মানিয়া লওয়া ব্যতীত তাহাদের কাছে কোন জবাব নাই।

খুব চিন্তা করিয়া দেখ; একাধিক বিবাহের রাস্তা বন্ধকারীরা ঐ সকল লক্ষ লক্ষ নারী সম্পর্কে উল্লিখিত অবৈধ পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ নির্দেশ করিতে পারিবে না, যাহারা যুদ্ধের কারণে বিধবা হইয়াছে এবং বিবাহের জন্য পুরুষ না পাওয়ার কারণে খালি রহিয়াছে; একাধিক বিবাহের পথে প্রতি বন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের জন্য বড় পরিতাপ যে তাহারা একটি ভুল বিধানের সহযোগিতা করিতে গিয়া মানুষের মানবিক প্রয়োজনের প্রতি সামান্য খেয়ালও করিল না। তাহারা একটু চিন্তা করিয়াও দেখিল না যে, একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান ব্যতীত তাহাদের এই প্রয়োজন পুরা করার অন্য কোন বৈধ রাস্তা নাই।

৬। গত আদম শুমারীতে কোন কোন হিসাব পরিদর্শক শুধু পশ্চিম বঙ্গের নারী পুরুষের সংখ্যার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। সে আদম শুমারী হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। আর এই ফলাফল একাধিক বিবাহ বৈধ হওয়ার সরাসরি ও স্পষ্ট দলীল। আমাদের প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে যাহাদের সন্দেহ হয় তাহারা যেন ভারতের সরকারী পত্রিকায় জনসংখ্যা গণনার কলামে পুরুষ ও নারীদের সংখ্যা দেখিয়া লয়। তাহা হইলে নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

সাথে সাথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার প্রতি সামান্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেরাই একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হইতে নিজেদেরকে মুক্ত বলিয়া মনে করে। অথচ এইসব দেশেও নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। উদাহরণ স্বরূপ, বোয়ায়েরের যুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ দ্বীপ পুঞ্জে বার লক্ষ ছয় হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ (১২৬৯৩৫) জন নারী এমন ছিল যে, এক পুরুষের জন্য এক নারীর বিধান

মোতাবেক বন্টনে কোন পুরুষ তাহাদের ছিল না। উনিশশত খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের আদম শুমারীতে নারীদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা চার লক্ষ তিন হাজার সাতশত নয়জন বেশী ছিল। একই সনে জার্মানের আদম শুমারীতে প্রতি হাজার পুরুষের জন্য এক হাজার বত্রিশ জন নারী ছিল। সমগ্র দেশে আট লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত আট চল্লিশ জন নারী এমন ছিল যাহাদিগকে বিবাহ করার জন্য কোন পুরুষ মওজুদ ছিল না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের লোক গণনায় এক লক্ষ বাইশ হাজার আট শত সত্তর জন নারী, ১৮৯০ খৃষ্টব্দে স্পেনের জনসংখ্যা গণনায় চার লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত বাষট্টি জন নারী আর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়াতে ছয় লক্ষ চুয়ালিশ হাজার সাতশত ছিয়ান্নব্বই জন নারী পুরুষ অপেক্ষা বেশী ছিল।

এখন আমাদের প্রশ্ন হইল যে, একাধিক বিবাহকে ভাল মনে না করার উপর গর্ব করা তো সহজ কিন্তু তাহাদের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া অপরিহার্য যে, তাহারা কমপক্ষে চল্লিশ লক্ষ নারীর এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি বিধান চালু করিয়াছে? কেননা 'এক পুরুষের জন্য এক নারী' এই বিধানের ভিত্তিতে তাহাদের জন্য ইউরোপে কোন পুরুষ মিলিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের পুরুষ বিহীন থাকা ছাড়া আর উপায় কি? তাহাদের জারীকৃত এই বিধানের উপরও আমাদের আপত্তি রহিয়াছে যে, মানুষের প্রয়োজনে যে বিধান প্রণয়ন করা হয়– তাহা মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক হওয়া চাই– না, প্রয়োজন মোতাবেক না হওয়া চাই। আর তাহাদের এই বিধান নিঃসন্দেহে প্রয়োজন মোতাবেক নয়। যেন একাধিক বিবাহের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কানুন এই চল্লিশ লক্ষ নারীকে বলিতেছে যে, তাহারা যেন মানবিক স্বভাবজাত ধর্মের পরিপন্থী চলে। তাহাদের অন্তরে যেন কখনও পুরুষের প্রতি কামভাবের জন্ম না নেয়। কিন্তু ইহা তো সম্ভব নয়। ইহার সাক্ষী অভিজ্ঞতা।

এই আলোচনার ফলাফল দাঁড়াইল যে, বৈধ পন্থা হইতে ফিরিয়া থাকার কারণে তাহাদের অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ফলে তাহাদের মধ্যে যিনার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। আর ইহা একাধিক বিবাহের বিরোধিতার ফল। অধিকন্তু তাহাদের এই নীতির ফলে যিনার প্রসার অধিক হইবে। আর অভিমত শুধু ধারণা মূলক নয়; বরং বাস্তব। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রতি বৎসর

হাজার হাজার জারজ সন্তান দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করার বিষয়টি প্রমাণিত।

৭। বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এই যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথী হিসাবে থাকিবে। যদি তাহাদের মধ্যে এমন কোন কারণ পয়দা হয় যাহার ফলে নারী পুরুষের সাথী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, অথবা যদি নারীর মধ্যে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহার কারণে স্বামী স্ত্রী হইতে এমন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সাথী থেকে যে তৃপ্তি ও আনন্দ পাইয়া থাকে। এমতাবস্থায় পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি হওয়া চাই।

উদাহরণস্বরূপ, যদি স্ত্রীর মধ্যে এমন কোন রোগের সৃষ্টি হয় যাহা স্ত্রীকে সর্বদার জন্য অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া ফেলে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর সাথে যে সম্পর্ক রাখে স্ত্রী ঐসব সম্পর্কের যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে- তাহা হইলে দ্বিতীয় বিবাহের মাধ্যমে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরা করিবার পথে স্বামীর কোন বাধা থাকার কারণ নাই।

মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিধি অনেক প্রশস্ত। অনুরূপভাবে তাহার জীবনের প্রয়োজনের পরিধিও অনেক প্রশস্ত। আর তাহার প্রয়োজনই কোন কোন সময় পুরুষকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য বাধ্য করিয়া ফেলে। আমরা স্বীকার করি যে, অনেক সময় মানুষের মধ্যে এমন প্রয়োজন সৃষ্টিই হয় না। কিন্তু যখন বাস্তবিক পক্ষেই প্রয়োজন সৃষ্টি হয়, তখন তো অবশ্যই দ্বিতীয় বিবাহ জরুরী হইয়া পড়ে। আর মানুষের বিভিন্ন তবকাতে কমবেশী এই প্রয়োজন পয়দা হইয়াই থাকে। সুতরাং একাধিক বিবাহ ব্যতীত এই প্রয়োজন পুরা করিবার আর কোন পথ নাই। কথিত আছে যে, চিকিৎসা না করার অর্থ রোগ বৃদ্ধি করা। অনুরূপভাবে একাধিক বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালাক প্রদান হ্রাস হওয়ার কারণ হয়।

৮। জন্মগতভাবে নারীর মধ্যে এমন কতক উপকরণ রহিয়াছে যাহার প্রভাবে পুরুষ তাহার প্রতি আকর্ষিত হয়। আর নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে প্রেম ও আকর্ষণের মাধ্যম এইসব উপকরণ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত জরুরী। নারীর মধ্যে যখন এইসব উপকরণ বিদ্যমান থাকে তখনই বিবাহ বরকতময় ও কল্যাণ কর হইতে পারে। যদি নারীর মধ্যে এইসব উপকরণ বিদ্যমান না থাকে অথবা কোন না কোনভাবে এইসব উপকরণ হ্রাস পাইতে থাকে তখন নারীর

সাথে পুরুষের বরকতময় ও কল্যাণকর সুস্বাদু বিবাহের সম্পর্ক বহাল থাকিতে পারে না। এমতাবস্থায় যদি স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি না দেওয়া হয় তাহা হইলে সে এই স্ত্রী থেকে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিবে। আর যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্য নারীর সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িবে আর না জায়েয সম্পর্ক কায়েম করিয়া লইবে। কেননা স্ত্রীর সাহচর্য যখন তাহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই। অথচ স্ত্রীর সাহচর্যের তৃপ্তি মানুষের জন্মগত স্বভাব। তখন সে বাধ্য হইয়া তৃপ্তি অর্জনের জন্য অন্য কোন রাস্তা তালাশ করিতে থাকিবে। স্বামীর এই অবস্থার একমাত্র চিকিৎসা হইল তাহাকে একাধিক বিবাহের সুযোগ প্রদান করা। ইহার মাধ্যমেই একটি পরিবার সুখী হইতে পারে।

৯। একাধিক বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করার ফলে কখনও কখনও বিবাহের তৃতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানবের বংশ বিস্তার অর্জিত হয় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যদি কোন নারী বান্ধা হয়। আর তাহার বন্ধত্ব এমন হয় যে কোন প্রকার চিকিৎসার পরও ইহার সমাধান হয় না। আর এই দিক দিয়া দ্বিতীয় বিবাহেরও অনুমতি নাই- এই অবস্থায় এই ব্যক্তির বংশ বিস্তারের কোন পথ খোলা নাই। বরং এখানে তাহার বংশ বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। আর এই ধরনের রোগ অনেক নারীর মধ্যেই পাওয়া যায়। একাধিক বিবাহের প্রচলন ব্যতীত এই ক্ষতিপূরণের কোন পন্থা খোলা নাই। যদি বলে যে, এই অবস্থায় প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলেই সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তাহা ইনসাফসঙ্গত নয়। কেননা এই অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। অধিকন্তু অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন ভালবাসার সৃষ্টি হয় যে, একে অপর থেকে পৃথক হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং এই অবস্থায় বংশ বিস্তারের একমাত্র উপায় হইল তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করা।

উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীতও একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে আরও অনেক কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইসব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। একাধিক বিবাহ প্রচলনের আসল কারণ হইল- বদকার্য থেকে বাঁচিয়া থাকা, যাহারা এই বিতর্কে একাধিক বিবাহ প্রচলনের বিরোধী

তাহারা যেন ভিতরগত কর্ম ও প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দেয়, যাহারা মুখে মুখে পবিত্র একাধিক বিবাহের প্রচলন অস্বীকার করে তাহারা কার্যতঃ অপবিত্র একাধিক বিবাহ অর্থাৎ যিনার কার্যে গ্রেপ্তার হইয়া আছে। তাহাদের কুপ্রবৃত্তির নাপাক চাহিদা এবং হস্তের অপবিত্র প্রসারণ মাত্র এক নারী লইয়া সন্তুষ্ট নয়। তাহাদের এই আচরণ প্রমাণ করিয়াছে যে, মানব স্বভাবে একাধিক স্ত্রীর এবং বিভিন্ন গুণের স্ত্রীর আকাঙক্ষা অবশ্যই রহিয়াছে।

আল্লাহ পাকের কানুনের চাহিদা এমন হওয়া চাই যে, তাহা মানুষের প্রশস্ত আকাঙক্ষা এবং আভ্যন্তরিণ চাহিদাসমূহ অবগত হইয়া এমন এক পন্থায় কায়েম হইবে যে, ইহা বিভিন্ন প্রবণতা বিশিষ্ট স্বভাবকেও তাকওয়া ও পবিত্রতার বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ মাত্র চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ

পুরুষের জন্য বিবাহিত নারী চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার, নিয়ামত পূর্ণ করার এবং পরিণাম দর্শীতার ভিত্তিতে হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা লিখিয়াছি যে, নারীর তুলনায় পুরুষের শক্তি সামর্থ্য অনেক বেশী। এই জন্যই একজন পুরুষ একই সময়ে কয়েকজন নারীকে বিবাহাধীনে রাখিতে পারে। অধিক বিবাহ প্রচল করার কারণ বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য তালাশ করিলে পাওয়া যায়। বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি কি, আমরা ইতিপূর্বে তাহা আলোচনা করিয়াছি। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম কাতারের উদ্দেশ্য হইল– তাকওয়া ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন আর বংশ বিস্তার করা। যেহেতু আদম সন্তানের সকলের শক্তি ও সামর্থ্য এক রকম নহে; বরং তাহাদের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে– আর আল্লাহ পাক প্রত্যেকের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন, সুতরাং যাহাদের উত্তেজনা ও কামশক্তি অধিক তাহাদের চারিত্রিক পবিত্রতার হেফাজতের জন্য চার স্ত্রী পূর্ণ বৎসরে একের পর এক তাহার ব্যবহারে আসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ধরনের পুরুষের জন্য চার স্ত্রী নির্ধারণ করা প্রাকৃতিক কানুনের সম্পূর্ণ মোতাবেক হইয়াছে।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ হইল এই যে, উল্লিখিত ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করিলে কমপক্ষে তিন মাস পর্যন্ত এই নারী পুরুষের জন্য সুষ্ঠভাবে ব্যবহার হইতে পারে। কেননা নারীদের গর্ভের পরিচয় পাওয়ার জন্য কম পক্ষে তিন মাসের প্রয়োজন। তাই গর্ভের পরিচয়ের জন্য তিন মাস সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে। যদি নারী গর্ভবতী হইয়াছে বলিয়া তিন মাসের মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায়। আর উত্তেজনাসম্পন্ন ও কামাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহা হইলে গর্ভের ভিতর অবস্থিত শিশুর উপর খুব খারাপ প্রভাব পড়িবে। অধিকন্তু গর্ভপাত হইয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই এই স্ত্রীকে সহবাস থেকে রেহাই দিয়া দিবে এবং তাহার সাথে সহবাস বর্জন করিয়া দ্বিতীয় এক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। দ্বিতীয় স্ত্রীও যদি তিন মাসের মধ্যে গর্ভবতী বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহার সাথে সহবাস করাও বর্জন করিতে হইবে। কেননা তাহার সাথে এখন সহবাস করার দ্বারা গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর স্বামী-স্ত্রীর কামভাবের উত্তেজনায় বাচ্চার যে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

এই পর্যন্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইল। এখন তৃতীয় এক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। তৃতীয় স্ত্রীরও যখন তিন মাসের মধ্যে গর্ভ প্রকাশ হইয়া পড়িবে এখন তাহার সাথে সহবাস করাও বর্জন করিতে হইবে। এখন নয় মাস অতিবাহিত হইল। প্রথম স্ত্রী সন্তান প্রসব করিল। কিন্তু সন্তান প্রসব করার পর নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনমাস পর্যন্ত সহবাসের যোগ্য হয় না। তাই তাহাকে চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইবে। চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভের পরিচয় পাওয়ার সময় তিন মাসই নির্ধারিত। তিন মাস পরে যখন চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভ ধারণ প্রকাশ হইয়া পড়িবে তখন এই স্ত্রীও স্বামীর সহবাস হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে। এই সময়ের মধ্যে প্রথম স্ত্রীরও গর্ভপাতের পরে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে সহবাসের উপযুক্ত হইয়া যাইবে। এইভাবে প্রত্যেকে স্ব স্ব সন্তান প্রসবের পর তিনমাস অন্তর অন্তর সহবাসের উপযুক্ততা অর্জন করিয়া পালাক্রমে স্বামীর সাহচর্যে আসিবে।

এই সংখ্যা একজন চরম পর্যায়ের উত্তেজনা ও কামভাব সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। আর ইহা প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত বিধানের সম্পূর্ণ মোয়াফেক

হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কোন আপত্তি উথাপনের অবকাশও নাই।

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে বিবাহের অনুমতি প্রদান করিতে গিয়া দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে এই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে কোন কোন পুরুষের জন্য বৎসরে মাত্র দুইজন স্ত্রী হইলেই যথেষ্ট। কেননা কোন কোন নারী এমন রহিয়াছে যাহারা তাড়া তাড়ি গর্ভবতী হয় না অথবা গর্ভবতীই হয় না। আবার কোন কোন পুরুষের জন্য বৎসরে মাত্র তিনজন স্ত্রী হইলেই যথেষ্ট। আবার কাহারও কাহারও চার জনের প্রয়োজন হয়।

গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এক তো গর্ভপাত হওয়ার আশংকা। দ্বিতীয়তঃ এই গর্ভ হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে তাহার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে পিতামাতার কামউত্তেজনার প্রভাব পড়িবে এবং সে জন্মগতভাবে বদচরিত্র হইয়া পড়িবে। কেননা পিতামাতার কামউত্তেজনার প্রভাব গর্ভের অভ্যন্তরে বাচ্চার উপর পড়িয়া থাকে। অতঃপর ইহা তাহার স্বভাবগত বিষয় হইয়া পড়ে।

এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধান মোতাবেক এক আপত্তি উথাপিত হয়। তাহা হইল– শিশু যে নারীর দুগ্ধ পান করে তাহার সাথে সহবাস করা দুগ্ধ পানকারী শিশুর জন্য ক্ষতিকর। অথচ উল্লিখিত বর্ণনাতে এমন নারীর সাথে সহবাস করা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে বলা হয় নাই; বরং চতুর্থ স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার পর প্রথম স্ত্রীর সাথে সহবাসের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; যদিও তখন প্রথম স্ত্রী বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকে।

চিকিৎসাবিদগণ কোন কোন ঔষধের দ্বারা এই ক্ষতিগ্রস্থতার সংশোধন করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান দিয়াছেন। তাই বাচ্চার দুগ্ধপান করা অবস্থায় সহবাস করা ক্ষতিকর রহিল না।

এখন প্রশ্ন হইল যে, চার স্ত্রী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্ত্রী বিবাহ করা বৈধ নয় কেন? এই ব্যাপারে চিন্তা করার দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহের একটি নির্ধারিত সীমা থাকা প্রয়োজন। যদি নির্ধারিত সীমা না থাকে তাহা হইলে মানুষ পরিমিত সীমা অতিক্রম করিয়া শত শত বিবাহ করার সুযোগ তালাশ

করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে বিবাহিত স্ত্রীদের উপর এবং নিজের জীবনের উপরও জুলুম হইতে থাকিবে। অধিকন্তু চার নারী বিবাহ করার দ্বারা বিবাহের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। এই জন্য চারের অধিক বিবাহ করা নাজায়েয করা হইয়াছে।

অধিক বিবাহের কারণসমূহের সারকথা

১। তাকওয়া ২। শক্তি সামর্থ্যের হিফাজত ৩। স্ত্রী মোয়াফেক না হওয়া আবার তালাক প্রদানের সুযোগও না থাকা। ৪। বান্ধা হওয়া (৫)- কোন কোন শহর এবং কোন কোন বংশে কণ্যা অধিক জন্ম নেয়া ৬। রাজনৈতিক কারণ ও প্রয়োজন।

নারীরা সাধারণতঃ পঞ্চাশ বৎসরের পর বাচ্চা দেওয়ার যোগ্য থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশে পুরুষরা নব্বই বৎসর পর্যন্ত ইহার যোগ্য থাকে। ৭। যেনা আধিক্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ইহা ঐসব দেশে ঘটিয়া থাকে যেখানে অধিক বিবাহের প্রচলন নাই। উপরে উল্লিখিত কারণগুলি অধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করিতেছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের তুলনায় অধিক বিবাহ করিবার কারণ

১। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন স্বীয় উম্মতের পুরুষদের নবী ছিলেন, অনুরূপভাবে নারীদেরও নবী ছিলেন। তাই সর্বদাই কতক নারী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকা একান্ত জরুরী ছিল, যাহাতে তাহার সাহচর্যে থাকিয়া দ্বীনের শিক্ষা লাভ করিয়া অন্যান্য নারী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে। এইভাবে নারীরাও দ্বীন প্রচার করিতে সক্ষম হয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মত অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন।

২। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক ও রূহানী শক্তি অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তিনি সর্বদা রোযা রাখিতেন। অর্থাৎ প্রতিদিন রোযা রাখিতেন। কিন্তু স্বীয় উম্মতকে এই ধরনের রোযা রাখিতে নিষেধ করিতেন। উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আপনি তো প্রতিদিন রোযা রাখেন? তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে?

أَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِيْ *

"আমি স্বীয় পরোয়ারদিগারের কাছে রাত্রি যাপন করি। তিনি আমাকে পানাহার করাইতেছেন।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহসমূহ সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে মারাত্মক ভুল ধারণা রহিয়াছে। কেননা তাঁহার বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিছক সহানুভূতি ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, অথবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি কায়েম করা। ইহা ব্যতীতও আরও অনেক রাষ্ট্রীয় কারণ এবং দ্বীনী উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক বিবাহ করার ভিত্তি ছিল প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক তখন তিনি বিবাহ করেন। ঐ সময় তাঁহার চারিত্রিক পবিত্রতা এবং খোদাভীতি ও পরহেযগারী সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর আরও পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত হযরত খাদিজা (রাঃ) জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ করেন নাই। অথচ তৎকালে সমগ্র আরবে শর্তহীনভাবে অধিক বিবাহের প্রচলন ছিল। যাহারা নেক কার্যের মধ্যেও বদ উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে তাহাদের জন্য অপরিহার্য হইল তাহারা যেন ইহার কারণও তালাশ করে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত একাধিক বিবাহ করেন নাই। অথচ তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যদি প্রবৃত্তির চাহিদা কাহারও মধ্যে কখনও প্রাধান্য পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যৌবন কালেই প্রাধান্য পায়। তখন যৌবনের অনুভূতি সতেজ ও ধাবমান থাকে। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবনকালে তিনি মাত্র এক স্ত্রী লইয়া এইভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তখন কোন এক সময় কুরায়শরা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, আপনি প্রতিমা পূজাকে খারাপ বলা পরিত্যাগ করুন– আমরা আপনাকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করিব। সর্বাধিক পরমা সুন্দরী রমণীকে আপনার বিবাহাধীনে দিয়া দিব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাহাদের এইসব লোভ প্রদর্শনের সামান্যও পরোয়া করেন নাই।

কোন মানুষ ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, প্রবৃত্তির চাহিদা প্রাধান্য পাওয়ার সময় হইল যৌবনকাল। যেহেতু তাঁহার জীবনের ঐ সময়টুকু সম্পর্কে তাঁহার মারাত্মক শত্রুরাও স্বীকার করে যে, তিনি যৌবনকালে চারিত্রিক পবিত্রতার উদাহরণ ছিলেন। তাই তাহার প্রতি দোষারূপ করা যে, তিনি প্রবৃত্তির চাহিদা পূরা করার জন্য অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন– ইহা তাহার পবিত্র সত্ত্বার প্রতি মারাত্মক অপবাদ।

৪। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সূচনা যুগে এবং শেষ যুগের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হইয়াছিল। নবুয়তের সূচনাযুগে যখন তিনি মক্কার মধ্যে দ্বীনের প্রচার শুরু করিলেন যদিও তখন কাফেরদের পক্ষ হইতে মুসলমানরা বিভিন্ন নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করিতেছিল কিন্তু তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে মুসলমানদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। বিশেষ করিয়া যাহারা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, তুলনামূলকভাবে তাহারা কাফেরদের হামলা হইতে অনেকটা বাচিয়া ছিল। তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে তাহাদের সম্পর্কও বহাল ছিল। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দুহিতার বিবাহও এক কাফেরের সাথে হইয়াছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর দুহিতা হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর বিবাহের প্রস্তাবও জুবায়ব ইবনে মুতয়েম নামক এক কাফেরের কাছে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মুতয়েম স্বীয় পুত্রের সাথে হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর বিবাহ প্রস্তাব এই অজুহাতে প্রত্যাখান করিয়াছিল যে, তাহার ভয় হইতেছিল যে, এই সম্পর্কের কারণে না জানি তাহার পুত্র নতুন ধর্মে চলিয়া যায়। ইহার পরই হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর বিবাহ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হইয়া ছিল। যদিও প্রথম প্রথম কাফেরদের সাথে মুসলমানদের এই ধরনের সম্পর্ক বজায় ছিল কিন্তু পরে আস্তে আস্তে এইসব সম্পর্কও ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, কোন মুসলমান নারী কাফেরদের হাতে পড়িয়া যাওয়া তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ফলে তাহার সাথে কাফেরদের সাহায্য সহযোগিতার সম্পর্কও কাটিয়া গিয়াছিল। তখন

মুসলমান রমণী অথবা বিধবা নারীদের জন্য মুসলমান স্বামী গ্রহণ করাই জরুরী ছিল।

এইসব ঘটনাকে সামনে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহসমূহের পর্যালোচনা করা উচিত। একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ)- ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য সকল স্ত্রী বিধবা ছিলেন। এই সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই। আমরা এখানে তাঁহার স্ত্রীগণকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করিব।

তাহাদের মধ্যে কতক এমন ছিলেন যাহারা তাহাদের স্বামীর সাথে হাবশা অথবা মদিনাতে হিজরত করিয়াছিলেন। আর কতক এমন ছিলেন যাহারা কোন না কোন সম্প্রদায়ের নেতার কন্যা অথবা বিধবা স্ত্রী ছিলেন। তাহাদের স্বামীরা যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁহার স্ত্রীদের বিবাহের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা তাহাদের আলোচনা করিতেছি। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর তিরোধানের পর তিনি সর্বপ্রথম হযরত সাওদা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। হযরত সাওদা (রাঃ) ও তাঁহার স্বামী ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। তিনি সেখানেই বিধবা হইয়াছিলেন। আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

অতঃপর উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রাঃ)-এর সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত হাফছা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বামীর সাথে হিজরত করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) প্রথমে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে ও পরে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে তাহার কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে আহবান জানান। কিন্তু তাহারা উভয়ে ইহা অস্বীকার করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাহার বিবাহ হইল। স্বীয় কন্যার বিবাহের জন্য হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিজেই প্রস্তাব পেশ করা প্রমাণ করে যে, তৎকালে মুসলমানগণ কত বিপদাপদে ছিলেন।

অতঃপর বিবাহ হয় হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)-এর সাথে। তিনি স্বীয় স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরতকারী প্রথম কাফেলায় শরীক ছিলেন। এক জিহাদে তাহার স্বামী আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর এই জখমের কারণেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

হযরত উম্মে সালামার পর হযরত উম্মে হাবীবার (রাঃ) সাথে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি কুরায়শ বংশের খ্যাতনামা নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। তিনি স্বীয় স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলায় শরীক ছিলেন। হাবশায় হিজরত করার পর তাহার স্বামী খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল। কিছু দিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কিন্তু তিনি মুসলমানই রহিয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইলেন।

অতঃপর উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হয়। প্রথমে তিনি হযরত যায়দ ইবনে হারিছার (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করিতে পারেন নাই বিধায় তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁহার বিবাহ হয়।

অতঃপর হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ-বন্ধনে আসেন। তিনি 'মিসকীনদের মাতা' হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার পূর্ব স্বামী ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাহার বিবাহের দুই তিন মাস পর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ) হিজরত করিয়াছিলেন। বিধবা হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ-বন্ধনে আসেন।

উল্লিখিত তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, যতজন নারী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের সকলেই প্রথমেই মুসলমান ছিলেন। অতপর কাফেরদের হাতে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হইয়া স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে আশ্রয়

লইয়াছিলেন। আর সকলেই কুরাইশ বংশের ভদ্র পরিবারের কন্যা ছিলেন। একদিকে তো নিজেদের ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ সবকিছু ত্যাগ করিয়া শুধু দ্বীনের খাতিরে স্বদেশ ত্যাগ করা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দ্বিতীয় বিপদ হইল যে, তাহাদের স্বামীগণ কষ্ট পরিশ্রম করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জন করিতেন, এখন তাহারাও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন অথবা জিহাদে গিয়া শহীদ হইয়াছেন। এমন অসহায় অবস্থায় তাহারা কি কষ্টে পড়িয়াছিলেন- ইহার আন্দাজ কে করিতে পারে? এই অবস্থায় এইসব অসহায় অবলা নারীদেরকে কাফেরদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া কি বৈধ ছিল যে, কাফেররা তাহাদিগকে অকথ্য ও অমানুষিক নির্যাতন করিয়া করিয়া মারিয়া ফেলুক। অথবা তাহাদের কোন খোঁজ খবর না লইয়া তাহাদিগকে এমনিতেই ছাড়িয়া দেওয়া কি ঠিক হইত যে, তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেন? না, কখনও নহে। ইসলাম ইহা কখনও চায় না যে, যাহারা শুধু দ্বীন ধর্মের খাতিরে বিভিন্নভাবে অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন এখন তাহারা অপদস্থ ও লাঞ্চিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথবা নিজ হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে চরম দুশমনের কাছে সোপর্দ করিবে, যাহাতে তাহারা তাহাদের উপর নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালাইতে পারে।

তাহাদের এই অবস্থায় তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে স্বীয় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন, যাহাতে তাহারা দ্বীনের খাতিরে ঘরবাড়ী, ইযযত ও সম্মান ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন তদাপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী ইযযত-সম্মান অর্জিত হয়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরা এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রধান নেতার কন্যা ছিলেন। যুদ্ধে গ্রেপ্তার হইয়া মুসলমানদের হাতে আসিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত জুয়াইরা (রাঃ) এক কাফেরের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার এই স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। গণিমতের মাল হিসাবে হযরত সাবেত ইবনে কায়সের (রাঃ) বন্টনে আসিয়াছিল। হযরত সাবেত বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে তাহাকে মুক্তি দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু সে অর্থ আদায় করার সামর্থ তাহার ছিল না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসিলেন এবং তাহার সামনে ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রধানের কন্যা। তাহার স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়া যাওয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল মনে করিলেন না। তাহার স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে ফেরত যাওয়াকে তিনি ফিতনার কারণ মনে করিলেন। তাই তিনি নিজের পক্ষ হইতে এই অর্থ আদায় করিয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন। পরে বিবাহ করিয়া লইলেন। কেননা আরবদের মর্যাদাবোধ ইহা সহ্য করিতে সম্মত নয় যে, এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কন্যা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকের বিবাহে থাকে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) খায়বরের যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হন। হযরত দেহিয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন বন্দী দাসীর জন্য আবেদন করিলেন। তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন, "যাও, যাহা ইচ্ছা হয় বাছিয়া লও।" তিনি হযরত সাফিয়া (রাঃ)-কে পছন্দ করিলেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীগণ আবেদন করিলেন যে, তিনি একজন নেতার কন্যা। তিনি আপনার ছাড়া অন্য কাহারও হস্তগত হওয়া উচিত নয়। অথবা আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়া লউন। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিলেন।

শেষোক্ত দুইটি বিবাহের ঘটনা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের দুইজনকে বিবাহ করার পিছনে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল- তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যেন ফেতনা-ফাসাদ হইতে বিরত থাকে। আর এইভাবে আজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত সম্প্রদায়গুলিও যেন নিজেদের কলহ-বিবাদ মিটাইয়া এক হইয়া যায়। অবশ্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাপুরি সফলকাম হইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাহার সফলতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বিধায় ইহা বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

বিবাহে মহর নির্ধারণ করার রহস্য

১। বিবাহে মহর নির্ধারণ করা সাব্যস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে বিবাহ-সম্পর্ক নষ্ট করিতে স্বামীর উপর আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থতার ভয় লাগিয়া

থাকে এবং যে প্রয়োজন থেকে তাহার বাঁচিয়া থাকার কোন সম্ভাবনা নাই, এমন প্রয়োজন ব্যতীত সম্পর্ক ছেদ না করে। সুতরাং মহর নির্ধারণ করা যেন বিবাহ সম্পর্ককে এক প্রকারের স্থায়ী করা।

২। মহর বিবাহে স্ত্রীর লজ্জাস্থানের বিনিময়। ইহা ব্যতীত বিবাহের মর্যাদা প্রকাশ পায় না। কেননা অর্থের প্রতি মানুষের যতটুকু লোভ রহিয়াছে অন্য কোন জিনিসের দিকে ততটুকু লোভ নাই। সুতরাং যে জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় হয় তাহা অর্থ ব্যয়কারীর কাছে মর্যাদাবান হইয়া যায়। আর অর্থ ব্যয়কারী অর্থাৎ স্বামীর কাছে স্ত্রী মর্যাদাবতী হওয়ার কারণে স্ত্রীর অভিভাবকদের নয়ন সম্পদ ব্যয়কারীকে তাহাদের কলিজার টুকরার মালিক হইতে দেখিয়া শান্তি অনুভব করিতে থাকে।

৩। মহরের কারণে বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায়। আল্লাহ পাক বলেনঃ

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ *

"নিজেদের অর্থের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের চারিত্রিক পবিত্রতা হেফাজতকারী হও। ব্যভিচারী হইও না।" এই কারণে পূর্ববর্তী লোকদের এক প্রথা হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহর প্রদানের অপরিহার্যতা বহাল রাখিয়াছেন।

ওলীমার প্রথা চালু করার কারণ

বিবাহের পর সাধারণ মানুষকে আহার করানো হয়। এই বিধান চালু করার পিছনে অনেক কারণ রহিয়াছে।

১। ইহার দ্বারা বিবাহের প্রচার ও প্রসার হয়। অধিকন্তু ইহারও প্রচার হয় যে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করা চাই। আর এই ধরনের প্রচার প্রসার খুব জরুরী, যাহাতে বাচ্চার বংশীয় সম্পর্কের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ না থাকে। আর বাহ্যিকভাবে হইলেও বিবাহ এবং যেনার মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায়। আর স্বামীর সাথে এই নারীর বৈধ সম্পর্কের কথা প্রমাণ হইয়া যায়।

২। ওলীমা অনুষ্ঠানের দ্বারা স্ত্রী এবং [illegible] সাথে

সদাচরণ ও উত্তমাচরণ পাওয়া যায়। ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং লোকদিগকে সমবেত করার মধ্যে দলীল রহিয়াছে যে, স্বামীর কাছে স্ত্রীর ইয্যত ও সম্মান রহিয়াছে। এই ধরনের কার্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি কায়েম করে।

৩। ওলীমার অনুষ্ঠান করা এক নতুন নিয়ামত হাসিল করার জন্য শুকরিয়া আদায় করা এবং সকলের আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করা। অধিকন্তু অর্থ ব্যয় করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা। এই ইচ্ছাটুকু বাস্তবায়ন করার দ্বারা দান করার অভ্যাস পয়দা হয়। কৃপণতার অভ্যাস দূর হইতে থাকে। ইহা ব্যতীতও আরও অনেক উপকার রহিয়াছে। চিন্তা করিলে দেখিবে যে, ওলীমা অনুষ্ঠানের মধ্যে শহর ও ঘরবাড়ীর ব্যবস্থাপনা, সন্তানদের মধ্যে উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করা এবং সদাচরণ সম্পর্কিত অনেক ফায়দা নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এই দিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, উৎসাহ দিয়াছেন এবং নিজেও আমল করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলীমাতে কি পরিমাণ আহার করাইতে হইবে- ইহার সীমা নির্ধারণ করেন নাই। তবে এই ব্যাপারে মধ্যপন্থা হইল একটি ছাগল যবেহ করা। তিনি নিজে হযরত সাফিয়া (রাঃ)-এর ওলীমাতে সাহাবাগণকে ঘি ও চিনিতে চূর্ণ করা রুটি আহার করাইয়াছিলেন। কোন কোন বিবাহতে মাত্র পৌনে দুইসের যবের দ্বারা ওলীমা করিয়াছিলেন। তিনি বলেনঃ

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا *

"যখন তোমাদের কাহাকেও ওলীমার সুন্নত দাওয়াতে আহবান করা হয় তখন তোমরা উক্ত দাওয়াতে যাইবে।"

বিবাহে সাক্ষী নির্ধারণ করা ও প্রচার করার কারণ

সকল নবী ও ইমামগণ একমত যে, বিবাহের প্রচার করা হউক, যাহাতে উপস্থিত লোকদের সামনে বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ হইয়া যায়। এই জন্যই বিবাহে সাক্ষী নির্ধারণ করা হয়। অধিক প্রচারের জন্য ওলীমা করা উচিত। মানুষকে ওলীমাতে নিমন্ত্রণ করা এবং এত খোলাখুলিভাবে ইহার

অনুষ্ঠান করা যে, অন্যান্যদেরও এই সম্পর্কে খবর হইয়া যায় এবং পরে কোন খারাপ কথার উদ্ভব না হয়।

আকীকার বিধানের প্রচলন করা এবং নবজাতকের মাথা মুণ্ডানের কারণ

আরবদেশের লোকেরা আদিকাল হইতেই নিজেদের সন্তানদের জন্য আকীকা করিত। আকীকার মধ্যে জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত কল্যাণ নিহিত ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথাকে বহাল রাখিলেন। নিজেও আকীকা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্যদিগকেও আমল করিবার উৎসাহ দিতেন। আকীকার মধ্যে নিহিত কল্যাণসমূহের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল- যেমন, ১। আকীকা করার দ্বারা সন্তানের বংশ পরিচয়ের প্রচার ও প্রসার হয়। ২। ইহাতে বদান্যতার পরিচয় হয়। ৩। খৃষ্টানদের মধ্যে এক প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহাকে হলুদ পানি দ্বারা রঞ্জিত করিত। তাহাদের এই কাজকে উমুদিয়া বলা হইত। এই কার্যের পিছনে তাহাদের দাবী ছিল যে, হলুদ পানি দ্বারা রঞ্জিত করার ফলে বাচ্চা খৃষ্টান হইয়া যায়। তাহাদের কার্যের আকৃতির উপর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন-

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

"আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করিয়াছি। আল্লাহর রং-এর চাইতে উত্তম রং আর হইতে পারে না।"

সুতরাং মিল্লাতে হানাফীয়া অর্থাৎ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মেও তাহাদের মোকাবিলায় এমন কোন কাজ হওয়া চাই যাহা দ্বারা তাহাদের সন্তান হানাফী এবং মিল্লাতে ইবরাহীমী এবং মিল্লাতে ইসমাইলীর অধীনস্থ হইয়া যায়। সুতরাং যেসব কার্য হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বিশেষ আমল ছিল। অতঃপর তাহাদের উপর পুরুষদের মধ্যে ইহার চর্চা ও বিদ্যমান ছিল। ঐসব কার্যের মদ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আমল হইল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্বীয় সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে যবেহ করার প্রস্তুতি গ্রহণ। অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত ইসমাইল

(আঃ)-এর পরিবর্তে যবেহ আযীমের মাধ্যমে তাহাকে পুরস্কৃত করা।

অধিকন্তু তাহাদের উভয়ের শরীয়তের আরও একটি প্রসিদ্ধ কার্য হইল হজ্জ। মাথা মুণ্ডানো ও যবেহ করা হজ্জের বিশেষ আমল। এই দুই আমলে তাহাদের সাথে সাদৃশ্য পয়দা করা মিল্লাতে হানাফী সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া। আর প্রকাশ করা যে, এই নবজাতকের সাথেও এই মিল্লাতের আচরণ করা হইয়াছে।

সপ্তম দিবসে আকীকা করা ও নাম রাখার কারণ

জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করার দিন হিসাবে ধার্য্য করা হইয়াছে। কারণ সন্তানের জন্ম ও তাহার জন্য কৃত আকীকার মধ্যে কয়েক দিনের পার্থক্য থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা সন্তান জন্মের পর পরিবারের সকল লোক প্রসূতি ও নবজাতকের সেবা সুশ্রুষা ও খোঁজ-খবর লওয়ার মধ্যে ব্যস্ত থাকে। এই সময় আকীকা করার নির্দেশ দিয়া তাহাদিগকে আরও অধিক ব্যস্ত করিয়া তোলা ঠিক নয়।

অধিকন্তু অনেক লোক তখনই সাথে সাথে ছাগল পায় না বরং অনেক অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়। যদি জন্মের দিনই আকীকা করা সুন্নত করা হইত তাহা হইলে মানুষের অনেক কষ্ট হইত। এই জন্য সাত দিনের পার্থক্য রাখা হইয়াছে। আর সাতদিনের পার্থক্য একটি যথেষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পার্থক্য। সপ্তম দিবসে নাম রাখার কারণ এই যে, ইহার পূর্বে নাম রাখার প্রয়োজনই বা কি? বরং নাম রাখার মধ্যে আস্তে-ধীরে বিলম্বের সাথে কাজ করা উচিত, যাহাতে চিন্তা ফিকির করিয়া ভাল নাম রাখা যায়। অন্যথায় তাড়াতাড়ি করিয়া নাম রাখিলে খারাপ নাম নির্বাচিত হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শিশুর মাথার চুলের সম ওজনের রূপা সদকা করার রহস্য

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান (রাঃ) সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে বলিলেন, হে ফাতিমা! তাহার মাথার চুল মুণ্ডাইয়া ফেল। আর মুণ্ডিত চুলের সম ওজনের রৌপ্য আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিয়া দাও। ইহার পিছনে রহস্য এই যে, শিশু মায়ের গর্ভ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে। তাহার এই স্থানান্তর আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে

বিশেষ নিয়ামত। এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য। শুকরিয়া বিভিন্নভাবে আদায় করা যায়। তন্মধ্যে উত্তম পন্থা হইল– আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান করা।

গর্ভের সন্তানের মধ্যে গর্ভকালীন যতগুলি চিহ্ন ছিল– উহাদের সর্বশেষ চিহ্ন হইল তাহার মাথার চুল। এখন তাহার মাথার চুল দূর করার অর্থ, তাহার মধ্যে ভূমিষ্ঠ সন্তানের চিহ্ন লাগানো। আর চিহ্নের শুকরিয়া স্বরূপ মূল্যবান জিনিস দান করা উচিত। তাই রৌপ্য দান করা নির্ধারণ করা হইয়াছে। স্বর্ণ নির্ধারণ না করিয়া রৌপ্য নির্ধারণ করার কারণ হইল এই যে, স্বর্ণ অধিক মূল্যবান হওয়ার কারণে আমীর ও ধনী লোক ব্যতীত অন্যদের দ্বারা এই দায়িত্ব আদায় করা কষ্টকর। অন্যান্য জিনিসও খুব সস্তা। কিন্তু রৌপ্য মূল্যবান অথচ মধ্য পর্যায়ের জিনিস।

বালকের জন্য দুইটি ছাগল দ্বারা আর বালিকার জন্য একটি দ্বারা আকীকা দেওয়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন,

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

“বালকের জন্য দুইটি আর বালিকার জন্য একটি ছাগলের দ্বারা আকীকা দেওয়া উচিত।” কারণ মানুষের কাছে বালিকা অপেক্ষা বালক অধিক উপকারী। সুতরাং বালকের জন্য দুইটি ছাগল যবেহ করা তাহার উপকারের আধিক্যতা ও তাহার মর্যাদার উপযোগী।

হযরত ইবনে কাইয়েম (রহঃ) এই সম্পর্কে লিখেন– বালকের জন্য দুই ছাগল আর বালিকার জন্য এক ছাগলের দ্বারা আকীকা দেওয়ার কারণ হইল এই যে, বালক বালিকা হইতে অধিক মর্যাদাশীল। বালক জন্মগ্রহণ করার ফলে পিতার উপর নিয়ামত পরিপূর্ণ হয়। আর এই কারণে পিতা অধিক খুশীও হইয়া থাকে। তাই পিতার অধিক শুকরিয়া করা কর্তব্য। কেননা নিয়ামত অধিক অর্জিত হইলে শুকরিয়া অধিক করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

নারীর বিবাহে অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণের হেকমত

১। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ “অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ হয় না।” ইহার কারণ, বিবাহে নারীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। কেননা নারীদের বিবেক অপূর্ণ হইয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাশক্তিও ত্রুটিযুক্ত হয়। এই জন্য তাহাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণের প্রতি পথ নির্দেশ করিতে পারে না।

২। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের আভিজাত্যের হেফাজত করিতে পারে না। তাই অনেক সময় কম মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারেও বিবাহ করার প্রতি অনুপ্রাণিত হইয়া পড়ে। অথচ এই ধরনের বিবাহে সম্প্রদায়ের সম্মান ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে। তাই এই ক্ষেত্রে অভিভাবকের হস্তক্ষেপ থাকা একান্ত জরুরী, যাহাতে সম্ভাব্য অসুবিধা থেকে বাঁচিয়া থাকা যায়।

৩। মানব সমাজের সাধারণ নীতি হইল এই যে, পুরুষরা নারীদের শাসক ও পরিচালক হয়। তাহাদের জীবনের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পুরুষদের দায়িত্বে থাকে। তাহাদের খরচাদির সম্পর্ক পুরুষের সাথে হয়। নারীরা তাহাদের অধীনে থাকে। আল্লাহ পাক বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

“পুরুষরা নারীদের উপর ব্যবস্থাপক; এই জন্য যে, আল্লাহ পাক কতককে অপর কতকের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন।

৪। বিবাহের মধ্যে অভিভাবকের অনুমতির শর্তারোপ করার মধ্যে অভিভাবকদের ইয্যত ও সম্মান নিহিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে নারীরা নিজে নিজে বিবাহ করার মধ্যে নিজেদের সম্মানহানী হয়। অধিকন্তু ইহাতে লজ্জাহীনতা প্রমাণিত হয়। ইহাতে অভিভাবকদের বিরোধিতা ও তাহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়।

৫। বিবাহ কোন গোপনীয় অবৈধ যৌনমিলন নয়– এই পার্থক্যটুকু মানুষের সামনে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহের প্রচার অপরিহার্য। আর প্রচারের উত্তম পন্থা হইল– পাত্রীর অভিভাবকগণ বিবাহে উপস্থিত থাকা। অবশ্য কোন কোন

ক্ষেত্রে অভিভাবকের উপস্থিতি মুস্তাহাব আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইলমে ফিকাহের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাইবে।

কোন পুরুষের নিকটতম আত্মীয় ও বংশ সম্পর্কীতা কোন কোন নারী বিবাহ করা তাহার জন্য হারাম হওয়ার কারণ

১। যদি কোন পুরুষ কোন নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে অথবা কোন নারী তাহার সন্তান হয় অথবা কোন নারীর সাথে তাহার এমন সম্পর্ক হয় যে, যেন তাহারা এক বৃক্ষের দুইটি শাখা অর্থাৎ ভাই-বোন, তাহা হইলে এমন নারীর প্রতি উক্ত পুরুষের বিবাহ সম্পর্কিত আকর্ষণ না হওয়া- মানবের নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বভাবের চাহিদা।

২। যদি নিকটস্থ আত্মীয় ব্যক্তি এই ধরনের নারীকে বিবাহ করার প্রথা থাকিত, তাহা হইলে নারীর পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার দাবী করিতে পারে- এমন লোক পাওয়া যাইত না। (কারণ যে দাবী করিবে সেই তো স্বামী হইয়া বসিয়া আছে।) অথচ প্রত্যেক নারীর জন্য এমন লোক থাকা একান্ত জরুরী যে স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার দাবী করিবে। অধিকন্তু এই বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে দুইটি বিষয় পাওয়া যায়, যাহা বিবাহ সম্পর্কের পরিপন্থী। এক- পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ না থাকা। দুই- স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার দাবী করিতে না পারা। কোন পুরুষ ও তাহার মাতা, ভগ্নি, কন্যা, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগ্নির মধ্যে জন্মগতভাবেই উল্লিখিত বিষয়দ্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এই ধরনের বিবাহ হারাম।

৩। অনুরূপভাবে কোন নারী অন্য কোন শিশুকে দুধ পান করাইলে উক্ত শিশু ও নারীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হারাম হইয়া যায়। কেননা দুগ্ধ দানকারিণী এই নারী শিশুর মাতার মর্যাদা রাখে। কারণ তাহার স্তনের দুগ্ধের দ্বারা শিশুর দেহের বিভিন্ন অংশের মিলন এবং তাহার দেহাকৃতি কায়েম হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধ দানকারিণী এই নারী তাহার মাতার পর মাতা। আর দুগ্ধ দানকারিণী নারীর সন্তানাদি তাহার ভাই বোনের পর ভাই-বোন। সুতরাং এই ধরনের মাতা ও ভাই-বোনের মালিক হওয়া বা তাহাদিগকে

নিজেদের জুটি বানাইয়া তাহাদের সাথে সহবাস করা এমন কাজ, যাহা নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বভাব সর্বদা ঘৃণা করিয়া থাকে।

৪। অনুরূপ দুই সহোদরা ভগ্নিকে এক পুরুষের বিবাহাধীনে একত্র করা হারাম। কেননা ইহাতে এক ভগ্নি অপর ভগ্নির সতীন সাব্যস্ত হবে। আর দুই সতীনের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। শত্রুতার দ্বারা রক্তের সম্পর্কের মধ্যেও ফাটল ধরে। রক্তের সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি করা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। অনুরূপভাবে এই ধরনের সম্পর্ক যুক্ত নারীদ্বয়ের একত্রে এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে থাকা হারাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا *

"এক নারী এবং তাহার ফুফুকে আর এক নারী ও তাহার খালাকে এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে একত্রিত করিও না।"

৫। অনুরূপভাবে কাহারও সাথে শ্বশুড় হওয়ার সম্পর্ক কায়েম হওয়ার দ্বারাও বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। কেননা এই সম্পর্ক কায়েম হওয়ার পরও যদি তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের বিধান চালু থাকে। যেমন মাতার স্বীয় জামাতার প্রতি, কোন ব্যক্তির স্বীয় পুত্রবধুর প্রতি এবং স্বীয় স্ত্রীর কন্যাদের প্রতি এমন আগ্রহ থাকে যাহা বিবাহের মাধ্যমে পুরা করা সম্ভব, তাহা হইলে এই সম্পর্ক নষ্ট করার বা এই ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিবে।

মুসলমান পুরুষ কর্তৃক ইহুদী ও খৃষ্টান নারী বিবাহ বৈধ হওয়া আর ইহুদী ও খৃষ্টান পুরুষ কর্তৃক মুসলমান নারীর বিবাহ বৈধ না হওয়ার কারণ

মুসলমান পুরুষের সাথে ইহুদী বা খৃষ্টান নারীর বিবাহ এই জন্য বৈধ যে, আল্লাহ পাক পুরুষকে নারীর উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। তাই এই ধরনের বিবাহ-সম্পর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হইবে, তাওহীদের নকশা কুফর ও শিরকের উপর প্রাধান্য পাওয়া। ইহাতে এই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে,

তাওহীদ শিরকের উপর বিজয়ী রহিয়াছে। আর বাস্তবেও ইহাই দেখা যায়। কারণ, পুরুষের প্রভাব খুব মজবুত, শক্তিশালী ও কার্যকর হয়। কেননা মুসলমানের সাথে বিবাহিত নারী ইহুদী হউক বা খৃষ্টান হউক– অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান হইয়া যায়। কিন্তু কোন অসুবিধার কারণে হইলেও কোন মুসলমান নারীর বিবাহ কোন ইহুদী বা খৃষ্টান পুরুষের সাথে কখনও জায়েয হইতে পারে না। কেননা এই বিবাহ জায়েয হওয়া আল্লাহর হেকমতের পরিপন্থী। কারণ এই বিবাহ বৈধ হওয়ার অর্থ দাঁড়াইবে শিরক কুফর তাওহীদের উপর প্রাধান্য পাওয়া। আল্লাহ পাকের চাহিদা, তাঁহার কুদরত ও হেকমত এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়ত্ব ও মর্যাদা ইহার প্রতিবন্ধক। অধিকন্তু এই বিবাহের ফলে সর্বোত্তম ও শেষনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মকে ছোট করিয়া দেখানো হয়। তাই ইহা আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয় নয়। কবি বলেন,

یارا حمد شوکه تاغالب شوی + یار مغلوبان مشوتوائے غوی

"হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোস্ত হও, যাহাতে তুমি বিজয়ী হইতে পার। হে পথভ্রষ্ট! পরাজিতদের দোস্ত হইও না।"

তালাক

স্ত্রীকে তালাক প্রদানের বৈধতার হেকমত

তালাক আরবী শব্দ। ইহার অর্থ খুলিয়া ফেলা, পরিত্যাগ করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তালাক হইল স্বামী স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনী থেকে বাহির করিয়া দেওয়া। নিম্নের বিস্তারিত বিবরণ দ্বারা ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে।

বিবাহ মুসলমানদের মধ্যে এক প্রতিশ্রুতি বিশেষ। ইহাতে পুরুষের পক্ষ হইতে ইসলাম, মহর, খরপোষের ওয়াদা এবং সদাচরণ করা শর্ত হইয়া থাকে। আর নারীর পক্ষ হইতে পবিত্রতা, সতীত্ব, সৎ চালচলন, আনুগত্য প্রভৃতি ওয়াদা ও শর্ত অপরিহার্য হইয়া থাকে। যেমন অন্যান্য প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারের কোন শর্ত নষ্ট হইলে [illegible] যায়

তেমনিভাবে বিবাহের কোন শর্ত নষ্ট হইয়া গেলেও বিবাহ বিচ্ছেদের যোগ্য হইয়া যায়। তবে এতটুকু পার্থক্য যে, যদি পুরুষের পক্ষ হইতে কোন শর্ত নষ্ট হয় তাহা হইলে নারী নিজে নিজে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা রাখে না। যেমন নারী নিজে নিজে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ারও উপযুক্ততা রাখে না। বরং বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে হইলে হাকীমের মাধ্যমে করিতে হয়। যেমন অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়।

এই ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার কারণ, তাহাদের জন্মগত স্বভাব হইল যে, তাহারা কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফেলে এবং তাহাদের বিবেক বুদ্ধিতে ত্রুটি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পুরুষরা স্বীয় ক্ষমতায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। অনুরূপভাবে নারীদের পক্ষ হইতে কোন শর্ত নষ্ট হইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করার ক্ষেত্রেও তাহারা ক্ষমতা রাখে।

নারী ও পুরুষের জন্য বিবাহ-বন্ধন ও বিবাহ বিচ্ছেদের যে নীতি বর্ণনা করা হইল, তাহারা তাহাদের স্বভাবজাত বিধানের অনুকূল এবং ইহার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেন ইহা স্বভাবজাত বিধানেরই একটি প্রতিচ্ছবি। কেননা স্বভাবজাত বিধান এই কথাটি মানিয়া লইয়াছে যে, শর্ত সম্বলিত যে কোন অঙ্গীকারের শর্ত নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর অঙ্গীকারটি বাতিল হইয়া যায়। যদি শর্ত নষ্ট হওয়ার কারণে কোন পক্ষ অঙ্গীকার বাতিল করিবার অধিকার পায়, আর দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার বাতিল করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। সুতরাং যদি আমরা বিবাহের হাকীকত সম্পর্কে চিন্তা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, বিবাহ কতগুলি শর্তসম্বলিত অঙ্গীকার ব্যতীত আর কিছুই নয়, যেসব শর্তের অধীনে দুইজন মানুষ জীবন-যাপন করে। যে ব্যক্তি শর্ত ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হয় আদালতের বিচারে সে অঙ্গীকারের অধিকারসমূহ হইতে বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চিত থাকাকে অন্য শব্দে তালাক বলা হয়।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর চালচলনের দ্বারা তালাক প্রদানকারী ব্যক্তির উপর যে প্রভাব পড়ে অথবা এই বিষয়টিকে এইভাবেও বলা যায় যে, এক নারী কাহারও বিবাহাধীনে থাকিয়া স্বীয় অসদাচরণের দ্বারা বিবাহ নামক অঙ্গীকারের কোন শর্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে– এমন নারী মানবদেহের এমন

একটি অঙ্গের সাথে তুলনীয়, যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা পঁচিয়া গিয়াছে। অথবা পোকাধরা কোন দাঁতের সাথে তুলনীয়, যাহার কঠিন ব্যথায় সমস্ত দেহ সর্বদা অস্থির থাকে। এখন প্রকৃত পক্ষে তাহার এই দাঁত দাঁত নয় আর তাহার এই পঁচা অঙ্গটিও অঙ্গ নয়।

এখন দাঁতটি তুলিয়া ফেলার মধ্যে বা অঙ্গটি কাটিয়া ফেলার মধ্যেই শান্তি। এই দাঁত আর এই অঙ্গটি সম্পর্কে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রাকৃতির নিয়মের খেলাফ নহে বরং ইহার অনুকূল। অধিকন্তু মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মানুষের সম্পর্ক যতটুকু গভীর পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক ততটুকু গভীর নহে। ইহা সত্ত্বেও কাহারও হাত-পা বা অন্য কোন অঙ্গ দুষিত হইয়া পড়ার পর চিকিৎসকরা যদি ইহা কাটিয়া ফেলার জন্য একমত হয়, আর তাহারা বলে যে, এই অঙ্গটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করার পরই তাহার জীবন রক্ষা পাইতে পারে- তাহা হইলে হয়ত আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যাইবে না যে, তাহার জীবন রক্ষার জন্য এই অঙ্গটি কাটিতে সম্মত হইবে না।

অনুরূপভাবে যদি কোন স্ত্রী স্বীয় অসৎ চালচলন এবং অসদাচরণের দ্বারা নিজের উপর বিপদ ডাকিয়া আনে সেও যেন একটি পরিবর্তনীয় ও পঁচা অঙ্গ। এখন সে যেন স্বামীর অঙ্গ নহে। এখন তাহাকে পৃথক করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন, যাহাতে এমন না হয় যে, ইহার বিষাক্ত ক্রিয়া সমস্ত অঙ্গে ছড়াইয়া না পড়ে আর তাহাকে ধ্বংস করিয়া না ফেলে। অতঃপর কর্তিত এই বিষাক্ত অঙ্গটুকু কোন পশুপক্ষী ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেও তাহার কোন আপত্তি নাই। কেননা যেহেতু সে ইহা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাই ইহা তাহার দেহের অংশ হিসাবে বিবেচিত নয়। স্ত্রীর অবস্থাও তদ্রূপ।

কতগুলি উপদেশ যেগুলি পালন করার পর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা পাইতে পারে

আল্লাহ পাক বলেন-

وَ الّتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ
فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ، اِن اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا فَاِنْ خِفْتُمْ

شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَ حَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا
يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا *

"যে সকল নারীদের থেকে আনুগত্য প্রকাশ পাইতে থাকে- তোমরা তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান কর। তাহাদিগকে বিছানা হইতে পৃথক রাখ এবং (অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী) তাহাদিগকে মার। যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে তালাক প্রদান বা শাস্তি প্রদানের পথ তালাশ করিও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদাশীল ও বড়।

অতঃপর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধিতার আশংকা দেখা দেয়, তাহা হইলে স্বামীর পক্ষ হইতে একজন বিচারক আর স্ত্রীর পক্ষ হইতে একজন বিচারক নির্ধারণ কর। যদি তাহারা সংশোধন করার চেষ্টা করে তাহা হইলে আল্লাহ পাক তাহাদেরকে তৌফিক দান করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী ও সবকিছুর খবর রাখেন।

নারীদের জন্য প্রতীক্ষাকাল (ইদ্দত) নির্ধারণের কারণ

নারীদের জন্য প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণের প্রধান কারণ হইল, তাহাদের বাচ্ছাদানীর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া। এই জন্য যেসব নারী সহবাসকৃতা হওয়ার অথবা স্বামীর সাথে নির্জন বাস করার পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহাদের জন্য প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা হয় নাই। আল্লাহ পাক বলেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا *

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ঈমানদার নারীদের বিবাহ কর অতঃপর তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক প্রদান কর, তোমাদের এইসব স্ত্রীদের উপর এমন কোন প্রতীক্ষাকাল নাই, যাহা তোমরা গণনা কর। সুতরাং তাহাদিগকে কিছু সম্পদ দিয়া সদাচরণের মাধ্যমে বিদায় করিয়া দাও।"

স্বামীর জন্য বিধবা নারীর শোক প্রকাশকাল চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করার কারণ

তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীর প্রতীক্ষাকালের পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসিবে। এখন এই সম্বন্ধে প্রয়োজন মোতাবেক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করা প্রতীক্ষাকালের অধীনস্থ একটি বিষয়। এই শোক প্রতীক্ষাকালের চাহিদা ও ইহার পরিপূরকসমূহের অন্তর্ভুক্ত। স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় স্বীয় কাছে আদরণীয়া, আকর্ষণীয়া ও প্রিয়া হওয়ার এবং উভয়ের জীবন-যাপন মধুময় ও প্রেমময় করিয়া তুলার তাগিদে স্ত্রী সৌন্দর্য্যবর্ধক ভূষণ ও অলংকারাদি ও আকর্ষণীয় সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিত। এখন স্বামীর মৃত্যুর কারণে সে প্রতীক্ষাকালে সময় কাটাইতেছে। অধিকন্তু এই সময়ে দ্বিতীয় কোন স্বামীও গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রথম স্বামীর অধিকার পুরা করা এবং এই নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহে জড়িত হওয়াতে বাধাপ্রাপ্তা হওয়ার চাহিদা হইল যে, নারী এমন সব কার্য হইতে বিরত থাকিবে যে কার্য সে স্বামীর জন্য করিত।

অধিকন্তু ইহার দ্বারা এই সময়ের মধ্যে নারীর পুরুষদের লোভ-লালসা আর নারীর সৌন্দর্য্য, সাজসজ্জা এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার দেখিয়া পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি নারীর প্রতি নিবদ্ধ হওয়ার পথ বন্ধ হয়। সুতরাং প্রতীক্ষাকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর নারী বিবাহের দিকে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী জিনিসসমূহ ব্যবহার করার মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং তাহার জন্য এমন সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস ব্যবহার করা বৈধ হয় যাহা স্বামীর অধীনস্থ নারীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতীক্ষাকালে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া আর প্রতিক্ষাকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইহাদের ব্যবহার বৈধ হওয়া অত্যন্ত উপযোগী ও বাস্তব সম্মত হইয়াছে। সমস্ত দুনিয়ার বিবেক একত্র হইয়াও ইহা অপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে পারিবে না।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতীক্ষাকাল এক ঋতুকাল হইতে অধিক হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ যেহেতু মাত্র এক ঋতুকাল দ্বারাই বাচ্ছাদানী খালি হওয়া অথবা নারীর গর্ভবতী হওয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে- তাহা হইলে ইহার পরিচয়ের জন্য এক দীর্ঘ সময় নির্ধারিত করার কারণ কি?

উত্তরঃ যেসব কারণ ও হেকমতের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতীক্ষাকালের বিধান চালু করা হইয়াছে ঐসব কারণ ও হেকমত অবগত হওয়ার পর ইহার রহস্য বুঝে আসিবে। এখানে কয়েকটি কারণ ও হেকমত বর্ণনা করা গেল।

(১) বাচ্চাদানী খালি হওয়া সম্বন্ধে অবগত হইতে হয়, যাহাতে দুই ব্যক্তির বীর্য মিশ্রিত না হইয়া পড়ে। আর দুই ব্যক্তির বীর্য একত্রে মিশ্রিত হইয়া পড়িলে বাচ্চার বংশ পরিচয় সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িবে। ফলে ফেতনা ফাসাদের সৃষ্টি হইবে। প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ না করিলে বাচ্চাদানী খালি হওয়া সম্বন্ধে অবগত হওয়া যাইবে না। আর ইহা ফেতনা ফাসাদের কারণ হইয়া পড়িবে। ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া শরীয়ত পরিপন্থী আর আল্লাহর হেকমত বিরোধী।

(২) প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণের এক কারণ হইল- বিবাহ-বন্ধনের মর্যাদা উচ্চ করা ও সম্মান বৃদ্ধি করা এবং উচ্চ মর্যাদার প্রকাশ করা।

(৩) তালাক প্রদানের পর প্রতীক্ষাকাল দীর্ঘায়িত করার কারণ হইল- তালাক প্রদানের পর পুরুষ যেন লজ্জিত হইয়া তালাকপ্রাপ্তাকে ফিরাইয়া লওয়ার সুযোগ লাভ করিতে পারে।

(৪) প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণের আর এক কারণ হইল- দীর্ঘকাল স্বামীর সাথে বসবাস করার পর তাহার প্রতি ওফাদারীর হক আদায় করা এবং স্বামী ছুটিয়া যাওয়ার কারণে স্বীয় ব্যথাতুর মনের ভাব প্রকাশ করা। আর ইহা সাজসজ্জা, সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্যাদি ব্যবহার এবং আড়ম্বরতা বর্জন করার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে শুধুমাত্র বাচ্চাদানের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্যই প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা হয় নাই। বরং প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণের যে সকল কারণ ও হেকমত রহিয়াছে তন্মধ্যে ইহাও

একটি। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আরও হেকমত রহিয়াছে। মাত্র এক ঋতুকালের মধ্যে অন্যান্য হেকমতসমূহ অর্জিত হইতে পারে না।

প্রতীক্ষাকালের প্রকারভেদ

(১) গর্ভবতী নারীর প্রতীক্ষাকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। (২) স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিধবা নারীর প্রতীক্ষাকাল চার মাস দশ দিন। (৩) তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতীক্ষাকাল তিন হায়েজ (তিন ঋতুকাল)। (৪) বয়স অধিক হওয়ার বা বয়স স্বল্প হওয়ার কারণে যেসব নারীর হায়েজ আসে না– তাহাদের প্রতীক্ষাকাল মাত্র তিন মাস।

বিধবাদের প্রতীক্ষাকাল অন্যান্যদের প্রতীক্ষাকাল হইতে ভিন্নতর হওয়ার কারণ

বিধবা নারীর প্রতীক্ষাকাল চার মাস দশ দিন নির্ধারিত হইয়াছে। বিধবা নারী দুই ধরনের থাকে। কতক নারী এমন রহিয়াছে যে, বিবাহের পর সহবাসকৃতা হওয়ার পূর্বেই বিধবা হইয়াছে। আর কতক সহবাসকৃতা হওয়ার পর বিধবা হইয়াছে। উভয় প্রকার বিধবার প্রতীক্ষাকাল অভিন্ন। অর্থাৎ চার মাস দশ দিন। একদল লোকের ধারণা যে, বিধবার প্রতীক্ষাকাল চার মাস দশ দিন নির্ধারিত হওয়া বিবেক সম্মত নয়। বরং ইহা শরীয়তের পক্ষ হইতে একটি নিছক নির্দেশ। ইহার অনুগত থাকা একান্ত কর্তব্য, যদিও ইহা যুক্তির আওতা বহির্ভূত। কিন্তু তাহাদের ধারণা বাতিল। কেননা বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষে যদি এমনই হইত তাহা হইলে ইহা নিছক ইবাদত হিসাবে গণ্য হইত। অথচ বাস্তবিক পক্ষে ইহা নিছক ইবাদত নয় বরং নিছক প্রতীক্ষাকাল। কারণ বয়স্কা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বিবেকসম্পন্না, পাগলী, মুসলমান, যিম্মী– এইসব নারীদের জন্য প্রতীক্ষা অপরিহার্য। অথচ ইহাদের সকলে শরীয়তের আহকামের জন্য আদিষ্টা নহে। অধিকন্তু প্রতীক্ষাকাল অতিক্রান্ত করিতে নিয়তের প্রয়োজন নাই। অথচ ইবাদতে নিয়ত অপরিহার্য। সুতরাং বুঝা গেল যে, ইহা নিছক ইবাদত নহে। বরং ইহার পরিমাণ চার মাস দশ দিন হওয়ার পিছনে যুক্তি নিহিত রহিয়াছে। তবে যদি কোন ঈমানদার নারী প্রতীক্ষাকাল পালন করার সময় আল্লাহর নির্দেশ পালনের নিয়ত করিয়া পালন করে তাহা হইলে ইহা ইবাদতের অর্থ বহন করা হইতে খালি হইবে না। সুতরাং যে কোন প্রতীক্ষাকাল পালনের

একটি হেকমত অবশ্যই রহিয়াছে– তাহা হইল প্রথম স্বামী এবং সন্তানাদির অধিকারের প্রতি এবং দ্বিতীয় স্বামীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসিবে।

বিধবার প্রতীক্ষাকাল পালনের দ্বারা প্রথম স্বামীর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইবে। যেমন–

(১) উভয়ের মধ্যে বিবাহের যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল উহার সম্মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে।

(২) ইহার দ্বারা উভয়ের বিবাহের স্বীয় অধিকার এবং উভয়ের সংশ্রবের প্রতিশ্রুতির ওফাদারী কিছু হইলেও প্রকাশ পায়।

(৩) ইহার দ্বারা বিধবার গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ফলে বাচ্চার বংশ পরিচয় সন্দেহমুক্ত হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার অধিকার সম্মানের যোগ্য হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা হইতে বুঝা যায়। তাঁহার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহার পর তাঁহার স্ত্রীদের সর্বদার জন্য অন্য কাহারও সাথে বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম করা হইয়াছে।

অধিকন্তু তাঁহার স্ত্রীদের অন্য কাহারও সাথে বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার আরেক কারণ হইল যে, দুনিয়াতে যাহারা তাঁহার স্ত্রী ছিলেন– তাহারা পরকালেও তাঁহার স্ত্রী থাকিবেন। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাহাদের অন্য কাহারও সাথে বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হালাল করা হয় নাই। কিন্তু এই নিয়মটি অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা অন্য কোন স্বামী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় সম্মানিত নয় এবং অন্য কাহারও এতটুকু অধিকার নাই। যদি অন্যান্যদের বেলায়ও স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ হারাম করা হইত তাহা হইলে নারীরা খুব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। তাই বিধবা নারীদের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ হালাল করা হইয়াছে। তবে দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন কতগুলি শর্ত থাকা জরুরী যাহা স্বামীর সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

কিন্তু জাহিলী যুগে স্বামীর অধিকারের এবং বিবাহের প্রতি সম্মান

প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হইত। বিধবা নারীরা এক বৎসর পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিত না। এমনকি তাহারা এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘর থেকে বাহির হওয়ারও সুযোগ পাইত না। ইহা তাহাদের জন্য বড়ই অসুবিধার ব্যাপার ছিল।

এই জন্য আল্লাহ পাক স্বীয় শরীয়তের মাধ্যমে তাহাদের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে হ্রাস করিয়া বিষয়টি সকলের জন্য সহজ করিয়া দিলেন। আর বিষয়টি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ইহা নিছক নেয়ামত, রহমত, কল্যাণ ও হেকমতের উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছে। এক বৎসরের স্থানে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই সময়টুকু নির্ধারণ করার পিছনে হেকমত হইল যে, নারীর বাচ্চাদানে বাচ্চা থাকিলে এই সময়টুকুর মধ্যে অবগত হওয়া সম্ভব। কেননা বাচ্চাদানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য বীর্য হিসাবেই থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিনে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অতঃপর চল্লিশ দিনে বাচ্চা তৈয়ার হইয়া যায়। এই পর্যন্ত চার মাস পূর্ণ হইল।

অতঃপর পরিবর্তনের চতুর্থ স্তরে আসিয়া বাচ্চার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়। এই স্তরের পরিমাণ আনুমানিক দশ দিন। সুতরাং গর্ভে বাচ্চা থাকিলে এই সময়ে বাচ্চা নড়াচড়া করে। ফলে বাচ্চার অস্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সময়টুকু প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা হইয়াছে।

মোটকথা; শরীয়তপ্রবর্তক বিধবার প্রতীক্ষাকাল চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করিয়াছেন। চার মাসে তিন চিল্লা, হয়। এই সময়ের মধ্যে গর্ভের সন্তানের মধ্যে প্রাণ আসে এবং সামান্য নাড়াচাড়া করিতে থাকে। ইহার পরে আরও দশ দিন অতিরিক্ত যোগ করা হইল, যাহাতে বাচ্চার নড়াচড়া পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু চার মাস দশ দিনের সময় সাধারণভাবে গর্ভধারণের সময়ের অর্ধেক। আর এই সময়ের মধ্যে গর্ভ পূর্ণভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহাতে সকলে ইহা দেখিয়া অবগত হইতে পারে।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণে গর্ভে বাচ্চা অনুভূত হওয়ার দিকটি বিবেচনা করা হয় নাই; বরং ঋতুকাল গণনার দ্বারা এই নারীর প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর বিধবা নারীর প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা হইয়াছে চার মাস দশ দিন।

উভয়ের প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণে পার্থক্য করার কারণ হইল যে, তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে সন্তানের হকদার অর্থাৎ পিতা জীবিত আছে। সন্তানের বংশ পরিচয়ের হেকমত সম্পর্কে সে অবগত। অধিকন্তু গর্ভে বাচ্চা থাকিলে স্বামী বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ইহা সম্পর্কে অবগত হইতে পারে। তাই এই দিকটি সন্দেহযুক্ত নহে বলিয়া ইহা প্রতীক্ষাকালে বিবেচনা না করিয়া অন্যদিক বিবেচনা করা হইল। সুতরাং নারীকে এমন একটি জিনিসের সাথে প্রতীক্ষাকাল গণনার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে, যাহার ইলম এই নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর স্বামী তাহাকে এই ব্যাপারে আমানতদার মনে করে। তাহা হইল হায়েজ বা ঋতু। কারণ হায়েজ জারী হওয়ার দ্বারা বুঝা যায় যে, বাচ্চাদানে প্রথম স্বামীর বীর্য অবশিষ্ট নাই। কিন্তু বিধবা নারীর ব্যাপারটি এইরূপ নহে। কারণ তাহার স্বামী জীবিত নাই। অন্য কেহ নারীর গর্ভের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইতে পারিবে না। এমনকি নিকটে থাকিয়াও স্বামীর ন্যায় অবগত হইতে পারিবে না। তাই এমন একটি বিষয় তাহার প্রতীক্ষাকাল হিসাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন যাহার মাধ্যমে নিকটের ও দূরের উভয় প্রকার মানুষ তাহার বাচ্চাদানের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইতে পারে। আর তাহা হইল গর্ভের বাচ্চা অনুভূত হওয়ার সময়।

এই পার্থক্য বর্ণনা করিবার পর তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতীক্ষাকাল সম্পর্কে এক আপত্তি উথাপন স্বাভাবিক যে, যেহেতু এখানে গর্ভের প্রকাশ অবগত হওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হইল শুধু বাচ্চাদান খালি হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর ইহা মাত্র এক হায়েজের দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং তিন হায়েজের প্রয়োজন কি?

আপত্তির নিরসন হইল এই যে, প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণের দ্বারা শুধু বাচ্চাদান খালি হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়াই উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণে যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য রহিয়াছে তন্মধ্যে বাচ্চাদান খালি হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়াও একটি।

প্রতীক্ষাকালের মধ্যে বিভিন্ন জনের যেসব অধিকার নিহিত রহিয়াছে সেগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইহার বিভিন্ন হেকমত বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। প্রতীক্ষাকালে এক অধিকার রহিয়াছে আল্লাহ পাকের।

তাহা হইল– তাঁহার নির্দেশ মান্য করা এবং তাহার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। দ্বিতীয় অধিকার হইল তালাক প্রদানকারী স্বামীর। তাহা হইল– নতুন বিবাহের মাধ্যমে হউক বা রজায়াত করার মাধ্যমে হউক স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ–বন্ধনে আনার সুযোগ প্রদানের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যাপি প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা। তৃতীয় অধিকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর। তাহা হইল– যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা প্রতীক্ষাকালে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক প্রদানকারী স্বামী তাহার খরপোষ ও অবস্থানের ঘর দিতে বাধ্য থাকিবে। চতুর্থ অধিকার সন্তানের। এই অধিকার হইল তাহার বংশীয় সম্পর্ক নির্ধারণ, যাহাতে তাহার বংশীয় সম্পর্ক অন্যের সাথে মিশ্রিত না হইয়া পড়ে। পঞ্চম অধিকার দ্বিতীয় স্বামীর। তাহা হইল তাহার পানি যাহাতে অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সিঞ্চন না হয়। ইহাতে তার পানি অর্থহীন হইয়া পড়িবে।

শরীয়তপ্রবর্তক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ক্ষেত্রের পত্যেকটি হেকমতের মোতাবেক আহকাম জারী করিয়াছেন। যেমন স্বামীর অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই সময়ে স্ত্রী ঘর থেকে বাহির হইয়া পড়িতে পারিবে না। আর স্বামীও তাহাকে ঘর থেকে বাহির করিয়া দিতে পারিবে না। অধিকন্তু তাহাকে এই অধিকারও দেওয়া হইয়াছে যে, যদি তালাক প্রদানকারী রজয়ী তালাক দেওয়ার অবস্থায় প্রতীক্ষাকালের মধ্যেই তালাকপ্রাপ্তাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখিতে চায়– তাহা হইলে স্ত্রী তাহার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হইল স্ত্রীর খরপোষ এবং থাকার ঘরের ব্যবস্থা করা। বাচ্চার অধিকার হইল– তাহার বংশ পরিচয় নির্ধারিত হইয়া যাওয়া, যাহাতে সে স্বীয় পিতা–মাতার সাথে মিলিত হয় এবং অন্যের সাথে মিলিত না হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় স্বামীর অধিকার হইল স্ত্রীর বাচ্চাদানী খালি হওয়া সম্পর্কে সে পূর্ণভাবে অবগত হওয়ার পরে যেন সহবাস করিতে পারে। অন্যথায় হয়তবা এমনও হইয়া পড়িবে যে, তালাকপ্রাপ্তার বাচ্চাদানীতে বাচ্চা বিদ্যমান থাকিবে আর সে না জানিয়া সহবাস করিয়া ফেলিবে। ফলে বাচ্চার বংশ পরিচয় সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িবে।

উল্লিখিত অধিকারসমূহের সমষ্টিগত দিক বিবেচনা করিয়া তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য প্রতীক্ষাকাল তিন হায়েজ নির্ধারণ করা হইয়াছে। অধিকন্তু তিন

হায়েজ প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করিলেই সবগুলি অধিকার শামিল হইতে পারে। কেননা কোন কোন অধিকার এমনও রহিয়াছে যাহা এক হায়েজের পরিমাণ সময়ে হাসিল হইতে পারে না। তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতীক্ষাকালের যে সকল অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে– ইহাদের কোন অধিকার এমনও রহিয়াছে যাহা তালাকপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আবার বিধবা নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চিন্তা করিয়া দেখিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া সামনে আসিবে।

মোতা' বিবাহ হারাম হওয়ার কারণ

(১) মোতা' বিবাহের প্রথা চালু করার মধ্যে সন্তানের বংশ পরিচয় সন্দেহযুক্ত, এমনকি সন্তান বংশ পরিচয়হীন পর্যন্ত হইয়া পড়ে। কেননা মোতা'–বিবাহের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নারী তাহার স্বামীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হইয়া পড়ে। আর নিজেই নিজের পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে। যদি সে স্বামীকর্তৃক গর্ভবতী হয়– তাহা হইলে না জানি সে গর্ভের সন্তান কি করে। অধিকন্তু সাধারণ বিবাহ সর্বদার জন্য হইয়া থাকে। কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয় না। ইহা সত্ত্বেও ইহাতে বড় দুরূহতার সাথে প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ হইয়া থাকে। আর মোতা'–বিবাহের তো আলোচনাই হইতে পারে না।

(২) মোতা'–বিবাহের এক দোষ ইহাও রহিয়াছে যে, এই বিবাহের প্রথা চালু করার দ্বারা শরীয়ত সম্মত বিশুদ্ধ বিবাহ প্রথা বন্ধ হইয়া পড়িবে। কেননা অধিকাংশ লোক বিবাহ করে স্বীয় লজ্জাস্থানের কামভাব পুরা করিবার জন্য। আর মোতা'–বিবাহের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের কাছে বিশুদ্ধ বিবাহের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকিবে না।

(৩) শুধু অর্থের বিনিময়ে নারী সঙ্গমের প্রথা মানবিক বৈশিষ্ট্যের চাহিদার পরিপন্থী। ইহা মানুষকে মানবিক বৈশিষ্ট্যের সীমার বাহিরে লইয়া যায়। ইহা একটি লজ্জাহীন, অশ্লীল কার্য। নির্মল ও বিশুদ্ধ অন্তর ইহা পছন্দ করিতে পারে না। এই কার্যে এতসব দোষ থাকার পরও ইসলামের প্রাথমিক যুগে মাত্র কয়েক দিনের জন্য এই কার্যের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছিল– বিবাহের প্রবল প্রয়োজনে সীমাহীন অস্থিরতা আর বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকার কারণে। যেমন এক দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত থাকার ফলে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলে যে পরিমাণ খাদ্য দ্বারা কোন রকম জীবন রক্ষা হয়

ততটুকু পরিমাণ মৃতজন্তুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করাও হালাল করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে নিহিত দোষগুলির কারণে পরবর্তীকালে ইহা চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

হাদীছের আলোকে মোতা'–বিবাহের নিষিদ্ধতা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُنِيْرِ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِيْ الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا *

"রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন– হে মানব সকল! আমি তোমাদিগকে প্রথমে মোতা' বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলাম। আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত মোতা'–বিবাহ হারাম করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং কাহারো কাছে এমন নারী থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দাও। আর তোমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ– তাহা হইতে কিছুই ফেরত লইও না।" (মুসলিম)

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ اَخُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ (البخاري)

وَ عَنْ سُفِيَانَ نُهِىَ عَنِ النِّكَاحِ الْمُتْعَةِ (فتح الباري)

"হযরত আলী (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধকালীন সময়ে মোতা'–বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মোতা'–বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে।"

মোতা–বিবাহ খণ্ডনের পক্ষে স্বাভাবিক চাহিদামূলক দলীল

ভদ্রস্বভাব, ভাল মানুষ এবং ভদ্র বংশের কোন আমীর ব্যক্তি একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, মোতা–বিবাহ যদি শরীয়তের কোন জায়েয কাজ বা কোন সওয়াবের কাজ হইত তাহা হইলে সাধারণ বিবাহ এবং মোতা–বিবাহের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য কেন? যেমন নিজের বোন, কন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ দিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করাকে লজ্জার ব্যাপার বলিয়া কেহই মনে করে না। কিন্তু কোন ভদ্রলোক কি কোন মজলিসে এই কথা বলিতে পারিবে যে, তাহার মাতা, বোন, কন্যা মোতা–বিবাহে জড়িত হইয়াছে? কখনও পারিবে না। মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার সঙ্গে ইহা এমন একটি দলীল যাহা উত্তর প্রদানে অভিলাষী ব্যক্তির বাকরুদ্ধ করিয়া ফেলে।

দৃঢ়তার সাথে দাবী করা যায় যে, বিবাহ–শাদীতে মানুষ যেভাবে পরিষ্কার মোবারকবাদী গ্রহণ করিয়া থাকে নিকট আত্মীয় নারীদের মোতা'–বিবাহের ক্ষেত্রে কখনও এইরূপ মোবারকবাদী সহ্য করিতে পারিবে না। ইহা তো যুক্তিমূলক দলীল। আর শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হইতে বর্ণিত দলীল তো ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে আরও একটি দলীল লিপিবদ্ধ করা হইতেছেঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اٰلِهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ *

"হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নারীদের সাথে মোতা'–বিবাহে আবদ্ধ হইতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।" ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি বিশুদ্ধ বলিয়া মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সকল সাহাবাগণ এই বিষয়ে একমত যে, মোতা'–বিবাহ অবৈধ। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে ইহার বৈধতার পক্ষে কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার প্রাথমিক অভিমত। তাহাও তিনি এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রেওয়ায়েত করিয়াছিলেন যে, পূর্ব হইতেই আরবে ইহার বৈধতার পক্ষে মতামত চলিয়া আসিতেছিল এবং তথায় এই কার্যটি প্রচলিতও ছিল। অবশেষে

যখন তিনি শরয়ী হুকুম সম্পর্কে অবগত হইলেন তখন তিনি ইহার বৈধতার মতামত বর্জন করেন। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল আলেমগণ এবং মুহাদ্দেছ ও সুফীগণ সকলেই মোতা–বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত।

নারী এবং পুরুষের জন্য ইসলামে পর্দার নির্দেশ দেওয়ার কারণসমূহ

ইসলাম পর্দা সম্বন্ধে পুরুষ এবং নারীদের জন্য এমন কতগুলি মৌলিক বিধান উল্লেখ করিয়াছে, যাহা পালন করিলে তাহাদের পবিত্রতা ও সম্মানের মধ্যে সামান্য পরিমাণ ত্রুটিও আসিতে পারে না এবং তাহারা অপকৃষ্ট কর্মসমূহে জড়িত হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজতে থাকিবে। আল্লাহ পাক বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَذْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ إلٰى قَوْلِهٖ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيْلًا وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا وَّ رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلٰى قَوْلِهٖ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا *

"ঈমানদার পুরুষদিগকে আপনি বলিয়া দিন তাহারা যেন (গায়রে মাহরাম নারীদের প্রতি দৃষ্টি করা থেকে) নিজেদের চক্ষুকে বাঁচাইয়া রাখে (অর্থাৎ এমন নারীদের প্রতি যেন চোখ খুলিয়া না দেখে, যাহারা কামভাব পুরা করার মত যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে স্বীয় দৃষ্টি যেন নীচের দিকে রাখে।) এবং (যে কোন প্রকারে হউক না কেন) স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজত করে। (অনুরূপভাবে কর্ণসমূহও গায়রে মাহরাম নারীদের থেকে বাঁচাইয়া রাখে অর্থাৎ গায়রে মাহরাম নারীর গানবাজনা এবং মিষ্ঠ স্বর কর্ণে প্রবেশ করিতে না

দেয়। তাহাদের সৌন্দর্যের কাহিনী না শুনে। কুরআনের অন্যান আয়াত ও হাদীছে ইহার আলোচনা আসিয়াছে। এই পন্থা (দৃষ্টি এবং অন্তর পবিত্র রাখার জন্য) উত্তম। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিয়া থাকে আল্লাহ পাক ইহার খুব খবর রাখেন। (অনুরূপভাবে) আপনি ঈমানদার নারীদিগকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন (গায়রে মাহরাম পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি করা হইতে) নিজেদের চক্ষুসমূহকে বাঁচাইয়া রাখে। (অধিকন্তু তাহাদের কামউত্তেজক আওয়াজ না শুনে। যেমন অন্যান্য আয়াত ও হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।) এবং নিজেদের লজ্জাস্থান পর্দায় রাখে। নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শক অঙ্গসমূহ (গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে) না খুলে এবং ওড়নাগুলি এইভাবে মাথার উপর রাখে যে, বক্ষদেশ হইয়া আবার মাথার উপর পর্যন্ত আসে। (অর্থাৎ বক্ষদেশ উভয় কর্ণ, মাথা, কানপট্টি এইসব কিছু ওড়না দ্বারা ঢাকা থাকে) এবং নিজেদের পদসমূহ যমীনের উপর (নর্তকীর পায়ের ন্যায়) জোরে জোরে না রাখে। যাহাতে তাহাদের গোপনীয় সৌন্দর্য প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা ও দোয়া করিতে থাক, যাহাতে তোমরা হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচিয়া যাইতে পার আর পদস্খলন থেকে মুক্তি পাইতে পার এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না। (অর্থাৎ এমন আচার আচরণ থেকে দূরে থাক যাহার দ্বারা অন্তরে ইহার খেয়াল জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর এমন পথ অবলম্বন করিও না যে, পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।)

ব্যভিচার একটি নিম্ন পর্যায়ের লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা। (ব্যভিচারের পন্থা মারাত্মক খারাপ পন্থা। অর্থাৎ ইহা গন্তব্য স্থানের পথে প্রতিবন্ধক এবং তোমাদের পরকালের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক।) আর যাহার বিবাহ করার সামর্থ নাই– তাহার উচিত সে যেন নিজের হেফাজতের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করে। (উদাহরণ স্বরূপ, রোযা রাখে, স্বল্প আহার করে, স্বীয় শক্তির দ্বারা এমন কাজ করে যে, দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়ে।) (আর এই সকল মানুষ এমন পন্থাও উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল যাহার ফলে তাহারা সর্বদা বিবাহ হইতে বঞ্চিত থাকিতে ছিল অথবা তাহারা বানোয়াটিভাবে নারী স্বভাব ধারণ করিয়াছিল।) এবং তাহারা বৈরাগ্যতা অবলম্বন করিয়াছিল– কিন্তু আমি তাহাদেরকে ইহার নির্দেশ দেই নাই। অতঃপর তাহারা এই বেদআত কয়টিও পূর্ণভাবে পালন করিতে পারে নাই।"

আল্লাহ পাকের উল্লিখিত উক্তির ব্যাপকতার মধ্যে এই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, "মানুষ বানোয়াটিভাবে নারী-স্বভাব ধারণ করুক- ইহা আমার নির্দেশ নয়।" ইহার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যদি ইহা আল্লাহ পাকের নির্দেশ হইত- তাহা হইলে সকলেই এই নির্দেশ মোতাবেক আমল করিত- আর এই অবস্থায় বনী আদমের জন্মধারা বন্ধ হইয়া যাইত। এইভাবে দুনিয়ার সমাপ্তি হইয়া যাইত। অধিকন্তু লজ্জাস্থান কর্তন করার মাধ্যমে যদি চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের পন্থা চালু করা হয়- তাহা হইলে ইহা প্রকারান্তে লজ্জাস্থানের সৃষ্টিকর্তার প্রতি আপত্তি উথাপন করার নামান্তর।

অনন্তর কাহারও সওয়াব লাভের ভিত্তি হইল- তাহার মধ্যে শক্তি সামর্থ্য বিদ্যমান থাকার পরও আল্লাহ পাকের ভয়ে নিষিদ্ধ স্থানে তাহার শক্তির মোকাবেলা করা আর অনুমোদিত স্থানে শক্তি ব্যবহার করিয়া উপকৃত হওয়া। এইভাবে উভয় পন্থায় সে সওয়াব লাভ হইতে পারে। আর যাহার মধ্যে শিশুর ন্যায় শক্তি-সামর্থ্যই নাই- সে কি করিয়া সওয়াব লাভ করিবে? শিশু কি কখনও চারিত্রিক পবিত্রতার সওয়াব পাইতে পারে?

উল্লিখিত আয়াতসমূহে এবং অন্যান্য আয়াতেও আল্লাহ পাক চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করার জন্য শুধু উচ্চ পর্যায়ের উপদেশই প্রদান করেন নাই; বরং মানুষ চারিত্রিকভাবে পবিত্র থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র ও বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। যেমন, গায়রে মাহরামের প্রতি দৃষ্টি পড়া থেকে চক্ষু হেফাযত করা, গায়রে মাহরামের আওয়াজ শ্রবণ করা হইতে কর্ণ বিরত রাখা। গায়রে মাহরামের কাহিনী না শুনা। যে সমস্ত আচার আচরণে বদ কার্যের আশংকা রহিয়াছে- তাহা থেকে নিজকে বাঁচানো। যদি বিবাহ করার সামর্থ না থাকে তাহা হইলে রোযা রাখা প্রভৃতি।

উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রসহ এই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা যাহা কুরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে- শুধু এখানে স্মরণযোগ্য একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে। তাহা হইল- এই যে, মানুষের একটি স্বভাবগত অবস্থা রহিয়াছে, যাহা তাহার কামভাবের উৎস। মানুষ কোন পরিপূর্ণ পরিবর্তন ব্যতীত এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যেমন খাসী হইয়া যাওয়ার দ্বারা মানুষ এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারে। ইহা এমন একটি অবস্থা যে, এই অবস্থা স্বীয়

আবেগ পুরা করার সুযোগ ও স্থান পাওয়ার পর আবেগ পুরা না করিয়া থাকিতে পারে না। যদি কোনভাবে বিরত থাকিতে পারিত তাহা হইলে আমরা সর্বদা মারাত্মক আশংকার মধ্যে থাকিতাম।

এই জন্যই গায়রে মাহরাম নারীদিগকে সরাসরি দেখার তাহাদের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি করার তাহাদের নৃত্যের ভঙ্গিমায় চালচলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার শিক্ষা দেন নাই। এমনকি পবিত্র মনে দেখারও অনুমতি দেন নাই। অনুরূপভাবে এই সকল যুবতী নারীদের গান বাজনা শ্রবণ করা, তাহাদের কাহিনী শোনার শিক্ষা দেন নাই। এমনকি প্রতিচিন্তা লইয়া শুনার অনুমতি নাই। বরং গায়রে মাহরাম নারী ও তাহাদের সৌন্দর্যের প্রতি চোখ তুলিয়া না দেখার জন্য বার বার সতর্ক করা হইয়াছে। পবিত্র মনে হউক বা অপবিত্র মনে হউক কোন অবস্থায়ই তাহাদের প্রতি তাকানো যাইবে না। আবার তাহাদের গলার সুমিষ্ট স্বর, তাহাদের কাহিনী শ্রবণ করারও অনুমতি নাই। চাই সে শ্রবণ পবিত্র মনে হউক বা অপবিত্র মনে হউক; উভয় অবস্থায় নিষিদ্ধ। বরং তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাহাদের কথা শ্রবণ করার ব্যাপারে আমাদের অন্তরে এমন ঘৃণার সৃষ্টি করা উচিত, মৃতজন্তুর প্রতি মানুষের যেমন ঘৃণা হইয়া থাকে। আর এই নিষেধাজ্ঞা এই জন্য যাহাতে মানুষ পথভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে। কেননা বেপরোয়া দৃষ্টি করার দ্বারা কখনও কখনও এমন কার্য হইয়া পড়ে যাহার ফলে শাস্তি অবধারিত হয়।

পাঠকসমাজ! একটু চিন্তা করিয়া দেখুন; আল্লাহ পাক চাহিতেছেন- আমাদের দৃষ্টি, অন্তর এবং ধারণা এই সবকিছু যেন পবিত্র ও কলুষমুক্ত থাকে। এই জন্য তিনি আমাদিগকে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা দান করিয়াছেন। ইহা সন্দেহাতীত বিষয় যে, কয়েদবিহীন চলাফেলা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের দ্বারা মানুষ গোনাহে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ শুনুন- যদি কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে কয়েকটি নরম নরম রুটি রাখিয়া কুকুরের অন্তরে রুটির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি না হওয়ার আশা করি- তাহা হইলে অবশ্যই আমরা আমাদের এই আশায় ভুলে নিমজ্জিত হইয়াছি। এই বিষয়টিও তদ্রূপ।

আল্লাহ পাক চাহিতেছেন যে, আমাদের অন্তরে অতি গোপনীয়ভাবে

হইলেও যেন কোন প্রকার কলুষতা ও পংকিলতা জন্ম না নেয় এবং আমরা এমন কোন অবস্থার সম্মুখীন না হই যে, আমাদের মধ্যে লুকায়িত যৌন-সম্ভোগেচ্ছা আন্দোলিত হইয়া উঠে। স্বীয় অন্তর পাক-পবিত্র রাখিতে ইচ্ছুক পরহেযগার ব্যক্তির উচিত নহে যে, সে পশুর ন্যায় বেপরোয়াভাবে যে দিকে মন চায় সেদিকেই চোখ উঠাইয়া দেখে বরং তাহার উচিত, সে যেন সামাজিক জীবনে দৃষ্টি নীচে রাখিয়া জীবন-যাপন করার অভ্যাসী হয়। দৃষ্টি নীচে রাখিয়া জীবন-যাপনের অভ্যাস এমন একটি গুণ, যাহা দ্বারা মানবিক স্বভাব মূল্যবান বৈশিষ্ট্যের রংঙে রঞ্জিত হয়। এই গুণের দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার ফলে তাহার সামাজিক প্রয়োজনেরও কোন ঘাটতি পড়ে না। আর এই মূল্যবান বৈশিষ্ট্যটি হইল চারিত্রিক পবিত্রতা।

ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস হারাম হওয়ার কারণ

আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বলেন-

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلَا
تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

“তাহারা আপনার কাছে হায়েজের হুকুম জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি বলিয়া দিন যে, হায়েজ অপবিত্রতা। সুতরাং তোমরা স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় তাহার থেকে দূরে থাক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পবিত্রতা লাভ না করে ততক্ষন পর্যন্ত সহবাস থেকে বিরত থাক।”

যেহেতু আল্লাহ পাক হায়েজকে অপবিত্রতা বলিয়াছেন- সেহেতু এই অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিলে মারাত্মক ক্ষতির প্রবল আশংকা রহিয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ পাক হায়েজ অবস্থায় সহবাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে যে ব্যক্তি হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করে তাহার মধ্যে নিম্নোল্লেখিত রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(১) খুঁজলী-পাঁচরা (২) পুরুষত্বহীনতা (৩) প্রস্রাবে জ্বালা হওয়া ও মুত্রনালী দিয়া পুঁজ নির্গত হওয়া (৪) মেহ (৫) সন্তানের কুষ্টরোগ হয় অর্থাৎ সন্তান জন্মগতভাবে কুষ্ঠ রোগী হইয়া পড়িবে। আর সহবাসকৃতা নারীর নিম্নলিখিত রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে সর্বদার জন্য রক্ত প্রদর রোগে

আক্রান্ত হইয়া পড়ে। বাচ্চাদান বাহির হইয়া ঝুঁলিয়া পড়ে। কোন কোন নারীর গর্ভের সন্তান অকালে ঝরিয়া পড়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে ইহাও একটি বড় কারণ। যেহেতু ঋতুমতী নারীর সাথে সহবাস করিলে উল্লিখিত রোগগুলি ব্যতীতও আরও অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হইয়া থাকে তাই আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বান্দাদিগকে এই অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ঋতুমতী স্ত্রী-সহবাস অবৈধ আর ইসতিহাযাওয়ালী [১] স্ত্রী-সহবাস বৈধ হওয়ার কারণ

ঋতুকালের রক্ত এবং ইসতিহাযার রক্ত উভয় নাপাক হওয়া সত্ত্বেও ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা হারাম। আর ইসতিহাযাওয়ালীর সহিত স্ত্রী-সহবাস বৈধ। শরীয়ত প্রবর্তকের এই নির্দেশটি তাঁহার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। তিনি এই নির্দেশের মাধ্যমে উভয়ের রক্তের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঋতুকালে নিঃসৃত রক্ত ইসতিহাযা কালে নিঃসৃত রক্ত অপেক্ষা অপবিত্রতার দিক দিয়া অনেক মারাত্মক। ইসতিহাযার রক্ত যোনীর একটি মাত্র রগ হইতে বাহির হইয়া আসে। ইহাকে নাসিকা হইতে নির্গত রক্তের সাথে তুলনা করা যায়। ইসতিহাযার রক্ত নির্গত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্যের স্বাভাবিকতার পতন ঘটে। আর ইহা বন্ধ হইলে নারী সুস্থ হইয়া উঠে। কিন্তু ঋতুকালের রক্ত ইহার পরিপন্থী। যদি ঋতুকালের রক্ত ঠিকমত নির্গত হওয়া বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে নারীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। আর যদি রক্ত নির্গত হইয়া পড়ে- তাহা হইলে নারী সুস্থ্য থাকে। অতএব ঋতুকালের রক্ত ও ইসতিহাযার রক্ত হাকীকত, হুকুম এবং কারণের দিক থেকে এক পর্যায়ের নহে। তাই উভয় রক্তের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু প্রকাশ করিয়া দেওয়া ইসলামী শরীয়তের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। ইসতিহাযাওয়ালী নারী

টীকাঃ

১। তিন দিন অপেক্ষা কম বা হায়েজ অবস্থায় দশ দিন অপেক্ষা অধিক বা সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন অপেক্ষা অধিক যে রক্ত বাহির হয় তাহা ইসতিহাযার রক্ত। এই ধরনের নারীকে ইসতিহাযাওয়ালী বলা হয়।

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল–

هَلْ تَدَعُ الصَّلٰوةَ زَمَنَ اسْتِحَاضَةٍ فَقَالَ لَا اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ

فَاَمَرَها اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ هٰذَا الدَّمِ وَ عَلَّلَ بِاَنَّهٗ دَمُ عِرْقٍ وَ لَيْسَ بِدَمِ حَيْضٍ

“ইসতিহাযাকালে কি নারী নামায ছাড়িয়া দিবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না! ইহা রগ; হায়েজ নহে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্দেশ দিলেন রক্তের সাথেই নামায পড়িবার জন্য এবং ইহাকে হালাল বলিলেন। কেননা ইহা রগের রক্ত; হায়েজের রক্ত নহে।”

তালাক তিন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ

তালাক প্রদানের বেলায় অতিরিক্ত তিন তালাক প্রদানের অনুমতি থাকার রহস্য হইল এই যে, তিন সংখ্যাটি আধিক্যতার প্রথম সংখ্যা। কারণ তিন হইতেই বহুবচন শুরু হয়। অধিকন্তু তালাক প্রদানের সময় চিন্তা ফিকির করিয়া তালাক প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং তিন পর্যন্ত তালাক প্রদানের অনুমতি থাকে। তাহা হইলে চিন্তা ফিকির করিয়া তালাক প্রদানের সুযোগ মিলে। অনেক মানুষ এমন রহিয়াছে, যাহারা তালাক দেওয়ার পর কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রীর কতটুকু প্রয়োজন রহিয়াছে, কতটুকু অসুবিধার সৃষ্টি হইলে তালাক প্রদান করিতে হয়– তাহা ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে আসে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী তাহার মালিকানা হইতে বাহির হইয়া না পড়ে। আর মাত্র এক তালাক প্রদানের দ্বারাই বুঝ ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়া থাকে। আবার অতিরিক্ত আরও দুই তালাকের দ্বারা এই অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই জন্য তিন তালাকই যথেষ্ট।

তৃতীয় তালাক প্রদানের পর প্রথম স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য দ্বিতীয় অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শর্ত করা হইয়াছে। প্রথম স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহকে সম্পূর্ণ নতুন বিবাহ হিসাবে প্রকাশ করার এবং ইহাকে তাহার প্রথম বিবাহের প্রভাব মুক্ত করার জন্য। কেননা যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কাছে বিবাহ প্রদান করা ব্যতীতই প্রথম স্বামী তাহাকে

পুনরায় বিবাহ করিয়া লইত তাহা হইলে ইহা সাধারণভাবে ফিরাইয়া লওয়ার ন্যায় হইত। শরয়ী ভাষায় যাহাকে রজায়াত বলা হয়। কেননা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা এক প্রকার রজায়াত। সুতরাং প্রথম স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পূর্ণ নতুন বিবাহ হিসাবে প্রকাশ পাইত না। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

নারী যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর কাছে এবং তাহার নিয়ন্ত্রণে অথবা তাহার নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর স্বামীর অভিমতের প্রাধান্য থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর তাহার সামনে স্বামীর গুণাবলী বর্ণিত হইতে থাকিবে বিধায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে হয়ত স্বামীর অভিমত কবুল করিয়া লইবে। আর যদি তাহাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়ে আর দ্বিতীয় স্বামীর আচার ব্যবহারের স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। অতঃপর পুনরায় প্রথম স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিতে সম্মত হয়; তখনই তাহা হইবে প্রকৃতপক্ষে সম্মত হওয়া। তখন এই বিবাহ হইবে সম্পূর্ণ নতুন বিবাহ।

অধিকন্তু অন্য কোন ব্যক্তির সাথে দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধা হওয়া শর্ত করার দ্বারা প্রথম স্বামীকে স্ত্রীর পরিপূর্ণ বিয়োগের মজা দেখানো উদ্দেশ্য। উপরন্তু এ বিবাহের শর্ত করার দ্বারা তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে কোন জরুরী কারণ চিন্তা না করিয়া শুধু স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদার পিছনে পড়ার শাস্তি প্রদান করা হইতেছে। অন্যের সাথে দ্বিতীয় বিবাহের শর্তারোপ করার মধ্যে তিন তালাকপ্রাপ্তাকে স্বামীর দৃষ্টিতে সম্মানিত করিয়া তোলা হয়। আর এই ব্যাপারে সতর্ক করা হয় যে, তিন তালাক প্রদান করার সাহস এমন ব্যক্তিরই করা উচিত, যে স্বীয় স্ত্রীকে অন্যের বিবাহধীনে রাখিয়া পরে আবার নিজে গ্রহণ করার ন্যায় অপমানজনক ও সীমাহীন বেইয্যতির কাজে পদক্ষেপ করিবে না। বরং এই নারীর লোভ সম্বরণ করিয়া মনকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিবে।

তালাকেরজয়ী [১] দুই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ

ইসলামপূর্ব যুগে স্বামী স্ত্রীকে যত ইচ্ছা তালাক প্রদান করিয়া পুনরায়

টীকাঃ

১। তালাকে রজয়ীঃ এমন শব্দের দ্বারা তালাক প্রদান করা যাহা তালাকের

ফিরাইয়া লইত। ইহাতে নারীদের প্রতি অত্যাচার হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য তালাক সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হইল যে, الطلاق مرتان "এমন তালাক যাহার পর রজায়াত হইতে পারে তাহা মাত্র দুইবার"। অতঃপর তৃতীয় তালাক প্রদান করার পর যতক্ষণ পর্যন্ত এই নারী স্বইচ্ছায় অপর কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই নারী প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হওয়া হালাল হয় না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত করিয়াছেন যে, অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইলেই চলিবে না। বরং এই বিবাহে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসকৃতা হওয়াও একান্ত জরুরী। এই শর্তারোপের অর্থ এই নহে যে, এই নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া সহবাসকৃতা হইবে। বরং দ্বিতীয় স্বামীর সাথেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হইবে তাহার বিবাহ-বন্ধনে সর্বদা থাকার উদ্দেশ্যে। তবে যদি ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় স্বামীও তাহাকে তালাক প্রদান করে তাহা হইলে সে পুনরায় প্রথম স্বামীর বিবাহধীনে আসার সুযোগ লাভ করিবে।

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের পর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার কারণ

হযরত ইবনে কাইয়েম (রঃ)কে উল্লিখিত বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি "এলামুল মুকেয়ীন আর-রাব্বুল আলামীন" নামক গ্রন্থে ইহার জবাব লিখিয়াছেন। এখানে ইহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ লিখিয়া দেওয়া হইল।

শরীয়তের ভেদ এবং আল্লাহ পাকের ব্যাপক রহস্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিই মাত্র তিন তালাকের পর স্ত্রী হারাম হওয়ার এবং দ্বিতীয় স্বামীর

পূর্বের পৃষ্ঠার টীকাঃ

অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ বহন না করে। এই ধরনের তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত ও প্রতীক্ষাকালের মধ্যে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহধীনে লইয়া আসিতে পারে। অবশ্য দুই তালাক পর্যন্ত এই হুকুম চলিতে পারে। তিন তালাকের ক্ষেত্রে চলে না।

বিবাহের পর পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার রহস্য জানিতে পারে। এই সম্পর্কে প্রথমে একটি বিষয় অবগত হওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, উল্লিখিত বিষয়ে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির জন্য শরীয়তের কানুন ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

যেমন তাওরাত গ্রন্থের শরীয়তের কানুন ছিল যে, নারী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাহার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ-বন্ধনে ফিরাইয়া লইতে পারিত। এই নারী দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহাধীন করা কোন অবস্থায়ই বৈধ ছিল না। এই নির্দেশ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের যেসব হেকমত রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার। ইহা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না।

এই নির্দেশের হেকমতসমূহের মধ্যে এক হেকমত হইল এই যে, স্বামী যখন জানিতে পারিবে যে, যদি আমি স্ত্রীকে তালাক প্রদান করি তাহা হইলে সে নিজের ক্ষমতা নিজে লাভ করিবে। অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হওয়া তাহার জন্য বৈধ হইয়া পড়িবে। যদি সে দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধা হইয়া পড়ে তাহা হইলে তো সে আমার জন্য চিরস্থায়ী হারাম হইয়া পড়িবে। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে গিয়া এই কথাগুলি চিন্তা করার পর তালাক প্রদান হইতে বিরত হইয়া পড়িবে এবং স্ত্রীর সাথে পাকাপোক্ত সম্পর্ক করিয়া লইবে। স্ত্রী-বিয়োগ পছন্দ করিবে না।

তাওরাতের এই নির্দেশ মুসা (আঃ)-এর উম্মতের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কেননা তাহাদের মধ্যে হটধর্মিতা, সীমা লংঘন প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। তাই তাহাদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল- এইরূপ কড়া বিধান।

অতঃপর ইঞ্জিল গ্রন্থের শরীয়ত আসিল। এই শরীয়ত বিবাহের পর তালাক প্রদানের প্রথা সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ করিয়া দিল। কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করার পর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া কোন অবস্থায়ই তাহার জন্য বৈধ ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত নাযিল হইল। ইহা পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত অপেক্ষা উত্তম, অধিক পরিপূর্ণ, উচ্চ এবং মজবুত। মানবের ইহকালীন ও পরকালীন সকল সমস্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহার সবকিছু নির্মল বিবেক সম্মত। আল্লাহ পাক এই উম্মতের দ্বীন পরিপূর্ণ

করিয়াছেন এবং নিজের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি নিয়ামত পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এই উম্মতের জন্য এমন সব পবিত্র বস্তু হালাল করিয়াছেন যাহা অন্যান্যদের জন্য হালাল ছিল না। সুতরাং প্রয়োজন মোতাবেক চার স্ত্রী পর্যন্ত বিবাহ করা বৈধ করা হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল না হইলে পুরুষের জন্য অনুমতি রহিয়াছে যে, সে স্বীয় স্ত্রী তালাক প্রদান করিয়া অন্য নারীকেও বিবাহ করিতে পারে। কেননা যদি স্ত্রী তাহার মনমত না হয় অথবা স্ত্রীর দ্বারা কোন দোষণীয় কর্ম হইয়া পড়ে আর স্ত্রী তাহা হইতে ফিরিয়া না আসে– তাহা হইলে ইসলামী শরীয়ত এই ধরনের নারীকে পুরুষের হাত, পা এবং গর্দানের শৃঙ্খল বানাইয়া ইহা দ্বারা পুরুষকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখার এবং তাহার জন্য অসহনীয় বোঝা বানাইয়া রাখার বিধান জারী করে নাই। এই ধরনের নারীকে পুরুষের ঘরে রাখিয়া তাহার ঘরকে দুনিয়াতেই জাহান্নাম বানাইয়া রাখিতে চাহে নাই। কবি বলেন–

زن بد در سرائے مردنکو + همدرین عالم سب دوزخ او

"নেককার ব্যক্তির ঘরে বদকার নারী এই দুনিয়াতেই তাহার জন্য দোজখ।"

এই জন্য এই ধরনের নারী স্বামীর ঘর হইতে পৃথক হইয়া যাওয়াই আল্লাহ পাক মনজুর করিয়াছেন। আর পৃথক হইয়া যাওয়ার পন্থাও নির্ধারণ করিয়াছেন যে, পুরুষ নারীকে প্রথমে এক তালাক প্রদান করিবে। অতঃপর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন পবিত্র কাল বা তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকিবে, যাহাতে স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে। তালাকপ্রাপ্তাকে তিন মাসের সময় দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সে নিজকে সংশোধন করিয়া লয়। আর দোষণীয় আচার–আচরণ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে। ফলে তাহার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ পয়দা হয়। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ পাক এই পুরুষের অন্তরকে নারীর দিকে আকর্ষিত করিয়া দেন। আর পুরুষ নারীকে ফিরাইয়া লওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং নারীকে ফিরাইয়া লওয়ার দ্বার খোলা থাকে। গোস্বা ও শয়তানী প্রবণতার কারণে যে বিষয়টি তাহার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছিল এখন এই সময়ের ভিতর তাহা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। যেহেতু প্রথম তালাকের পরও শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া উভয় পক্ষ হইতে পুনরায় ঝগড়াবিবাদ ও শয়তানী প্ররোচনায় প্ররোচিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে, এই জন্য প্রথম তালাকের প্রতীক্ষাকালের মধ্যে দ্বিতীয় তালাক প্রদান বৈধ করা হইয়াছে, যাহাতে নারী বার বার তালাকের তিক্ততায় এবং অবস্থা বেগতিক দেখিয়া স্বীয় খারাপ আচরণ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে। আর এই খারাপ আচরণের কারণেই তো তাহার স্বামী তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত ছিল। আর ইহাই তাহাকে তালাক প্রদানে বাধ্য করিয়াছিল। এখন যখন খারাপ আচরণ ত্যাগ করিবে তখন স্বামীও তাহাকে পৃথক করা হইতে বিরত থাকিবে। এইভাবে বার বার তালাক প্রদানের দ্বারা স্বামী যখন বুঝিতে পারিবে যে, অধিক তালাক প্রদান করিলে স্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইয়া পড়িবে তখন সে এই ভয়ে তালাক প্রদান হইতে বিরত থাকিবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন তৃতীয় তালাক প্রদানের প্রয়োজন হইল আর নারী তৃতীয় তালাক প্রাপ্তা হইল। এখন আল্লাহ পাকের বিধান হইল যে, এই ব্যক্তি স্বীয় তিন তালাক প্রাপ্তাকে আর ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। এই জন্য উভয় পক্ষকে বলা হয়– প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক পর্যন্ত তোমরা পুনরায় এই বিবাহেই একে অপরের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে। কিন্তু তৃতীয় তালাক পতিত হওয়ার পর ফিরাইয়া লওয়ার সুযোগ আর নাই।

এই বিধান জারী করা হইয়াছে, যাহাতে স্বামী–স্ত্রী উভয়ে সতর্ক হইয়া সংশোধিত হইয়া যায়। কেননা স্বামী যখন চিন্তা করিবে যে, তৃতীয় তালাক প্রদানের পর তো সে স্বীয় স্ত্রী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িবে, তখন সে তৃতীয় তালাক প্রদান হইতে বিরত হইয়া পড়িবে।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ হইল যে, স্বামী যখন অবগত হইবে যে, এখন তৃতীয় তালাক প্রদান করিলে স্ত্রী সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইয়া পড়িবে। আর ইহার পর তালাক প্রাপ্তা এই নারীকে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে শরীয়তের বিধান মোতাবেক সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ প্রদান করিতে হইবে। দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে তালাক প্রদান করার পর প্রতীক্ষাকাল অতিক্রম করিলে এই নারী তাহার জন্য হালাল হইতে পারে, অন্যথায় নয়। অধিকন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বিবাহ দেওয়ার পর এই বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াও অপরিহার্য নয়। ইহা দ্বিতীয় স্বামীর মর্জির উপর নির্ভর শীল। উপরন্তু দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহই যথেষ্ট নয় বরং

দ্বিতীয় স্বামী তাহার সাথে সহবাস করা একান্ত অপরিহার্য। সহবাস করার পর যদি দ্বিতীয় স্বামী মরিয়া যায় বা স্ব ইচ্ছায় তালাক প্রদান করে আর সে নারী এই তালাকের প্রতীক্ষাকাল অতিক্রম করে তাহা হইলে প্রথম স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ করার আশা করিতে পারে– অন্যথায় নয়।

সুতরাং এইসব কিছু চিন্তা করার পর যখন স্বীয় স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়া পাওয়ার নৈরাশ্য পয়দা হইবে, তখন তাহার মধ্যে এক প্রকার দূর দৃষ্টি জন্মলাভ করিবে। ফলে সে আল্লাহ পাকের সবচাইতে অধিক অপছন্দ হালাল কাজ অর্থাৎ তালাক প্রদান হইতে বিরত থাকিবে।

অনুরূপভাবে তালাক প্রাপ্তা নারীও যখন অবগত হইবে যে, সে তিন তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর তাহার স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসার কোন পথ তাহার জন্য খোলা থাকিবে না। তখন সে তৃতীয় তালাকের ভয়ে স্বীয় অভ্যাস চরিত্র সংশোধন করিতে থাকিবে। স্বামীর সাথে আচার আচরণ ভাল করিতে থাকিবে। এই বিবাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, এই বিবাহও চিরস্থায়ী, সর্বদার জন্য। সুতরাং দ্বিতীয় স্বামী এই স্ত্রীকে আমৃত্যু নিজের কাছে রাখিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবে। কিন্তু শুধু প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করিবার উদ্দেশ্যে কৃত বিবাহের উপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করিয়াছেন। আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করিবার উদ্দেশ্যে তালাক প্রাপ্তাকে বিবাহ করিতে অন্য কাহাকেও যে সম্মত করে– এমন ব্যক্তির প্রতিও লানত করিয়াছেন–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهٗ *

"যে হালাল করে এবং যাহার জন্য হালাল করে– উভয়ের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করিয়াছেন।"

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে ঐ নারীই প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইয়াছে যাহাকে দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর ন্যায় স্ব ইচ্ছায় তালাক প্রদান করিয়াছে বা দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আর দ্বিতীয় স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার

প্রতীক্ষাকাল অতিক্রম করিয়াছে। অতঃপর প্রথম স্বামী তাহাকে পুনরায় বিবাহ করার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে।

প্রথম স্বামীর কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাওয়া জায়েয হওয়ার পথে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা ও বাধাবিপত্তি জারী করার পিছনে যেসব কারণ রহিয়াছে– তাহা হইল বিবাহের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থায়ী করার দিকটি বিবেচনা করা। কেননা স্বামী–স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহ–বন্ধন হইতে পৃথক করিয়া দ্বিতীয়বার সম্পর্ক স্থাপন করার পথে যখন এতসব প্রতিবন্ধকতা দেখিবে– তখন তৃতীয় তালাক প্রদান করিয়া স্ত্রী পৃথক করা হইতে বিরত থাকিবে। এইভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থায়ীত্ব লাভ করিবে।

আল্লামা ইবনে কাইয়েমের উল্লিখিত গ্রন্থের হাশিয়ায় লিখিত আছে যে, তিন তালাক প্রাপ্তা নারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহিতা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ–বন্ধনে আবদ্ধ হারাম। এই বিধান জারী করার ভেদ হইল– দীর্ঘ সময় স্বামীকে স্ত্রী হইতে পৃথক রাখার মাধ্যমে তাহাকে শায়েস্তা করা।

আর যে ব্যক্তি তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করিয়া দেয় তাহার প্রতি লানত করা হইয়াছে। কারণ আল্লাহ পাক প্রথম স্বামীকে শাস্তি প্রদানের যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন– এই ব্যক্তি তালাক প্রাপ্তাকে হালাল করিয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরোধিতা করিয়াছে। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে স্বামী হইতে পৃথক রাখার মাধ্যমে স্বামীকে প্রদত্ত শাস্তি পরিপূর্ণ লাভ করে যখন পৃথক রাখার কাল দীর্ঘায়িত হয়। আর ইহার ফলে এই বিষয়ে শরীয়ত প্রবর্তকের উদ্দেশ্যও অধিক পুরা হয়।

কেননা স্বামী যখন জানিতে পারে যে, তিন তালাক প্রদান করার পর এই নারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ–বন্ধনে পুনরায় আনিতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি প্রতীক্ষাকাল অতিক্রম না করিবে। অতঃপর অন্য কোন ব্যক্তির সাথে এই নারী শুধু হালাল হইবার উদ্দেশ্যে নয়; বরং বিবাহের উদ্দেশ্যেই বিবাহিত না হইবে। অতঃপর কোন কারণে দ্বিতীয় স্বামী হইতে পৃথক হইয়া পুনরায় তিনটি প্রতীক্ষাকাল অতিক্রম না করিবে। এতগুলি বিষয় চিন্তা করিবার পর

যখন সে দেখিবে যে, তিন তালাক প্রদানের দ্বারা তাহার স্ত্রী এক দীর্ঘ সময়ের জন্য তাহার থেকে পৃথক হইয়া পড়িবে। আর স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়া পাইতে হইলে তাহাকে ধৈর্য ধারণের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। এইসব চিন্তা তাহাকে তিন তালাক প্রদান হইতে বিরত রাখিবে। শরীয়তের এই বিধানটি সম্পূর্ণরূপে যুক্তি ভিত্তিক এবং মঙ্গল ও কল্যাণের অনুকূল।

তিন অপেক্ষা কম তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনার জন্য স্বামীকে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত সময় প্রদান করা হইয়াছে। ইহা শরীয়তের পক্ষ হইতে স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ ও তাহার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা। কেননা এখন পর্যন্ত সে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে নাই। ফলে স্ত্রী তাহার জন্য সম্পূর্ণভাবে হারামও হইয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে তিন তালাক প্রদানকারীকে শাস্তি প্রদানের যে বিধান চালু করা হইয়াছে ইহা এই জন্য যে, সে আল্লাহ পাকের হালাল নিয়ামতকে হারাম করিয়াছে। ইহা এত শক্ত শাস্তি যে, উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন ব্যতীত স্ত্রী তাহার জন্য সর্বদা হারাম থাকিয়া যায়।

ঈলার সময় চার মাস নির্ধারিত হওয়ার কারণ

আল্লাহ পাক বলেন–

لِلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَحِيْمٌ * وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

"যাহারা নিজেদের স্ত্রী হইতে পৃথক হওয়ার জন্য শপথ করে; তাহাদের জন্য চার মাস অপেক্ষা করা নির্ধারিত রহিয়াছে। সুতরাং যদি তাহারা এই চার মাস সময়ের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা হইতে ফিরিয়া আসে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ পাক অশেষ ক্ষমাশীল দয়াময়। আর যদি তাহারা তালাক প্রদানের জন্য পাকাপোক্ত ইচ্ছা করে (আর এইভাবে পূর্ব ইচ্ছা হইতে ফিরিয়া না আসে)। স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ পাক সবকিছু শুনেন ও জানেন।

"ঈলা" আরবী শব্দ। ইহার অর্থ শপথ করা। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের লোকেরা চিরদিন অথবা এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজেদের স্ত্রী হইতে পৃথক

থাকিতে শপথ করিত। ইহা নারীদের উপর ছিল অসহনীয় অত্যাচার ও ক্ষতিকর বিষয়। আল্লাহ পাক চার মাসের অধিক সময় ঈলা করাকে বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন। ঈলার সময় কাল চার মাস নির্ধারিত হওয়ার পিছনে অনেক ভেদ রহিয়াছে। ভেদগুলি নিম্নরূপ–

(১) চার মাসের মধ্যে পুরুষের মনে এমনিতেই সহবাসের আগ্রহ জন্মে। যদি পুরুষ পুরুষত্ব হানি বা অনুরূপ কোন রোগে রোগাক্রান্ত না হয় তাহা হইলে এই সময় পর্যন্ত সহবাস ত্যাগ করিলে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পড়ে।

(২) চার মাস এক বৎসরের এক তৃতীয়াংশ। আর ছয় মাস বৎসরের অর্ধাংশ। অর্ধাংশ বৎসরের অধিকাংশ না হইলেও অধিকাংশের মত। পক্ষান্তরে চার মাস বৎসরের এক তৃতীয়াংশ, বিধায় অর্ধাংশ অপেক্ষা কম। সুতরাং চার মাসকে অল্প সময় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। আর অল্প সময় স্ত্রী সহবাস হইতে দূরে থাকা জুলুম বা অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) যদি ঈলার সময় চার মাস অপেক্ষা অধিক নির্ধারণ করা হইত তাহা হইলে স্বামী বেপরোয়া হইয়া স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়াতে টালবাহানা করিতে থাকিত। আর ইহা স্ত্রীর জন্য বড়ই ক্ষতিকর হইত। কেননা ইহার ফলে স্ত্রীর খাওয়া, পরা এবং থাকার অসুবিধা দেখা দিত। কারণ স্বামী খোরপোষ না দিলে সে কোথা হইতে খাইবে? কোথা হইতে পরিধান করিবে? কোথায় বসবাস করিবে?

(৪) অনেক সময় এমনও হয় যে, সহবাসের পর পরই ঈলা করা হইয়া থাকে। সহবাস করার কারণে স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনাও থাকিয়া যায়। আর স্ত্রীর গর্ভ সম্পর্কে চার মাসের মধ্যেই পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হয়। এই কারণে বিধবা নারীর প্রতীক্ষাকাল চার মাস দশ দিন নির্ধারিত হইয়াছে। কারণ এই সময়ের মধ্যেই যে কোন নারীর গর্ভ সঞ্চার সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া যায়। এই অবস্থায় যদি স্বামী ঈলাকৃতা স্ত্রীকে ফিরাইয়া না আনে আর স্ত্রীও গর্ভবতী হয় তাহা হইলে এই নারীর প্রতীক্ষাকাল নির্ধারণ করা হইবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

(৫) আল্লাহ পাক সমস্ত গোপনীয় ও প্রকাশ্য রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত। ঈলার

সময়সীমা চার মাস নির্ধারণ করার পিছনে তিনি এই রহস্য রাখিয়াছেন যে, সাধারণতঃ সুস্থ কোন যুবতীর চার মাসের অধিক কোন পুরুষ ছাড়া থাকা মুশকিল হইয়া পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে তাহারা কোন পুরুষের সংশ্রব চায়।

উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফত কালের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তারীখুল খোলাফা নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে জুরায়জের বরাত দিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জুরায়জ (রঃ) বলেন- আমাকে এমন এক ব্যক্তি খবর দিয়াছেন, যাহাকে আমি সত্যবাদী বলিয়া জানি যে, হযরত ওমর (রাঃ) প্রজাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় খিলাফতের যুগে এক রাত্রে মদিনার গলিতে ঘুরিতেছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এক যুবতী রমণী কবিতার কতগুলি পংক্তি পাঠ করিতেছে, যাহার অর্থ এই-

"রাত্র গভীর হইয়াছে। ইহার আশপাশ ঘোর অন্ধকারে তিমিরাচ্ছন্ন। আমাকে আমার এই চিন্তা সজাগ রাখিয়াছে যে, আমার কোন বন্ধু নাই, যাহার সাথে আমার মনের চাহিদা মিটাইতে খেলা করিব।

আমার যদি অতুলনীয় আল্লাহ পাকের ভয় না হইত তাহা হইলে এখন আমার পালঙ্কের কিনারাসমূহ নড়াচড়া করিতে থাকিত।"

ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) উচ্চস্বরে এই নারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি চাহিতেছ? রমণী বলিল, আপনি কয়েক মাস পূর্বে আমার স্বামীকে জিহাদে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন আমি তাহার মিলনের প্রত্যাশী। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার চিন্তাধারা তো ভাল নয়। রমণী বলিল, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বলিতেছি যে, আমার চিন্তাধারা খারাপ নয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। আমি তোমার স্বামীকে আনার জন্য লোক প্রেরণ করিতেছি।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় কন্যা উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফছা (রাঃ)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি ইহার সমাধান বলিয়া দাও। বিষয়টি হইল এই যে,

কত দিন পর নারীর মধ্যে স্বীয় স্বামীর মিলনের অধীর আগ্রহ জন্মে? ইহা শুনিয়া হযরত হাফছা (র়াঃ) মাথা নীচু করিলেন। লজ্জিত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সত্য কথা বলিতে আল্লাহ পাক লজ্জাবোধ করেন না। হযরত হাফছা (রাঃ) আঙ্গুলির ইঙ্গিতে তিন মাসের কথা বলিলেন। অতঃপর বেশী থেকে বেশী চার মাসের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তাহার ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিন মাসের মধ্যে পুরুষ যেন স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়। অতিরিক্ত চার মাস।

হযরত ওমর (রাঃ) সেনাপতির নামে চিঠি লিখিলেন এবং তাগিদের সাথে বলিলেন যে, কোন সৈন্যকে যেন চার মাসের অধিক কার্য ক্ষেত্রে না রাখা হয় বরং চার মাস পরে তাহাকে ঘরে আসার সুযোগ দেওয়া হয়। এই ভাবে তিনি প্রত্যেক সৈন্যকে চার মাস পর পর ঘরে ফিরিয়া আসার সাধারণ বিধান জারী করিয়া দিলেন।

নবীগণের ওফাতের পর তাহাদের বিধবা স্ত্রীদের অন্যান্য লোকের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

নবীগণের (আঃ) জীবদ্দশায় তাহাদের দেহের সাথে রূহের যে সম্পর্ক থাকে তাহাদের মৃত্যুর পরও এই সম্পর্ক প্রায় তেমনই থাকে। এই কারণেই জীবিতদের দেহের ন্যায় তাহাদের শবদেহ ফুলে না, ফাটে না। এই বিষয়টি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর এই জন্যই জীবিত মানুষের স্ত্রীদের ন্যায় তাহাদের স্ত্রীগণও তাহাদের ওফাতের পরও অন্যের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা হওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। অনুরূপ কারণেই যেভাবে জীবিত মানুষের সম্পদে কেহ মীরাস পায় না। তাহাদের ওফাতের পরও তাহাদের সম্পদের কোন ওয়ারিছ থাকে না।

হাদীছে আসিয়াছে- لَا نُوْرَثُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমাদের কোন ওয়ারিছ নাই। পক্ষান্তরে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে-

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ

"আল্লাহ পাক তোমাদের সন্তানাদি সম্পর্কে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা তোমাদের সম্পদের এত পরিমাণ মীরাছ পাইবে।"

উল্লিখিত হাদীছ এই আয়াতের পরিপন্থী নয়। অনুরূপভাবে কুরআনে আসিয়াছে–

لَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا

"নবীর ওফাতের পর তোমাদের জন্য তাঁহার স্ত্রী বিবাহ করা বৈধ নয়।" অন্য আয়াতে আসিয়াছে–

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا

"যাহারা ওফাত পায় এবং স্ত্রী রাখিয়া যায়।" ১

এই আয়াত দ্বয়ও একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কেননা يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ এবং وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ আয়াতদ্বয় এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাদের জীবদ্দশায় দেহের সাথে রূহের যে সম্পর্ক ছিল মৃত্যুর পর সে সম্পর্ক বিদ্যমান নাই। হাদীছ আর لا ان تنك আয়াত নবীগণের সম্পর্কে যাহাদের দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক সর্বদা একই রকম। সুতরাং

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

"পিতা-মাতা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যায় উহার একাংশ পুরুষদের (পুত্রদের) জন্য।" এই আয়াতে تَرَكَ (পরিত্যাগ করিয়া যায়) শব্দ وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ আয়াতে تُوُفِّيَ শব্দ সাক্ষী যে উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এমন ব্যক্তিদের জন্য অবতীর্ণ, যাহাদের জীবদ্দশায় দেহের সাথে রূহের যে সম্পর্ক আছে ওফাতের পর সে সম্পর্ক নাই। অনুরূপভাবে

وَ لْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا

টীকাঃ

১। অত্র আয়াতে বলা হইয়াছে যে, বিধবা নারীদের প্রতীক্ষাকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্যের সাথে তাহাদের বি[illegible]

"ঐ সকল ব্যক্তিদের ভয় করা উচিত যাহারা পিছনে দুর্বল সন্তানাদি পরিত্যাগ করিয়া যায়।" এই আয়াতে উল্লিখিত تَرَكُوْا শব্দও ইহার দলীল। কেননা– تَوَفِّى শব্দের অভিধানিক অর্থ হইল মুষ্ঠির ভিতর লইয়া লওয়া, হস্তগত করা। এই অর্থ তখনই সঠিকভাবে প্রযোজ্য হয় যখন এক বস্তু হইতে অপর বস্তু বাহির করিয়া লওয়া হয়। আর আলোচ্য বিষয়ে এই শব্দের প্রয়োগ তখনই সঠিক হইবে যখন দেহ হইতে রূহ বাহির করিয়া লওয়ার অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। কেননা اَلَّذِيْنَ يَتَوَفَّى আয়াতে اَلَّذِيْنَ শব্দ দ্বারা এমন সব ব্যক্তিদের বুঝান হইয়াছে যাহাদের দেহ হইতে রূহ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। যদি মৃত্যুর সময় নির্গত বস্তু রূহ না হয় তাহা হইলে দেহকে নির্গত বস্তু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কারণ মৃত্যুর সময় রূহ এবং দেহ– এই দুইটিই বিদ্যমান থাকে। অথচ ইহা বাস্তব সত্য যে, মৃত্যুর সময় تَوَفِّى শব্দ দেহের জন্য প্রয়োগ হইতে পারে না। কারণ দেহ তো বাহির করিয়া লওয়া হয় না (বরং রূহ বাহির করিয়া লওয়া হয়।)

সুতরাং যে সকল লোকদের সম্পর্কে تَوَفِّى শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহারা এমন সব ব্যক্তি যাহাদের মৃত্যুর পর দেহের সাথে রূহের ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান নাই যে সম্পর্ক তাহাদের জীবদ্দশায় ছিল।

অনুরূপভাবে تَرَكَ (পরিত্যাগ করা) শব্দের মর্মার্থ– সন্তানাদি ও ধন-সম্পদের মহাব্বতে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সম্পর্কে তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন তাহারা এই জগত পরিত্যাগ করিয়া উর্ধ্বলোকে পাড়ি জমায়। সুতরাং এই অবস্থা তখনই হইতে পারে যখন দেহের সাথে রূহের ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে না, যাহা জীবদ্দশায় ছিল। আর যদি দেহের সাথে রূহের পূর্ব সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তখন "পরিত্যাগ করিয়াছে" এমন বলা যাইবে না; বরং এক ঘরে আবদ্ধ এমন এক ব্যক্তির সাথে তাহার তুল্য, যাহার হাত-পা বাঁধা রহিয়াছে এবং সে স্বীয় সন্তানাদির সাক্ষাৎ ও ধন-সম্পদের লেনদেন সম্পর্কে অপারগ। এই জন্যই কয়েদখানায় আবদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্র ও ধন-দৌলত তাহার মালিকানা স্বত্ব হইতে বাহির হইয়া যায় না। বরং এই অবস্থায়ও সে এইগুলির মালিক থাকে। আর অনুরূপ কারণেই অচৈতন্য ব্যক্তির স্ত্রী ও

তাহার মালিকানা স্বত্বে বহাল থাকে। (কারণ তাহাদের রূহ মর্তলোক পরিত্যাগ করে না।) তবে কয়েদী ব্যক্তি ও অচৈতন্য ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হইল যে, কয়েদী ব্যক্তির দেহ কয়েদখানায় আবদ্ধ থাকে আর অচৈতন্য ব্যক্তির নিজের দেহই তাহার কয়েদখানা।

অধিকন্তু এমন প্রসারতা যাহা এখতিয়ারভুক্ত কার্যের প্রকাশের মাধ্যমে হয় আর চন্দ্রসূর্যের প্রসারতারও তুল্য হয়– তাহা হইলেও অনেক সময় এইভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, এক বাতি আলোবিকিরণ করিতেছে। কিন্তু ইহার উপর কোন একটি পাত্র রাখিয়া দিলে ইহার আলোর প্রসারতা বন্ধ হইয়া আসে। নবীগণের মৃত্যুও হুবহু বাতির এই অবস্থার সাথে তুলনীয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অচৈতন্য ব্যক্তির কোন কোন অঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অঙ্গ হইতে রূহ বাহির করিয়া লওয়া হয়। শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তির ন্যায় তাহার সমস্ত রূহানী শক্তি বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই কারণেই অচৈতন্য ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। অনুরূপভাবে নবীগণের দেহের সাথে তাহাদের রূহের সম্পর্ক বহাল থাকে। কিন্তু এই সম্পর্ক আশপাশ হইতে জমিয়া আসে। এই জন্যই পূর্বের তুলনায় বর্তমান দৈহিক জিন্দেগীতে অধিক শক্তির সঞ্চার হয়। যেমন বাতির উপর পাত্রটি রাখিয়া দেওয়ার পর বাতির অগ্নিশিখা আরও অধিক উজ্জ্বল হইয়া পড়ে। (কেননা তখন উজ্জ্বলতা চারিদিক হইতে জমা হইয়া একত্রিত হইয়া পড়ে।)

মোটকথা; নবীগণের দেহের সাথে তাহাদের রূহের সম্পর্ক বহাল থাকে। বরং হায়াতের অবস্থার প্রসারতা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া একত্রি হওয়ার কারণে তাহাদের এই হায়াত আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। যেমন, বাতি এবং পরিবেষ্টনকারী পাত্রের অন্ধকার উভয় মিলিয়া বাতির অগ্নিশিখা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অনুরূপভাবে তাহাদের হায়াত ও মওত উভয় একত্রিত হইয়া এই হায়াত আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

সারকথা; নবীগণের হায়াত খতম হয় না। এই জন্যই তাহাদের স্ত্রীগণের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি নাই। আর এই কারণেই তাহাদের পরিত্যাজ্য সম্পদের মধ্যে উত্তরাধিত্ব সাবেত হয় না। অধিকন্তু নবীগনের সম্মানের ভিত্তিতেও এই সমস্ত বিধান জারী করা হইয়াছে। অবশ্য এক হাদীছে বলা হইয়াছে যে,

নবীগণও সম্পদ তরক (পরিত্যাগ) করিয়া যান। কিন্তু নবীগণ জীবিত থাকার দলীল প্রমাণের আলোকে বুঝা যায় যে, তরক শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়; বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত।

এক নারীর একাধিক স্বামী থাকা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

১। নারীর সন্তান যমীনের ফসলের তুল্য। কিন্তু যমীনের ফসলসমূহ যেহেতু আকৃতিতে একই ধরনের হয় সেহেতু ইহাদের বন্টন সম্ভব হয়। এই জন্যই যমীনের অংশীদারিত্বে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যদি এক নারীর স্বামীত্বে কয়েকজন পুরুষ অংশীদার হয়। তাহা হইলে বিবাহের অধিকারীত্বের স্বত্বে প্রত্যেক স্বামী সর্বক্ষণ স্ত্রীর সাথে নিজের প্রয়োজন পুরা করিবার অধিকারী হয়। এই অবস্থায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতামী ও কলহ বিবাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা এমনও হইতে পারে যে, একই সময় সকলের স্ত্রী ব্যবহারের প্রয়োজন পড়িবে। আর তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে।

বিবাহের পর যদিও বিবাহের অধিকারিত্বের বেলায় সকলে পালাক্রমে স্ত্রী ব্যবহার করিয়া কোন রকমে নিজেদের মনোবাসনা পুরণ করে কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাহা টুকরা টুকরা করিয়া সকলের মধ্যে বন্টন করা সম্ভব হইবে না। টুকরা টুকরা বন্টন করিলে বাচ্চা জীবিত থাকিবে না। এইভাবে মানুষের বংশ বিস্তার বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবুও ইহাদের সহীহ বন্টন সম্ভব নয়। কেননা সন্তান কোনটা ছেলে আবার কোনটা মেয়ে হইয়া থাকে। আবার এক প্রকার হইলে তাহাদের আকৃতি ও বর্ণ এক হয় না; বরং বিভিন্ন হইয়া থাকে। আবার আচার ব্যবহার ও চরিত্রের দিক দিয়াও পার্থক্য হয়। অধিকন্তু সাহস–ধৈর্যও এক রকম হয় না। এইসব পার্থক্যের কারণে এক সন্তান অপর সন্তানের সমতুল্য হইতে পারে না। সুতরাং যে কোন এক সন্তান গ্রহণ করিয়া স্বীয় অন্তরকে প্রবোদ দেওয়া তাহাদের জন্য সম্ভব হইবে না।

অধিকন্তু প্রত্যেক সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ–মমতা সমান হইয়া থাকে। সুতরাং অনেক সন্তানের মধ্যে একটি মাত্র লাভ করিলে যতটুকু সন্তুষ্ট হইবে অবশিষ্ট সন্তান না পাওয়ার কারণে তদাপেক্ষা অনেক বেশী দুঃখ পাইবে।

এইসব কারণে কি ফিতনা ফাসাদের সৃষ্টি হয়– তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন। মোটকথা; এই ব্যবস্থা সর্ব দিক থেকে দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিকারক।

পক্ষান্তরে এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার উদাহরণ এক কৃষক, যাহার অনেক যমীন রহিয়াছে। আর প্রত্যেক যমীনেই সে বীজ বপন করিতে পারে। অনুরূপভাবে এক স্বামী বিভিন্ন স্ত্রী থেকে বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। এই অবস্থায় শুধু একটি অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তাহা হইল স্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে অসন্তুষ্টি। অবশ্য এই অসন্তুষ্টির দ্বারা কোনরূপ ফেতনা ও কাটাকাটি মারামারির আশংকা ও ভয় নাই।

২। ইসলামী বিধান মোতাবেক নারী শাসিত আর পুরুষ শাসক। আর পুরুষ শাসক হইবে না কেন? সে তো মালিক। পুরুষকে মালিক বলা হয়। কেননা দাসী মনিবের অধীনস্থ সম্পদ হয়। অনুরূপভাবে স্ত্রীও স্বামীর অধীনস্থ সম্পদ হয়। কেননা স্ত্রীকে মহরের বিনিময়ে খরিদ করা হয়। তবে দাসীর বেলায় আযাদ করা হয়। আর স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়। অর্থাৎ দাস–দাসী স্বইচ্ছায় মনিবের অধীনস্থতা থেকে রেহাই পাইতে পারে না। বরং মনিবের ইচ্ছামত তাহারা রেহাই পাইতে পারে। মনিব যখন ইচ্ছা করে তখন আযাদ করে। অনুরূপভাবে নারীও স্বইচ্ছায় স্বামীর বিবাহ–বন্ধন হইতে পৃথক হইতে পারে না। স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে তালাক দিতে পারে। ইহা স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

মনিব যেমন দাস–দাসীর খরপোষের দায়িত্ববান, অনুরূপভাবে স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্বও স্বামীর উপর। অধিকন্তু মনিব একজন হয় আর গোলাম বাঁদী একাধিক হয়। অনুরূপভাবে এক স্বামীর অধীনেও কয়েকজন স্ত্রী থাকিতে পারে। মোটকথা; ইসলামী বিধান মোতাবেক নারী অধীনস্থ সম্পদ ও শাসিত হয় আর স্বামী মালিক ও শাসক হয়।

তবে স্ত্রী স্বামীর সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে বিক্রি করিতে পারে না বা অপরকে দান করিতে পারে না। ইহা তাহার মালিকানা স্বত্বের পরিপন্থী নয়। যদি ইহা মালিকানা স্বত্বের পরিপন্থী কোন বিষয় হয় তাহা হইলে আল্লাহ পাকের মালিকানা স্বত্বও প্রমাণিত হয় না। কারণ আল্লাহ পাকও কাহাকেও বিক্রি করেন না বা কাহারও কাছে হেবা করেন না। অথচ তিনি মালিক। সুতরাং ইহা মালিক না হওয়ার দলীল নয়। বরং মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পর

বিক্রি ও হেবার (দান) দ্বারা মালিকানা স্বত্ব হস্তচ্যুত না হওয়ার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে স্বামীর স্ত্রীকে বিক্রি না করিতে পারা স্বামীর সুদৃঢ় মালিকানা স্বত্বের দলীল, যেমন আল্লাহ পাকের মালিকানা স্বত্ব স্থানান্তরিত না হওয়া তাহার মালিকানা স্বত্বের সুদৃঢ়তার দলীল। এই জন্যই আল্লাহর মালিকানা স্বত্বের সাথে স্বামীর মালিকানা স্বত্বের পূর্ণ সামঞ্জস্যতা রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের মালিকানা স্বত্বের সামনে স্বামীর মালিকানা স্বত্ব নামে মাত্র মালিকানা। অধিকন্তু আল্লাহ পাকের মালিকানা এত মজবুত ও সুদৃঢ় যে, ইহার বিচ্যুতি কখনও সম্ভব নয়। আর স্বামীর মালিকানা স্বত্ব তালাকের মাধ্যমে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও স্বামীর মালিকানা স্বত্ব আল্লাহর মালিকানা স্বত্বের সাথে যতটুকু সামঞ্জস্যতা রাখে অন্য কাহারও মালিকানার সাথে ততটুকু রাখে না।

সারকথা; স্বামীর মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে কাহারও কোন দ্বিমত নাই; বরং অন্যান্যদের মালিকানা অপেক্ষা তাহার মালিকানা অত্যন্ত সুদৃঢ়। স্বামী শাসক, স্ত্রী শাসিত। এক শাসকের অধীনে অনেক শাসিত থাকা ইয্যত ও সম্মানের বিষয়। যে বাদশাহের প্রজা সবচাইতে বেশী সে বাদশাহ অধিক সম্মানের অধিকারী। শাসক অনেক হওয়া অসম্মানের কারণ। শাসক অধিক হওয়া উচিত নয়। তবে যদি এমন হয় যে এক শাসক উচ্চপদস্থ আর অপর জন তদাপেক্ষা নিম্নপদস্থ এবং সাধারণ লোক তাহাদের সকলের বা অধিকাংশের বা কয়েকজনের শাসিত, তাহা হইলে হইতে পারে। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য করুন; তাহারা সকল শাসকের অধীনস্থ। তাহারা কাহারও শাসক হয় না। তাহাদের অপেক্ষা নিম্নপদস্থ কেহই নাই। এক শাসক তাহার উচ্চপদস্থ শাসকের অধীনস্থ ও শাসিত হইয়া থাকে। জনসাধারনের শাসক জনসাধারণ অপেক্ষা সম্মানিত, কিন্তু তাহার উচ্চপদস্থ অপেক্ষা নিম্ন মানের হয়। এইভাবে দেখিতে থাকিলে– দেখা যায় যে, বাদশাহ সকলের শাসক। কাহারও শাসিত নয়। তাহার অপেক্ষা অধিক সম্মানিতও কেহ নাই।

সুতরাং যদি কোন নারীর একাধিক স্বামী থাকে তাহা হইলে ইহার উদাহরণ এক প্রজার, যাহার বাদশাহ ও শাসক অনেক। এক প্রজার একাধিক

শাসক কখনও হয় না। পক্ষান্তরে স্বামীর জন্য একাধিক স্ত্রী থাকা কোন দোষের কথা নয়। কেননা পুরুষ সেবা পাইয়া থাকে। আর নারী সেবা করে। এক ব্যক্তির অনেক সেবিকা হইতে পারে। কিন্তু সেবা পায় এমন অনেক ব্যক্তির জন্য এক সেবিকা হইতে পারে না।

৩। আল্লাহ পাক জন্মগতভাবে নারীদের মধ্যে লজ্জা-শরম রাখিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাহারা পুরুষদের সামনে আসিতে সংকোচ বোধ করে। নারী যখন পুরুষের সামনে কথা বলিতে থাকে তখন লজ্জায় বার বার দৃষ্টি নীচু করিয়া রাখে। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, গোটা কতেক বেহায়া নারী ব্যতীত সাধারণভাবে নারীদের স্বভাব হইল- পুরুষের সামনে পর্দা করা। তাহাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য লজ্জা। আর ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নারী মাত্র একজন পুরুষের জন্য। কারণ অনেক পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখার ফলে এই লজ্জা অবশিষ্ট থাকে না। যেমন বাজারী নারীদের লজ্জা থাকে না।

৪। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে পুরুষ কয়েক নারীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কিত হইলেও তাহাদিগকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু এক নারী দুই ব্যক্তির স্ত্রী হইয়া কখনও তাহাদের সুষ্ঠু পরিচালনা করিতে পারে না। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, এক পুরুষের কয়েকজন স্ত্রী থাকিতে পারে কিন্তু এক নারীর কয়েকজন স্বামী থাকিতে পারে না।

৫। দুনিয়াতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক থাকে। ইহা হইতেও পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষের জন্য কয়েকজন স্ত্রী থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার বিপরীত হইতে পারে না।

৬। আল্লাহ পাক পুরুষকে নারীর তুলনায় অধিক মজবুত ও শক্তিশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নারীদের দুর্বল ও হালকা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এক শক্তিশালী কয়েকটি দুর্বলকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু ইহার বিপরীত হয় না।

৭। প্রাকৃতিগত সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করুন; এক নারীর স্বামী যদি একশত হয় তাহা হইলেও সে এক গর্ভে মাত্র এক বা দুই বাচ্চা ধারণ করিতে

পারে। কিন্তু এক পুরুষের যতজন স্ত্রীই হউক না কেন সে সকলের মধ্যে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মাধ্যম হইতে পারে।

বেহেশতের মধ্যে পুরুষের জন্য একাধিক নারী থাকার এবং নারীর জন্য একাধিক স্বামী না থাকার ভেদ

এমন জিনিস পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয় যাহা আরামপ্রদ হয় এবং ইহার দ্বারা ইয্যত সম্মান বর্ধিত হয়। কিন্তু যে সকল বস্তু বিষণ্নতা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, কষ্ট প্রদায়ক হয় এবং অসম্মান ও বেইয্যতির কারণ হয় তাহা পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয় না। এই সকল বস্তু শাস্তি হিসাবে প্রদাণ করা হয়। আর বেহেশতে যাহা কিছু লাভ হইবে তাহা পুরস্কার ও বখশিশ হিসাবে লাভ হইবে। সুতরাং যদি বেহেশতে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী লাভ করে তাহা হইলে ইহা পুরস্কার ও বখশিশ হিসাবে লাভ করিবে। ইহার দ্বারা শান্তি ও আরাম অর্জিত হইবে। পক্ষান্তরে এক নারীর জন্য যদি একাধিক স্বামী থাকে তাহা হইলে আরাম ও শান্তির তো কোন কথাই হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া যখন পুরুষের শক্তি সকল স্ত্রীর শক্তির সমান করিয়া দেওয়া হইবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতের দ্বারা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন তো সম্মান ও ইয্যতের পরিবর্তে অসম্মান ও অপমান নামিয়া আসিবে।

এক নারীর জন্য একাধিক স্বামী থাকার অর্থ এক প্রজার একাধিক শাসক থাকা। শাসক অধিক হওয়া নারীর জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা। একাধিক স্বামী হওয়া যদি নারীর জন্য বৈধ হইত তাহা হইলে কোন না কোন ধর্মে ইহা বৈধ হইত। বেহেশত আরাম ও সম্মানের স্থান। অপমান ও লাঞ্ছনার এই কার্যটি তথায় বাস্তবতা লাভ করা সম্ভব নয়। তবে যদি এক স্বামীর দ্বারা প্রয়োজন না মিটিত বা এক স্বামীর সাথে সহবাস করার ফলে স্বাদ উপভোগে অভাব হইত তাহা হইলে হয়তবা তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়েতের দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, বেহেশতের একজন পুরুষকে এত শক্তি প্রদান করা হইবে যে, এক সাথে ত্রিশ ত্রিশজন নারীর সাথে সহবাস করিতে পারিবে। আল্লাহ পাক দুনিয়াতে নারীর অবস্থা ও স্বভাব পুরুষের অবস্থা ও স্বভাব হইতে ভিন্নতর করিয়াছেন। অর্থাৎ পুরুষকে শাসক আর নারীকে শাসিত। পুরুষকে মালিক আর নারীকে সেবিকা। পুরুষকে উচ্চ

আর নারীকে নীচ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে বেহেশতেও তাহাদের অবস্থা এক হইবে না বরং ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

নারীর জন্য শুধু এক স্বামী নির্ধারণ করার আরও এক কারণ

আল্লাহ পাক পুরুষদিগকে নবুয়ত, রিসালাত, খিলাফত, বাদশাহী, আমিরী প্রভৃতির মাধ্যমে নারীদের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। পুরুষদিগকে নারীদের উপর কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, কল্যান ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রায়াস চালাইতে পারে। তাহাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানের জন্য চলাফেরা করিতে পারে। বিপজ্জনক ক্ষেত্রে তাহাদের সাহায্য করিতে পারে। তাহাদের খাতিরে বন জঙ্গল ও বিশাল প্রান্তর পর্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে। নারীর জন্য কষ্ট করিতে, স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে পারে।

আল্লাহ পাক পুরুষদের এই প্রাধান্যের মূল্যায়ন করিয়াছেন। তাহাদিগকে এমন সব ক্ষমতা দিয়াছেন যাহা নারীদিগকে দেন নাই। পুরুষদিগকে এমন শক্তি দিয়াছেন যাহা নারীদিগকে দেন নাই। পুরুষগণ নারীদের সমস্যা সমাধানে এবং তাহাদের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনে যে কষ্ট ও শ্রম করে যদি তোমরা সে দিকে লক্ষ্য কর তাহা হইলে তোমাদের সামনে তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে যে, নারীদের মেহনত পুরুষের মেহনত অপেক্ষা অনেক কম। পুরুষরা মেহনত, শ্রম ও কষ্ট করার দিক দিয়া নারী অপেক্ষা অনেক আগে।

নারী পুরুষের মধ্যে এই তারতম্য আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ হেকমত এবং রহমতের ভিত্তিতে হইয়াছে। সুতরাং যখন পুরুষের কাঁধে এত অধিক পরিমাণ বোঝা দেওয়া হইয়াছে তখন ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাহাদিগকে এই পরিমাণ বোঝা বহন করার শাক্তিও দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এক পুরুষ কয়েক জন নারীর বোঝা বহন করারও ক্ষমতা রাখে। যেহেতু নারীদের কাঁধে এত পরিমাণ বোঝা দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নারীর এত পরিমাণ বোঝা বহন করিবার ক্ষমতাও নাই। এই জন্য আল্লাহ পাক নারীর স্বভাব মোতাবেক প্রত্যেক নারীর জন্য মাত্র একজন স্বামী নির্ধারিত করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায় / দাস–দাসী
(দাসত্ব–প্রথা অধ্যায়)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী দাসত্ব–প্রথার দর্শন এবং ইসলামপূর্ব যুগে দাসত্ব–প্রথার অবস্থা

যাহারা দাসত্ব–প্রথার বিরোধিতায় কলম ধরিয়াছে তাহারা জঘন্য পর্যায়ে ইহার অপকৃষ্টতা ও অপকারিতা বর্ণনা করিয়াছে। তাহারা মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এই প্রথা আগাগোড়াই সর্বপ্রকার কল্যাণ, মঙ্গল ও সৌন্দর্য বিবর্জিত। আর ইহা মানবের জন্য বড়ই ক্ষতিকর ও অপরাধী একটি প্রথা। কিন্তু যাহারা ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, আবেগ ও প্রবণতামুক্ত হইয়া এই বিষয়ে কলম ধরে অর্থাৎ যাহারা এই বিষয়ের গভীরতা পর্যন্ত পৌছিতে চায়, অপকৃষ্ট বিষয় যখন উৎকৃষ্টতার পোশাকে প্রকাশ পায়, তখন ইহার প্রতি অভিসম্পাত করিতে প্রস্তুত হয় আর কোন ভাল জিনিসকে সারা দুনিয়ার মানুষ খারাপ মনে করিলেও উহার প্রশংসা করিতে থাকে– এমন সব ব্যক্তি এই বিষয়ে কলম ধরিলে তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইবে সর্বপ্রথম এই ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করা যে, দাসত্ব–প্রথা একটি অনর্থক ও অসার বিষয়। ইহাতে কোন প্রকার উপকার নিহিত নাই। ইহা আগাগোড়াই ক্ষতিকর। এই জন্যই আমিও এই ভুল ধারণা মলোৎপাটনে কলম ধরিলাম।

ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব যে, মানব সমাজের ধাপেধাপে উন্নতির বিভিন্নি পর্যায়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দাসত্ব–প্রথা শুধু সঠিকই ছিল না; বরং দাসত্ব–প্রথা চালু করা একান্ত অপরিহার্য ছিল। এমনকি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন সব প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে– ইহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অন্তর আতঙ্কিত হইয়া উঠে। ইহা সত্ত্বেও মানবোন্নতির

অনেক দিক লক্ষ্য করিয়া এইসব প্রথা চালু রাখা জরুরী বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

একজন বিজয়ী সমর-নায়ক এক শ্বাসে এমন সব বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রের অতল গর্ভে তলাইয়া দিয়া থাকে, ফলে মানব সমাজের বাছা বাছা লোক এবং অগণিত বীর পুরুষও ত্যাগ করিতে হয়। অথবা বোমা বর্ষণের মাধ্যমে অনেক বড় বড় শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত করিয়া দেয়, যাহাতে অগণিত নিরপরাধ নারী ও শিশুও ধ্বংস হইয়া যায়। অথচ এই সময় নায়কের চক্ষু হইতে বিন্দু পরিমাণ অশ্রুপাতও হয় না। এতটুকুর পরও তাহাকে একজন কঠিন অন্তর, অত্যাচারী এবং নির্দয় নিষ্ঠুর মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত করা সহীহ হইবে না। অথচ এই সমর-নায়কের অন্তর এত বেশী দয়ামমতার ধারক যে, সাধারণ কোন কারণে কোন ব্যক্তির নিহত হওয়া তাহার ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া দেয়। এই ধরনের কোন হত্যাকাণ্ড তাহার অন্তরাত্মা কাঁপাইয়া তোলে। আর এই ব্যক্তিই অন্য সময় হাজার হাজার আদম সন্তানকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া থাকে অথবা তাহার সামনে এইরূপ হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে। ইহা দেখিয়া তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে সে এই হত্যাযজ্ঞের কারণে গৌরব বোধ করিয়া আনন্দিত হইয়া উঠে। ইহার পিছনে যে রহস্য বিদ্যমান- তাহা হইল এই যে, যুদ্ধ জিহাদ মানব সমাজের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহা মানব সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরী। তাই এত বড় হত্যাযজ্ঞের পরও সে দুঃখিত ও ব্যথিত নয়। আর এই প্রভাবটি এখনও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মানব সমাজের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মানব সমাজের বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা ইহার প্রাথমিক উন্নতির যুগে যুদ্ধ অধিক প্রয়োজনীয় ছিল। আর দাসত্ব-প্রথা যুদ্ধ-বিগ্রহেরই আনুসাঙ্গিক বিষয়। বরং প্রকৃত পক্ষে দাসত্ব-প্রথা মানব সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। এই প্রথা চালু হওয়ার পর যুদ্ধ-বন্দী হত্যার ন্যায় নির্মম ও নির্দয় এক প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

একজন খৃষ্টান লিখক লিখিয়াছেন-

কিন্তু এখন পর্যন্ত মানুষ এই কথাটি ভালভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই

যে, পূর্বকালের সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে যুদ্ধ জিহাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দায়িত্ব আদায় করিত। প্রথমতঃ এই দিক দিয়া যে যুদ্ধ জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত করা। এই উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য ইহা অত্যন্ত জরুরী ছিল যে, বিপক্ষের যত লোক বন্দী করা হইত তাহাদিগকে অধীনস্থ করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইত, যাহাতে তাহারা দ্বিতীয় বার মাথা উঠাইবার সাহস না পায়। আর এইভাবে যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ইহা সর্বস্বীকৃত যে, প্রাথমিক যুগে মানুষ মেহনত ও পরিশ্রমের কার্য হইতে পলায়ন করিতে চাহিত। সাধারণতঃ তাহারা আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিল। সুতরাং যখন এক জাতির লোক তাহাদের বিপক্ষদের মাঝে অবস্থান করিত তখন বাধ্য বাধকতা ব্যতীত কখনও কাজ করিত না। এই জন্য তাহাদিগকে দাসে পরিণত করিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ লওয়া অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় বিষয়টি এইভাবে বলা যায় যে, দুনিয়ার কোন জাতিই নিজে নিজে স্বইচ্ছায় পরিশ্রম করা অবলম্বন করে নাই। বরং প্রত্যেক দেশেই ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ অধীনস্থদিগকে কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। তাহারাই তাহাদের দ্বারা কঠোর শ্রমের কার্যগুলি সম্পাদিত করা হইয়াছে। এইভাবে যখন এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসতে ছিল তখন ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বভাবজাত হইয়া পড়িয়াছিল।

অধিকন্তু স্বাধীন ব্যক্তিদের অপরিহার্য দায়িত্ব ছিল যুদ্ধ-জিহাদ করা। আর দাসেরা পরিশ্রমের কাজগুলি করিত। ইহাদের এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর জন্য সাহায্যকারী হিসাবে ছিল। একের অবস্থান অপরের জন্য আশ্রয়, আরাম শান্তি এবং স্বীয় দায়িত্ব আদায়ের সহায় ছিল। তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার কলহ বিবাদ ও মোকাবিলা হইত না বরং উভয় শ্রেণী একে অপরের সহায়ক হইয়া মানব সমাজের উন্নতির মাধ্যম ছিল।

ইসলামে দাসের প্রতি আচরণ

ইহা বাস্তব ও সত্য যে, পশ্চিমা দেশগুলিতে মালিক চাকরের সাথে যেরূপ

আচরণ করিয়া থাকে, দাস-দাসীর প্রতি মুসলমানদের আচরণ তদাপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের। দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ ইহার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সাধারণতঃ উচ্চ মর্যাদার আসীন এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা দরিদ্রদিগকে ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলিতে এই প্রবণতাটি অধিক পরিলক্ষিত হয়। যাহারা দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করিয়াছে বলিয়া গর্ব করে যদিও তাহারা এই প্রথার নাম উচ্ছেদ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের মালিক ও চাকরের মধ্যে এখনও দাসত্ব-প্রথার পূর্ণ আচরণ পাওয়া যায়। শুধু নামের পরিবর্তন দ্বারা মূল বিষয়ের পরিবর্তন হয় না। যদি কোন উচ্চ মর্যাদাশীল পশ্চিমা ব্যক্তি অন্য জাতির কাহাকেও কর্মচারী রাখে, তাহা হইলে সে কর্মচারীর সাথে পশুর প্রতি আচরণ অপেক্ষাও জঘন্য আচরণ করে। বিশেষ করিয়া কর্মচারীর দায়িত্ব যদি নিম্নমানের হয়- তাহা হইলে তো কথাই নাই। কর্মচারী ও চাকরের প্রতি তাহাদের আচার আচরণ এতই অভদ্র ও নির্মম যে, চাকরের প্রতি তাহাদের আচরণ দেখিয়া কেহ পার্থক্যই করিতে পারিবে না যে, চাকরের প্রতি মনিবের আচরণ উত্তম, না প্রাচীনকালের দাস-দাসীর প্রতি কোন রোমীয় মনিবের আচরণ উত্তম। সম্ভবতঃ খুব কম গ্রীষ্মকালই এমন যায়, যাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে এই আওয়াজ কর্ণে পৌছে না যে, এক দরিদ্র পাখা-চালক চাকরকে তাহার মনিব এই দোষে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিয়াছে। কারণ সে পাখা চালাইতে চালাইতে ক্লান্ত হইয়া সামান্য তন্দ্রালু হইয়া পড়িয়াছিল। চাকরের প্রতি তাহাদের এইরূপ আচরণ দেখিয়া আমার বুঝে আসে না যে, তাহারা চাকরের প্রতি এমন কোন আচরণটি করিতেছে না, যাহা একজন রোমীয় মনিব তাহার দাস-দাসীর প্রতি করিত।

একজন মর্যাদাশীল খৃষ্টান স্বীয় চাকরের উপর এমন কোন অধিকার খাটাইতেছে না, যাহা একজন রোমীয় মনিব তাহার দাস-দাসীর প্রতি খাটাইত। গালিগালাজ করা তো সাধারণ ব্যাপার। মারিয়া ফেলাও কোন বিষয় মনে করিত না। সভ্যতার দাবীদার পশ্চিমা জাতিসমূহ ততক্ষণ পর্যন্ত দাসত্ব-প্রথা বিলোপের জন্য গর্ব করা উচিত নহে যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ না করিবে। অর্থাৎ তাহাদের অত্যাচার নির্যাতন ও অসদাচরণ হইতে চাকররা মুক্তি লাভ না করিবে।

যদি পশ্চিমাদের দাসত্ব-প্রথা বিলোপের উদ্দেশ্য হয়- দাস-দাসীর প্রতি মনিবের অত্যাচার ও জুলুম বন্ধ করা এবং দাস-দাসীদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা হইতে উদ্ধার করিয়া মানবের মর্যাদা প্রদান করা তাহা হইলে আমি দাবীর সাথে বলিতে পারি যে, ইউরোপ হইতে এখনও দাসত্ব-প্রথা দূর হয় নাই। এখন পর্যন্ত তাহাদের এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় নাই। অথচ চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই ইসলাম উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে সফলকাম হইয়াছে।

ইহা কি সত্য নহে যে, ইউরোপীয়রা যাহাদের দ্বারা সেবামূলক কার্য করাইয়া থাকে তাহাদিগকে পশু অপেক্ষা ভাল মনে করে না? তবে তাহারা নিজেদের কর্মচারীদের দাস না বলিয়া খাদেম বলিলে কি পার্থক্য হইল? চৌদ্দশত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইউরোপীয়রা আজ পর্যন্ত মালিক ও খাদেমের মধ্যে সম্পর্ক বুঝিতে ইসলাম হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে?

পূর্ববর্তী জাতিসমূহে গোলামীর নামে যে লাঞ্ছনা ও অবমাননা করা হইত আর বর্তমানেও দরিদ্র ও অধিনস্ত ব্যক্তিদের যে লাঞ্ছনা ও অবমাননা করা হয় ইসলাম দাসত্ব-প্রথার নামে তাহা সম্পূর্ণ রূপে দূর করিয়া দিয়াছে। শুধু শব্দের মধ্যে পরিবর্তন করা হয় নাই বরং কার্যক্ষেত্রেও ইহার শিকড় কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পর মনিব ও গোলাম এবং মালিক ও খাদেমের সম্পর্ক সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পরিণত হইয়াছে। মনিব স্বীয় গোলামের কার্যে সহায়তা করা শুরু করিল। পক্ষান্তরে গোলাম মনিবের ইযযত সম্মানে শরীক হওয়ার সুযোগ পাইল। কেননা তখন এই বিধান চালু হইয়াছিল যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মনিবের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই বিধান শুধু এমন মনিবের জন্যই প্রযোজ্য ছিল না যাহারা সমাজে অপেক্ষা কৃত নিম্ন শ্রেণীর বরং অধিক সম্মানিত ও বিত্তশালী মনিবের জন্যও প্রযোজ্য ছিল। সর্বপ্রথম আমাদের কুরআনে পাকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করা উচিত যে, ইহা দাস-দাসীর সাথে কিরূপ আচরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছে? এই সম্পর্কে কুরআনে পাকের নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়াত-

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى

وَ الْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا *

"তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাহার সাথে কাহাকেও শরীক করিও না। পিতা-মাতা, নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বে উপবেশনকারী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তিদের ভাল বাসেন না যাহারা অহংকার করে (অর্থাৎ অন্যান্যদের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি না রাখে)। আর নিজকে বড় মনে করে (অর্থাৎ অন্যকে ঘৃণা করে)। (নিসা ৩৬ আয়াত)

অত্য আয়াতে দুই প্রকারের আহকাম এক স্থানে একত্রিত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করা আর তাহার সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা। দ্বিতীয় হুকুমের মধ্যে এমন কিছু লোকের কথা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহাদের সাথে সদাচরণ করা উচিত। তাহাদের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হইল তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা। আল্লাহ পাক উভয় হুকুম একত্রে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হইল- ইসলামে আল্লাহর ইবাদত করা ও তাহার সাথে শরীক না করা যেমন অপরিহার্য, তাঁহার সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করাও অনুরূপভাবে অপরিহার্য। উল্লিখিত বিষয়দ্বয় শরীয়তের অতি গুরুত্বপূর্ণ দুইটি অঙ্গ। এক- আল্লাহ পাকের সাথে সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি করা। দুই- তাঁহার সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা।

দাস-দাসীর প্রতি আচারণ সম্পর্কে ইঞ্জিল যেখানে এক শব্দও বলে নাই কুরআন সেখানে এই বিষয়টি পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ন্যায় জরুরী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। উভয়ের কথা একই শব্দে বর্ণনা করিয়াছে। দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ করার এত পরিষ্কার নির্দেশ করিয়াছে যে, ইসলামের কোন দুশমনও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

হ্যালী 'ডিকসেনারী অফ ইসলাম' নামক গ্রন্থে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট যে, দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করার জন্য কুরআন ও হাদীছে খুব শক্তভাবে তাগিদ করা হইয়াছে। অধিকন্তু দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব

সম্পর্ক স্থাপনের যে ধারা ইসলাম কায়েম করিয়াছে- তাহাও সদাচরণের ভিত্তিতেই করা হইয়াছে। যেমন স্বাধীন নারী ও দাসের এবং স্বাধীন পুরুষ ও দাসীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হওয়ার বিধান চালু করা হইয়াছে। এক মুশরিক নারী ও মুসলমান দাসী উভয়ের মধ্যে দাসী বিবাহকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এক মুশরিক পুরুষ ও মুসলমান দাসের মধ্যে দাসের বিবাহকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পদে পদে দাস-দাসী মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দাস-দাসীর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করার প্রথা চালু করিয়া বুঝাইয়াছে যে, দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ করা এবং তাহাদের মুক্তি দান করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় কার্য।

দাসী যদি বিবাহিতা হওয়ার পরও ব্যভিচার করে তাহা হইলে তাহার শাস্তি স্বাধীন ব্যভিচারিণীর শাস্তি অপেক্ষা অর্ধেক নির্ধারিত করা হইয়াছে। দাসের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে-

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ
يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে অবিবাহিতদের এবং তোমাদের নেককার দাস-দাসীদের বিবাহ করাইয়া দাও। যদি তাহারা দরিদ্র হয় তাহা হইলে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে বিত্তশালী করিয়া দিবেন।

(নূর- ৩২ আয়াত)

ইসলামপূর্ব যুগে দাস-দাসীদের প্রতি যে সব জঘন্য আচরণ করা হইত ইসলাম সেগুলি দূরীভূত করিয়াছে। তাহাদের জঘন্য আচরণসমূহের মধ্যে একটি হইল- তাহারা দাসীদের মাধ্যমে দেহ ব্যবসা করিয়া ধন উপার্জন করিত। কুরআনে পাকে শক্তভাবে তাহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইল।

এখন আমাদের উল্লিখিত আহকামগুলি সম্পর্কে খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার অনুসারীগণ উল্লিখিত আহকামগুলি হইতে কি বুঝিয়াছেন এবং এই সকল হুকুমের উপর কেন আমল করিয়াছেন? এই উদ্দেশ্যে হাদীছসমূহে রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এবং আমল দেখা চাই। হাদীছসমূহ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পরিমাণ জোর দিয়াছেন এবং নিজেও তাহাদের প্রতি সদাচরণের যে নমুনা পেশ করিয়াছেন তুলনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, অন্য কোন সংশোধনকারী বা সংস্কারক তাহার অনুপাতে কিছুই করে নাই। এই সম্পর্কে আমি সর্বপ্রথম বোখারী শরীফের হাদীছসমূহ উল্লেখ করিব। অতঃপর অন্যান্য হাদীছঃ

اِنَّ اَخَوَانكُمْ خَدَمُكُم جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَ لْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَ لَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ *

"তোমাদের ভ্রাতারা তোমাদের খাদেম। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে তোমাদের হাতের নীচে করিয়া দিয়াছেন। যাহার ভ্রাতা তাহার হাতের নীচে (অধীনস্থ হইয়া) থাকে তাহার উচিত, সে যেন তাহাকে নিজে যাহা আহার করে তাহা হইতে আহার করায় এবং নিজে যাহা পরিধান করে তাহা হইতে পরিধান করায়। তাহার সামর্থ্যের বাহিরে তাহাকে কোন দায়িত্ব দিও না। যদি তাহার সামর্থ্যের উর্ধ্বে তাহাকে কোন দায়িত্ব দাও তাহা হইলে তাহাকে সহায়তা করিও।"

দেখাও; দুনিয়াতে মানুষের জন্য এমন কোন্ সহানুভূতি প্রদর্শক অথবা সংশোধনকারী রহিয়াছে যে মনিব ও দাসের মধ্যে এমন পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব কায়েম করিতে পারিয়াছে? আর ইহা শুধু শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কার্যে পরিণত করিয়া পর্যন্ত দেখাইয়াছেন যে, মনিব এবং দাসের খাদ্য ও পোশাক অভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে বরং দাসের মর্যাদা দেখিয়া ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। যেমন এক সাহাবী নিজেই বলিতেছেন–

وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْحَج وَ بِرُّ اُمِّى لَاَحْبَبْتُ أَنْ اَمُوْتَ وَ اَنَا مَمْلُوْكٌ

"ঐ সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার হাতে আমার প্রাণ, যদি আল্লাহর

রাস্তায় জিহাদ, হজ্জ এবং মায়ের খেদমত না হইত, তাহা হইলে আমি দাস হইয়া মৃত্যুবরণ করাকে পছন্দ করিতাম।"

দাস-দাসী দ্বারা সেবা করানো এবং তাহাদের সাথে ভাল ব্যবহার করাই তাহাদের প্রতি সদাচরণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বরং তাহাদিগকে ভালভাবে প্রতিপালন করার জন্যও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٌ كَانَتْ لَهٗ جَارِيَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَ اَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا فَلَهٗ اَجْرَانِ *

"রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যাহার কাছে দাসী আছে, আর সে তাহাকে আদব শিক্ষা দিল, অর্থাৎ তাহাকে উচ্চ পর্যায়ের সুচরিত্র শিক্ষা দিল, তাহাকে খুব উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করিল, অতঃপর তাহাকে আযাদ করিয়া দিল এবং তাহাকে বিবাহ করিল, এই ব্যক্তি দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ করিবে।"

যাহারা বলে যে, ইসলাম নারীদের মুর্খ রাখিতে চায়, বিশেষ করিয়া এমন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের আমি এই হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য বলিতেছি। একটু চিন্তা করিলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, স্বাধীনা নারীদের তো কথা নাই। এমন কি দাসীদের সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদিগকে যেন খুব ভালভাবে আদব আখলাক শিক্ষা দেওয়া হয়। দাস-দাসীদের উন্নতির কোন্ পর্যায় পর্যন্ত পৌছানো ইসলামের মূল লক্ষ্য- তাহা এই হাদীছ হইতে খুব পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়। ইহা ব্যতীতও আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে, যাহাতে দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণের তাকীদ করা হইয়াছে।

তন্মধ্যে 'তরজমায়ে আলফে লায়লা' নামক গ্রন্থে ইহাদের কয়েকটি হাদীছ মিশকাত শরীফের বরাত দিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলি আবার হ্যালী 'ডিকশেনারী অফ ইসলাম' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ইহাদের কোন কোনটার অনুবাদ এখানে লিখিয়া দিতেছি।

"স্বীয় গোলামকে এমন খাদ্য আহার করাও যাহা তোমরা খাও। আবার এমন পোশাক পরিধান করাও যাহা তোমরা পরিধান কর। তাহাদের সামর্থ্যের বাহিরে কোন কাজ তাহাদের দায়িত্বে দিও না।"

"যে ব্যক্তি অকারণে স্বীয় গোলামকে মারে অথবা তাহার মুখের উপর চপেটাঘাত করে; এই গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়াই তাহার অপরাধের কাফফারা।"

"যে ব্যক্তি স্বীয় গোলামের প্রতি নির্মম আচরণ করে সে বেহেশতে যাইবে না।"

"যে ব্যক্তি মাতা হইতে সন্তানকে পৃথক করিয়া ফেলে (দাসী বিক্রী করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে) কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক তাহার বন্ধুদিগকে তাহার থেকে পৃথক করিয়া ফেলিবেন।"

উল্লিখিত হাদীছসমূহ হইতে পরিষ্কার ও দৃঢ়ভাবে বুঝা গেল যে, ইসলাম দাসকে দাস হিসাবে গণ্য করে নাই, বরং তাহার দায়িত্বে অর্পিত কাজ ব্যতীত অন্য সর্বক্ষেত্রে তাহাকে মনিবের সমকক্ষ গণ্য করা হইয়াছে। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এক মহানুভূতিশীল মানব সন্তান সর্বপ্রথম এই সমস্ত কানুন শুধু জারীই করেন নাই বরং নিজে আমল করিয়া এবং অন্যের দ্বারা করাইয়া এই সমস্ত কানুন বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু আজ চৌদ্দশত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং নিজেদেরকে দুনিয়ার বড় বড় সহানুভূতিশীল বলিয়া দাবী করার পরও কোন ব্যক্তি এই সমস্ত কানুন মোতাবেক আমল করা তো দূরের কথা বরং এই শ্রেণীর কোন কানুন জারী করারও সাহস পায় নাই।

এখানে এমন আরও কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি যাহা অধ্যয়ন করার পর পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিবেন যে, দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ তাগীদ করিয়াছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারক হইতে নিম্নোক্ত বাণী বাহির হইয়া আসিয়াছিল- اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ। "বিশেষ করিয়া তোমরা নামাযের প্রতি ও দাস-দাসীদের সদাচরণের প্রতি খেয়াল রাখিও।"

এই হাদীছ কত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিতেছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে মানুষের জন্য বিশেষ করিয়া ঐ মানব-শ্রেণী, যাহাকে দুনিয়ার সকল সম্প্রদায় অপদস্থ ও নীচ বলিয়া মনে করে এবং এখনও মনে করিতেছে (অর্থাৎ দাস-দাসী), তাহাদের জন্য কত গভীর ভালবাসার আবেগ এবং তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের কত অধিক চিন্তা ফিকির ছিল যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাদের অধিকারের প্রতি দুনিয়াবাসীকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি তাহাদের সম্পর্কে কি চাহিতেছেন।

এক ব্যক্তির ঘটনাঃ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি দাস-দাসীকে কতবার ক্ষমা করিব? ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া ফেলিলেন। তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। সে দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করিল। এইভাবে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবারও উত্তর দিলেন না; বরং বার বার মুখ ফিরাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করিল তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-

اُعْفُ عَبْدَكَ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ *

"তুমি প্রতিদিন তোমার দাসকে সত্তরবার ক্ষমা কর।"

এখন আমার জিজ্ঞাসা যে, বর্তমানে যাহারা নিজেদেরকে উন্নত ও সুসভ্য জাতি বলিয়া হাঁক ছাড়িতেছে, তাহাদের মধ্যে কি এমন এক ব্যক্তিও রহিয়াছে যে, স্বীয় দাসকে অপরাধী পাওয়ার পর রোজ সত্তরবার ক্ষমা করিতে পারে? অথচ ইসলামে দাস-দাসীর ক্ষেত্রে এই আমল বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। দাসকে দাস বলিয়া ডাকা হউক- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। কেননা গোলাম শব্দের মধ্যে অবজ্ঞার ভাব রহিয়াছে। শব্দের দ্বারা কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হউক- তিনি তাহা কখনও পছন্দ করিতেন না। এই সম্পর্কে বোখারী শরীফে এক হাদীছ বর্ণিত আছে-

لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَ اَمَتِى وَ لْيَقُلْ فَتَاىَ وَ فَتَاتِىْ وَ غُلَامِيْ

"তোমাদের কেহ আমার দাস, আমার দাসী– এমন বলিও না। বরং এইরূপ বলিও; আমার যুবক, আমার যুবতী।"

হাদীছে উল্লিখিত فتى (ফাতান) শব্দটির অর্থ যুবক বা যুবতী। অনুরূপভাবে غلام (গোলাম) শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাদীছের মধ্যে عبد (আবদ) এবং امة (আমাত) শব্দ ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ শব্দদ্বয় সাধারণভাবে দাস এবং দাসীর অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর দাস–দাসীকে যেসব শব্দে ডাকার জন্য হাদীছে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে– এইসব শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বাধীন পুরুষ ও নারীর জন্যও এইসব শব্দ ব্যবহৃত হয়।

এই নির্দেশানুযায়ী আমল হইত, না হইত না– এখন আমি এই বিষয়টি আলোচনা করিব। আর যদিও আমল হইত তাহা হইলে কি পরিমাণ হইত ইহাও আলোচনায় স্থান পাইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে আলোচনা শুরু করার পূর্বে একটি সংশয় দূরীভূত করা অত্যন্ত জরুরী মনে করিতেছি।

সংশয়টি হইল এই যে, যেহেতু দাস–দাসীদিগকে এত অধিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের বিষয়টি এত অধিক বিবেচনা করা হইয়াছে– যেমন, উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, তাহা হইলে মনিব ও দাসের মধ্যে পার্থক্য রাখারই কি প্রয়োজন ছিল? বরং মনিব ও দাস একই পর্যায়ের গণ্য করাই সঙ্গত ছিল। এই সংশয়ের সমাধান রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছেই রহিয়াছে। সহীহ বোখারী শরীফের এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَّ هُوَ مَسْئُول عَنْهُمْ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وَلَدِهٖ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَال ... وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ *

"তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককে তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সুতরাং এক আমীর তাহার অধীনস্ত প্রজাদের উপর দায়িত্বশীল। তাহাদের সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। এক ব্যক্তি তাহার পরিবার–পরিজনের উপর দায়িত্ববান। তাহাদের সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। এক নারী তাহার ঘরের লোকদের এবং সন্তানাদির উপর দায়িত্বশীলা। সুতরাং তাহাদের সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে। এক গোলাম তাহার মনিবের ধন–সম্পদের দায়িত্ববান। সুতরাং এই সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হইবে।"

এই হাদীছের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের দায়িত্বে পৃথক পৃথক কাজ ন্যাস্ত রহিয়াছে। এক এক দিক দিয়া এক একজন দায়িত্বশীল। আবার অন্য দিক দিয়া সে অন্যের দায়িত্বাধীন। ইসলাম মানুষের মধ্যে সমতার শিক্ষা প্রদান করে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, বড়–ছোটর মধ্যে পার্থক্য পর্যন্ত উঠিয়া যাইবে। দুনিয়ার কাজ কারবার বন্ধ হইয়া যাইবে। বরং ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে যে, সকলের দায়িত্ব থাকিবে পৃথক পৃথক। আবার সমাজে থাকিবে বড়–ছোটর মধ্যে পার্থক্য। ইহা সত্ত্বেও আদম সন্তান হওয়ার দিক দিয়া এবং পরস্পর পরস্পরের ভাই হওয়ার দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে সমতাও বজায় থাকিবে।

ইসলামের পবিত্র শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, মনিব দাসের দায়িত্ব নীচ ও হীন মনে করিয়া কখনও ইহাতে হাত লাগাইবে না। আর মনিবের কাজ ও দাসের সম্মান অপেক্ষা অনেক উচ্চতর মনে করা হইবে; বরং ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রয়োজনের তাগিদে মনিব নিজেও গোলামের কার্যে সাহায্য সহযোগিতা করিবে। আর মনিব যেসব বিষয়ে লাভবান হইতেছে গোলাম যেন তাহা হইতে বঞ্চিত না থাকে। অবশ্য তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও বহাল রাখা হইয়াছে যে, মনিবের উচিত দাসের সাথে সদাচরণ করা, তাহার প্রতি অনুগ্রহ করা। আর দাসের কর্তব্য হইল– সত্য ও অকপট অন্তরে মনিবের অনুগত থাকা। তাহার দায়িত্বে ন্যাস্ত কার্যসমূহ আদায় করা। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে তাহারা সমপর্যায়ভুক্ত।

এখন আমি এমন কতক উদাহরণ পেশ করিব যাহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একজন শিক্ষকই ছিলেন না বরং

নিজে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি পবিত্র নমুনাও ছিলেন। এই কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলমানদের উপর তাহার শিক্ষার খুব মজবুত প্রভাব পড়িয়াছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় খাদেমদের সাথে সদাচরণ করিবার ঘটনাসমূহ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ আমি দশ বৎসর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি আমার সম্পর্কে উফ্‌ও বলেন নাই। যখন আমি কোন কাজ করিয়া ফেলিতাম তখন তিনি আমাকে বলিতেন না যে, তুমি কেন ইহা করিয়াছ? আর যদি কোন কাজ না করিতাম তখন বলিতেন না যে, তুমি কর নাই কেন? সমস্ত দুনিয়ার সদাচরণ অপেক্ষা তাঁহার সদাচরণ অনেক উর্ধ্বে ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন খাদেমকে বা কোন নারীকে কখন মারধর করেন নাই। তাহার সত্যিকার মুখলেছ সাথীরাও তাহাকে কদম কদম অনুসরণ করিতেন।

একবারের ঘটনাঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অনেক যুদ্ধ–বন্দী পৌঁছিয়াছে। তিনি আবুল হাছইয়াম (রাঃ) নামক জনৈক সাহাবাকে যুদ্ধ–বন্দীদের থেকে এক গোলাম দান করিলেন। আর এই গোলামের প্রতি সদাচরণ করিবার নসিহতও করিলেন। হযরত আবুল হাছইয়াম (রাঃ) গোলামটি লইয়া ঘরে গেলেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই গোলামটি দান করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি সদাচরণ করিবার জন্য উপদেশও দিয়াছেন। স্ত্রী বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উপদেশ মোতাবেক আপনি পুরাপুরি আমল কিভাবে করিতে পারিবেন? তবে এই গোলামটি আযাদ করিয়া দিলে তাহা সম্ভব হইবে। হযরত আবুল হাছইয়াম (রাঃ) তৎক্ষণাৎ গোলামটি আযাদ করিয়া দিলেন।

যামবা' স্বীয় গোলামকে এক দাসীর সাথে দেখিতে পাইয়া তাহার নাক কাটিয়া ফেলিল। গোলাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হইল। তিনি তাহার এই অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কে করিয়াছে? গোলাম বলিল, যামবা' আমার এই অবস্থা করিয়াছে।

সুতরাং তখনই যামবা'কে ডাকাইয়া আনা হইল। যামবা' উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন যে, তুমি মুক্ত। তিনি গোলাম আযাদ করিয়া যামবা'কে গোলামের মূল্য দিয়া দিলেন। গোলাম বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কাহার মুক্ত' দাস বলিয়া গণ্য হইব? (তাহার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইল যে, তাহার সাহায্য সহানুভূতিকারী কে হইবে?) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মুক্তদাস।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এই গোলাম হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর কাছে আগমন করিয়া ঘটনাটি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার এবং তাহার পরিবার পরিজনের জন্য ভাতা নির্ধারিত করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর ওফাতের পর সে হযরত ওমর (রাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– তুমি কোথায় থাকিতে চাও? গোলাম বলিল, মিশরে। হযরত ওমর (রাঃ) মিশরের গভর্ণরকে চিঠি লিখিয়া দিলেন যাহাতে তাহাকে জীবন–যাপনের উপযোগী কোন জমি দান করিয়া দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ! কেমন পবিত্র অঙ্গীকার আর কেমন পবিত্র অঙ্গীকার পূরণ।

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি একদা স্বীয় গোলামকে মারিতেছিলাম। হঠাৎ করিয়া পিছন হইতে আওয়াজ শুনিলাম। হে আবু মাসউদ! স্মরণ রাখিও তুমি তাহার উপর যতটুকু শক্তি রাখ, আল্লাহ তোমার উপর তোমার অপেক্ষা অধিক শক্তি রাখেন। আবু মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম যে, তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এখন তাহাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি তাহাকে আযাদ না করিতে তাহা হইলে তুমি অগ্নিতে পতিত হইতে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একদা এক ব্যক্তি

সওয়ার হইয়া চলিয়াছে। তাহার গোলাম পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আসিতেছে। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তাহাকে তোমার পিছনে বসাইয়া লও। কেননা সে তোমার ভাই। তাহার আত্মাও তোমার আত্মার ন্যায়।

মারুর বলেন– আমি আবু যর (রাঃ)–কে দেখিলাম যে, তিনি নতুন.উত্তম পোশাক পরিহিত আছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একদা আমি এক গোলামকে গালমন্দ করিয়াছিলাম। সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার নামে বিচার দাবী করিল। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি তাহাকে তাহার মাতা সম্পর্কে লজ্জিত করিয়াছ। অতঃপর বলিলেন– তোমাদের গোলাম, চাকর–বাকর তোমাদের ভ্রাতা। সুতরাং যাহার ভ্রাতা তাহার অধীনস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উচিত সে যেন তাহাকে এমন খাদ্য আহার করায় যাহা সে নিজে আহার করে আর এমন পোশাক পরিধান করায় যাহা সে নিজে পরিধান করে। তোমরা নিজেদের গোলামকে এমন কাজ দিও না যাহা সম্পাদন করার শক্তি তাহার নাই। যদি এমন কাজ দাও তাহা হইলে নিজে তাহার কার্যে সহযোগিতা করিও।

হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক গোলামের অবাধ্যতার কারণে তাহার কান মোচড়াইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর নিজের কাজের জন্য লজ্জিত হইয়া তাওবা করিলেন। আর গোলামকে বলিলেন, তুমিও অনুরূপভাবে আমার কান মোচড়াইয়া দাও। গোলাম অস্বীকার করিল। কিন্তু তিনি বার বার গোলামকে তাকিদ করিলেন। তখন গোলাম তাহার কান ধরিয়া আস্তে আস্তে মোচড়াইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, আস্তে নয় বরং খুব জোরে মোচড়াও। কেননা আমি কিয়ামতের দিনের শাস্তি সহ্য করিতে পারিব না। গোলাম বলিল, হে আমার প্রভু! আপনি যে দিনের ভয় করিতেছেন আমিও সে দিনেরই ভয় করিতেছি।

হযরত যয়নুল আবেদীন (রঃ)–এর কথাঃ একদা তাহার এক গোলাম তাহার একটি ভেড়ার একটি পা ভাঙ্গিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি এইরূপ করিলে কেন? গোলাম বলিল, আপনাকে রাগান্বিত করিবার জন্য। তিনি বলিলেন, যে তোমাকে এই পরামর্শ দিয়াছে তাহাকে (অর্থাৎ শয়তানকে) রাগান্বিত করিয়া ছাড়িব। যাও, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি মুক্ত।”

গোলামদিগকে অথবা আযাদকৃত গোলামদিগকে বড় বড় পদে নিযুক্ত করা হইত। হযরত উসামা (রাঃ) হযরত যায়দ ইবনে হারিছার পুত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে একদল সেনার প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহিনী রওয়ানা করিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করিলেন। জনসাধারণ হযরত আবু বকর (রাঃ)–কে পরামর্শ দিলেন, যাহাতে হযরত উসামার (রাঃ) পরিবর্তে অন্য কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। ইহাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) খুব অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন যে, আমার প্রিয় মনিব যে কাজ করিয়াছেন, আমি তাহা রহিত করিয়া দিব? সেনাবাহিনী রওয়ানা করিবার সময় তিনি পদব্রজে চলিলেন। তখন হযরত উসামা সওয়ার ছিলেন। তিনি আরয করিলেন, হে রাসূলুল্লাহর খলীফা! আপনিও সওয়ার হইয়া চলুন। অথবা আমাকেও পদ্রব্রজে চলার অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার প্রস্তাব মানিয়া লইলেন না; বরং কিছু দূর পর্যন্ত এইভাবে তাহার সাথে সাথে পদব্রজে চলিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন মিশর বিজয়ের ইচ্ছা করিলেন তখন প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সন্ধির প্রস্তাব দিয়া মিশরের শাসন কর্তার কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন হযরত উবাদা (রাঃ)। তিনি হাবশী ছিলেন। আর তৎকালে হাবশীরা গোলামের ন্যায় বাজারে বেচাকেনা হইত। প্রতিনিধি দল মিশরের শাসন কর্তার সামনে উপস্থিত হইলে শাসনকর্তা তাহাকে দেখিয়া বলিল যে, এই হাবশীকে বাহির করিয়া দাও। প্রতিনিধি দল বলিল যে, তিনি তো আমাদের নেতা। তিনি যাহা কিছু বলেন বা করেন আমরা তাহা মানিয়া চলি। ইহা শুনিয়া মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিস অবাক হইয়া গেল। সে বলিল, তোমরা এক হাবশীকে কিভাবে নিজেদের নেতা নির্বাচিত করিলে? প্রতিনিধি দলের লোকেরা বলিলেন, কোন সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বা বর্ণের ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে নেতৃত্ব লাভ হয় না। বরং যোগ্যতা ও উত্তমতার ভিত্তিতে লাভ হয়। আর তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম।

হযরত ওমর (রাঃ)–এর ন্যায় বাদশাহের গোলামের প্রতি আচরণের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে গোলামের

মর্যাদা কতটুকু ছিল? আর তাহারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথায় কথায় কিভাবে আমল করিতেন?

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) বায়তুল মাকদাস অবরোধ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত শহরবাসী সন্ধির প্রস্তাব পেশ করিল। তাহারা প্রস্তাব দিল যে, যদি হযরত ওমর (রাঃ) নিজে আসিয়া সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তাহা হইলে তাহারা মুসলমানদের হাতে শহর অর্পণ করিবে।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) আমীরুল মুমিনীনের কাছে চিঠি লিখিলেন। চিঠি পাইয়া হযরত ওমর (রাঃ) সাথে সাথে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার সাথে তাহার গোলামও ছিল। অধিকন্তু উভয়ের সওয়ার হিসাবে উট ছিল মাত্র একটি। এই জন্য খলীফা এবং গোলাম পালাক্রমে উটের উপর চড়িতেন। যখন যাহার উটে চড়ার পালা হইত না তখন তিনি পদব্রজে পথ চলিতেন। তিনি যখন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-এর ছাউনীর কাছে পৌছিলেন, তখন ছিল গোলামের সওয়ার হওয়ার পালা। হযরত ওমর (রাঃ) উট হইতে নামিয়া আসিলেন। গোলামকে সওয়ার করাইলেন। আর তিনি পদব্রজে তাহার সাথে সাথে চলিলেন। সকলের দৃষ্টি তাহাদের দিকে।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর পদব্রজে আগমন দেখিয়া আশংকা করিতে লাগিলেন যে, না জানি এই অবস্থা দেখিয়া বায়তুল মাকদাস শহরবাসীর উপর কোন বিপরীত প্রভাব পড়ে আর তাহারা পুনরায় যুদ্ধ শুরু করিয়া দেয়। তাই তিনি সামনে বাড়িয়া আরয করিলেন, সকলের দৃষ্টি আপনার দিকে নিবদ্ধ। এই অবস্থায় গোলামকে সওয়ার করাইয়া আপনি নিজে গোলামের ন্যায় হাঁটিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি না। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার কথা শুনিয়া রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, তোমার পূর্বে কেহই আমাকে এইরূপ বলে নাই। আমরা সকলের চাইতে অপমানিত ও অপদস্থ ছিলাম। আল্লাহ পাক ইসলামের মাধ্যমে আমাদিগকে উচ্চ করিয়াছেন, সম্মান দিয়াছেন। সুতরাং যে ইসলাম আমাদিগকে সম্মান দান করিয়াছেন। যদি আমরা ইহার পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাস্তা অনুসরণ করি তাহা হইলে আল্লাহ পাক আমাদিগকে অপমানিত করিয়া ছাড়িবেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল যে, ইসলাম আমাদিগকে

এই শিক্ষা দিয়াছে যে, আমরা যেন নিজেদের দাস-দাসীকেও নিজেদের সমমানের মনে করি। যদি আমরা তাহাদিগকে সমমর্যাদা প্রদান করা নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা মনে করি- তাহা হইলে আল্লাহ পাক আমাদিগকে অসম্মানিত করিবেন। কারণ তখন তো আমরা তাহার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগকারী বলিয়া গণ্য হইব।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, বর্তমানে দুনিয়াতে কি এমন কোন বিজয়ী আছে অথবা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র কোন রাজ্যেরও এমন কোন শাসনকর্তা আছে অথবা উচ্চ পদস্থ এমন কোন লোক আছে কি, যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় অনুরূপ কোন আচরণ প্রদর্শন করিতে পারে? অথবা ইসলামের এই মহা সম্রাট সদাচরণের যে নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করিতে পারে- এমন কেহ আছে কি?

নব বিজিত এক দেশে বিজয়ী ব্যক্তি কতটুকু প্রতাপ প্রদর্শন করা প্রয়োজন এই সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) কি অবগত ছিলেন না? ইহা অসম্ভব যে, তিনি ইহা অবগত ছিলেন না। বরং এই বিষয়টি তিনি যতটুকু বুঝিতেন অন্য কেহ তদাপেক্ষা অধিক বুঝিতেন না। কিন্তু ইসলামী আহকামের সত্যিকার গুরুত্ব তিনি অন্তর দ্বারা অনুধাবন করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ইসলাম নির্ধারিত তরীকা অনুযায়ী নিজকে পরিচালিত করার মধ্যেই প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি নিহিত রহিয়াছে। যেহেতু পরবর্তী কালে মুসলমানরা দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর সাথে এই প্রকার আচরণ পরিত্যাগ করিয়াছে- সেহেতু তাহাদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অভিমতই বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। তাহারা ইসলামী তরীকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য তরীকায় ইয্যত সম্মান তালাশ করিয়াছে। তাই তাহারা সম্মানহারা হইয়াছে। এখনও দুনিয়ার যে যে স্থানের মুসলমানরা অমুসলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দুনিয়াতে সম্মানিত হইতে চাহিতেছে এবং ইসলামী তরীকাসমূহ ঘৃণার চোখে দেখিতেছে- তাহাদের এই কথাটা স্মরণ রাখা উচিত (যে, ইসলামী তরীকা বর্জন করিয়া তাহারা কখনও সম্মানিত হইতে পারিবে না)।

সাহাবা, পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমলী ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি দেখা দেওয়া এবং কালের আবর্তনে তাহাদের রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

শিক্ষা হইতে দূরে পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা তাহাদের অন্তরে এইভাবে বসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহার পবিত্র রূহানী শক্তি তাহাদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তখনও তাহারা দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর সাথে যে আচরণ করিত তাহা অমুসলিমদের আচরণ অপেক্ষা অনেক উত্তম ছিল। আর এই জন্যই শুকরিয়া আদায় করিতেছি যে, এই বিষয়টি আমাদের প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই; বরং খৃষ্টানরা নিজেরাই ইহা স্বীকার করিয়াছে।

লীন 'আনফু লায়লা' নামক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিতে গিয়া এক নোট লিখিয়াছেন। তিনি এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মিশরে অবস্থান করিয়াছেন। আর তথায় থাকিয়া খুব সূক্ষ্মভাবে মুসলমানদের আচরণগুলি লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি নোট লিখিয়াছেন যে, "সাধারণভাবে মুসলমানগণ দাস-দাসীর সাথে সদাচরণ করিয়া থাকে।"

অন্যান্য মুসলিম রাজ্য সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন- "যেসব পর্যাটকগণ অন্যান্য মুসলিম দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, দাস-দাসীর সাথে মুসলমানদের সদাচরণ খুব সন্তোষজনক।" তিনি অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে যেসব বিধান উল্লেখ করা হইয়াছে মুসলমানরা ইহাদের সবগুলির উপর বা অধিকাংশের উপর আমল করিয়া থাকে, তাহার এই স্বীকারোক্তি থেকে পরিষ্কাভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণের যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা খৃষ্টানদের গালে থাপ্পর মারা শিক্ষার ন্যায় নয়। যেমন, কোন বিধান সম্পর্কে লিখিতে লিখিতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ভরপুর করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একটি আমলও নজরে আসে না। ইহা তো পক্ষপাতিত্বহীন খৃষ্টানদের মতামত। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি হিংসুটে খৃষ্টান পাদ্রী হাইউ পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে লিখিয়াছে- "মুসলিম দেশসমূহে দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ তাহাদের প্রতি আমেরিকার সদাচরণ অপেক্ষা উত্তম। সেখানে দাসত্ব-প্রথার মান অনেক নিম্নে।

অনুরূপভাবে ইনসাই কিলুপেড ইয়া বালিকা নামক গ্রন্থে এক খৃষ্টান দাস-দাসীর প্রতি মুসলমানদের সদাচরণ সম্পর্কে লিখিয়াছেন- "প্রাচ্যের

মুসলিম দেশগুলিতে সাধারণতঃ দাস-দাসীদিগকে খেত-মজদুরের ন্যায় বিবেচনা করা হয় না; বরং তাহাদিগকে ঘর-বাড়ীর কাজে নিয়োজিত লোকদের ন্যায় বিবেচনা করা হয়। যেন তাহারা পরিবারের একজন সদস্য। তাহাদের প্রতি স্নেহ-মমতার সাথে কোমল আচরণ করা হয়। কুরআন শরীফ দাস-দাসীর প্রতি নরম ও স্নেহমূলক আচরণ করিবার রূহ ফুঁকিতেছে এবং গোলাম আযাদ করিবার উৎসাহ প্রদান করিতেছে।"

দাস-দাসীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা ও ইহার বাস্তব উদাহরণসমূহ পেশ করার পর এখন আমি নির্মল, নিরপেক্ষ ও ইনসাফ স্বভাব পাঠকদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখিতেছি যে, দাসত্ব-প্রথা শব্দটি বলার পর সাধারণভাবে যে কথা বুঝে আসে- ইসলাম কি এই দাসত্ব-প্রথাই চালু রাখিয়াছিল? নিরপেক্ষতার কষ্টি পাথরে যাচাই করিলে ইসলামের দাসত্ব-প্রথাকে সাধারণ দাসত্ব-প্রথা বলা যাইবে না; বরং বর্তমানে দাস নয় চাকর-বাকরদের প্রতিও লক্ষ্য করা যায়। এমনকি আমি বলিতেছি যে, বর্তমানে যাহাদিগকে চাকর বা কর্মচারী বলা হয়- তাহারা পর্যন্ত ইসলামী গোলামের প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবে এবং নিজেদের অবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া ইসলামী দাসে পরিণত হওয়াকে অনেক উত্তম মনে করিবে।

দাসত্ব-প্রথার প্রচলিত সাধারণ অর্থের বিবেচনা করিয়া ইসলামের উপর এই দোষ চাপানো বৈধ হইবে না যে, ইসলামও দাসত্ব-প্রথার অনুমতি দিয়াছে। কেননা প্রচলিত সাধারণ দাসত্ব-প্রথার মাধ্যমে দাসদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল হইতেছিল আর ইসলাম সে অমঙ্গল ও অকল্যাণের শিকড় কাটিয়া দিয়াছিল, যাহার ফলে দাস মনিবের বরাবর হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ইহাকে দাসত্ব কিভাবে বলা যায়? বরং ইহাকে সমকক্ষতা বলা যাইবে।

দাস মনিবের পরিবারের এক সদস্য রূপে বিবেচিত হওয়া শুধু শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ইসলাম ইহা কার্যে পরিণত করাইয়া দেখাইয়াছিল।

উল্লিখিত কথা দুইটি ইসলামের নিম্নোল্লেখিত নীতি হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, মনিব যে খাদ্য আহার করিবে- দাসও অনুরূপ খাদ্য আহার করিবে। মালিক যে পোশাক পরিধান করিবে দাসও একই পোশাক পরিধান

করিবে। মনিব যেখানে অবস্থান করিবে– গোলামও তথায় অবস্থান করিবে। দাসের দায়িত্বে কখনও তাহার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য অর্পণ করা যাইবে না। তাহার প্রতি কখনও কর্কশ ব্যবহার করা যাইবে না। তাহাকে মারধর করা যাইবে না। ইহা অপেক্ষা আর কোন ধরনের বড় সংশোধন দুনিয়া আশা করিতে পারে?

বর্তমান যুগ তো শব্দের পূজারীর যুগ। আসল ছাড়িয়া শুধু বাকল পাইয়াও খুশী হইয়া যায়। যদিও বর্তমানে দাসত্ব–প্রথা বিলোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অনেক সভ্য দেশে বর্তমানেও প্রকৃত দাসত্ব–প্রথা এমনভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, অতিসত্বর দুনিয়ার মানুষ দেখিতে পাইবে যে, চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মানুষের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতিশীল এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় বান্দা দাস–দাসীর সাথে সদাচরণের যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা করা হইবে না ততক্ষণ পর্যন্ত দাসের প্রতি সদাচরণের বাণী শুধু শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহার প্রকৃত সংশোধন কখনও হইতে পারে না। আর দাস–দাসীর প্রতি সদাচরণের বিষয়টির প্রকৃত সংশোধন দুনিয়ার মানুষের চারিত্রিক উন্নতির জন্য অত্যন্ত জরুরী।

ইসলামের শিক্ষা এমন এক বাস্তব শিক্ষা যাহার দ্বারা দুনিয়া চলিতে পারে। আর এই শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমেই মানুষ মানুষের জন্য উপকারী এবং আল্লাহ পাকের সত্যিকার বান্দা হইতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

দাসত্ব–প্রথা দর্শন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দাস শব্দের আরবী অনুবাদ গোলাম। প্রকৃতপক্ষে গোলাম এমন বালককে বলা হয় যে এখনও যৌবন প্রাপ্ত হয় নাই। অবশ্য রূপক অর্থে সেবককেও গোলাম বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে গোলাম শব্দকে একটি ভয়ংকর অর্থে প্রয়োগ করা হয়। অথচ গোলামী একটি মুশকিল বিষয় ছিল না। ইসলাম যুদ্ধবন্দীদিগকে সেবক হিসাবে ব্যবহার করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। আর ইহা এমন একটি সোনালী নীতি, দুনিয়া যাহার উদাহরণ পেশ করিতে পারে নাই ও পারবেও না। বিষয়টি অনুধাবন করিবার জন্য একটি উদাহরণ গ্রহণ করুণ। যেমন, কোন ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে দশ লক্ষ যুদ্ধবন্দী রহিয়াছে। তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলা বা পানাহার বন্ধ করিয়া দিয়া মারিয়া ফেলা সীমাহীন জুলুম, ইসলাম ইহার অনুমতি দেয় না।

পক্ষান্তরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া দুশমনের হস্ত শক্তিশালী করা। আবার তাহাদিগকে জেলখানায় ভরিয়া রাখাও জুলুম। তবে ইহা হত্যা করা অপেক্ষা হালকা জুলুম। কেননা তাহাদের পাহারাদারী করা, তাহাদের পানাহার এবং তাহাদের বিভিন্ন সমস্যায় নিয়োজিত কর্মচারীদের খরচাদি– সবকিছু মিলাইয়াও যদি প্রতিদিন মাথা পিছু তিন টাকা করিয়াও ব্যয় করিতে হয়– তাহা হইলে প্রতিদিন তিন লক্ষ্য টাকা খরচ করিতে হয়। ইহা রাষ্ট্রের জন্য একটি শক্ত বোঝা, যাহা উঠাইয়া রাষ্ট্রের কোন উপকার নাই। কিন্তু যদি যুদ্ধবন্দীদের মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, আর তাহাদিগকে মুসলিম বাহিনীর সেবক নির্ধারণ করা হয়, আর মুসলিম মুজাহিদরাও নিজ নিজ ভাগের যুদ্ধবন্দীকে নিজেদের প্রয়োজন মোতাবেক সেবা, লেখাপড়া, হিসাব নিকাশ, দোকানদারী ও অন্যান্য কাজকর্ম শিক্ষা দিয়া কাজে ব্যবহার করে– তাহা হইলে ইহা এক পরিবারের জন্য খুব ভারী ব্যয়ভার হইবে না। আর সে নিজেও এক পরিবারের সদস্য হিসাবে থাকিবে। পরিবারের মালিকের সন্তানের ন্যায় ব্যবসা–বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্মের মাধ্যমে উপার্জন করিয়া

উপার্জিত অর্থ মালিকের হাতে অর্পণ করিবে। এইভাবে এই যুদ্ধবন্দী মুক্ত থাকিবে; মানুষের সাথে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিবে। সকল কাজকর্ম করিতে পারিবে। এমনকি জ্ঞানার্জন করিবার সুযোগ লাভ করিবে এবং মালিকের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হইবে।

ইসলামী বিধান অনুসারে খানাপিনা, পোশাক পরিচ্ছদের দিক থেকে মনিব আর গোলাম একই পর্যায়ভুক্ত। গোলামের প্রতি জুলুম, অত্যাচার করা, তাহাকে মারপিট করা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু গোলাম আযাদ করা অনেক সওয়াবের কাজ। যদি মনিব অভাব অনটন ও দরিদ্রতায় নিমজ্জিত থাকে তাহা হইলে সে স্বীয় গোলামকে অন্যের সেবায় নিয়োজিত করিয়া সেবার বিনিময় নিজে গ্রহণ করিয়া দরিদ্রতা মোচন করিতে পারে। এই দিকে যে ব্যক্তি গোলামকে সেবার জন্য গ্রহণ করিবে নিশ্চয়ই সে কোন বিত্তশালী ব্যক্তি হইবে– এখন সে এই ব্যক্তির পরিবারের সদস্য রূপে গণ্য হইয়া আনন্দময় জীবন-যাপন করিতে থাকিবে। এখন কোন কারণে তাহার প্রথম মনিব আবার দরিদ্র হইয়া পড়িলেও তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দে কোন পার্থক্য আসিবে না। কেননা তাহার জন্য তো সুখই সুখ রহিয়াছে।

গোলামকে শিক্ষিত ও চরিত্রবান করিয়া গড়িয়া তোলার বিনিময়ে অনেক সওয়াব লাভ হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় গোলামকে শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতে থাকে। এইভাবে গোলামকে শিল্প, কারিগরী প্রভৃতি কাজ শিক্ষা দেওয়ার এবং এইসব কাজে তাহাকে লাগাইয়া রাখার মধ্যে পরিবারভুক্ত সদস্যের ন্যায় মনিব গোলাম উভয়ের ফায়দা রহিয়াছে।

গোলামকে বিবাহ করাইলে সওয়াব পাওয়া যায়। তাহাকে ঘৃণা করা অপরাধ। তাহাকে সমপর্যায়ভুক্ত ধারণা করা এবং প্রতিটি কাজে তাহার প্রতি কোমল আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর মুসলমানগণ এইরূপ করিয়া দেখাইয়াছে। হাজারো আলেম, ব্যবসায়ী, নেতা এমনকি বাদশাহের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়, যাহারা প্রথমে গোলাম ছিল কিন্তু পরে মুক্তি লাভ করিয়া এই সকল পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

বায়তুল মাকদাস বিজয়ের সময় গোলাম উটের পিঠে চড়িয়া আর ইসলামী দুনিয়ার বাদশাহ পায়ে হাঁটিয়া চলা– ইসলামী গোলামীত্বের উদাহরণ।

ইসলামী গোলামী-প্রথা প্রকৃতপক্ষে গোলামী নয়; বরং ইহা হইল পরিবারের এক সদস্য রূপে গণ্য হওয়া। ইসলামী বিধানে পরিষ্কার ঘোষণা রহিয়াছে যে, কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম ঐ সম্প্রদায়েরই একজন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোককে যাকাত, সদকা প্রদান করা জায়েয নাই। অনুরূপভাবে তাহাদের আযাদকৃত গোলামকে প্রদান করাও জায়েয নাই। অধিকন্তু গোলাম ইবাদতে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে। ইহা দ্বারা তাহার পরকালীন উন্নতির কথাও বুঝা যায়। এই জন্যই হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যদি জিহাদ, হজ্জ এবং মাতার সেবা না থাকিত তাহা হইলে আমি গোলাম হইয়া মরিতাম।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামকে ভ্রাতা বলিয়াছেন। গোলামের কোন অধিকার বর্ণনা করিবার সময় তাহাদিগকে ভাই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইসলামী গোলামীতে অপমানিত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। শুধু মানুষের বিভিন্ন রকম প্রপোগান্ডা ছড়াইয়াছে। অন্যথায় ইসলামী গোলামী চিন্তা-ভাবনাহীন জিন্দেগী এবং সুখস্বাচ্ছন্দের জিম্মাদার। শুধু নামটি গোলামীর। তাহাও আবার সাময়িক। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে সে সম্পূর্ণভাবে পরিবারভুক্ত এক সদস্য।

অহেতুক ভীত ব্যক্তি শুধু শুধু ইহাতে ভীত-সন্ত্রস্ত। গোলাম আযাদ হওয়ার পরও মনিবের সাথে তাহার সম্পর্ক বহাল থাকে; বরং তাহার সাথে মীরাসী সম্পর্কও বিদ্যমান থাকে। অথচ বন্ধু-বান্ধব পর্যন্তও মীরাস থেকে বঞ্চিত থাকে; কিন্তু গোলাম বঞ্চিত থাকে না। ইহা সত্ত্বেও ইসলাম নামে মাত্র এই গোলামী-প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য গোলামদের কয়েকভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছে। যেমনঃ

১। মুকাতাব– এমন এক গোলাম যাহাকে তাহার মনিব বলিয়া দেয় যে, এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তুমি আযাদ। এই ধরনের গোলাম ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, কারিগরী প্রভৃতি যে কোন কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে। এমনকি চাঁদা, যাকাত, দান প্রভৃতিও গ্রহণ করিতে পারে। এইভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়া অতি শীঘ্র সে নিজকে মুক্ত করিয়া লইতে পারে।

২। মুদাব্বারঃ এমন গোলাম যাহাকে তাহার মনিব বলিয়া দেয় যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ। এই ধরনের গোলাম মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত গোলাম হিসাবে থাকিবে। মনিবের মৃত্যুর পর সে মনিবের উত্তরাধিকারীদের মীরাস হইবে না।

৩। মুশতারিকঃ এমন এক গোলাম যাহার মনিব হয় একাধিক। এক ব্যক্তি নিজের অংশ আযাদ করিয়া দেওয়ার পর সে আর গোলাম থাকে না। সে ইচ্ছা করিলে কাজ–কারবার, চাকরী, চাঁদা সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া অন্যান্য অংশীদার মনিবদের প্রাপ্ত অংশের বিনিময় আদায় করিয়া পরিপূর্ণ আযাদী গ্রহণ করিতে পারে।

৪। মাহররমঃ এক ব্যক্তি কোন গোলামকে তাহার সেবার বিনিময় দিয়া স্বীয় সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে। যদি এই ব্যক্তি গোলামের মাহররম (যাহাদের সাথে শরীয়তের বিধান মোতাবেক বিবাহশাদী জায়েয নাই– এমন ব্যক্তি) হয় তাহা হইলে সাথে সাথে নিজে নিজেই গোলাম আযাদ হইয়া যাইবে।

৫। উম্মে ওয়ালাদঃ যদি দাসীর গর্ভ হইতে মনিবের ঔরষে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে এই দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বলা হয়। এই দাসী মনিবের হস্তান্তরিত হইবে না; বরং মনিব যতদিন জীবিত থাকে ততদিন পর্যন্ত সে মনিবের অধীনে থাকিবে। মনিবের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ আযাদ। তাহার সন্তানাদি মনিবের সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। আর এই সন্তান মনিবের উত্তরাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

অনুরূপভাবে গোলাম আযাদ করা নিজকে জাহান্নাম থেকে আযাদ করার মাধ্যম। এই জন্যই অনেক আযাদ করা হইয়াছে। অতঃপর ইসলামী বিধানে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে গোলাম আযাদ করার বিধান রহিয়াছে। যেমন শপথ মিথ্যা হইয়াছে তো গোলাম আযাদ কর; রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ তো গোলাম আযাদ কর। স্ত্রীকে বলিয়াছ যে, তুমি আমার মাতার ন্যায় হারাম– এই ক্ষেত্রেও গোলাম আযাদ কর। ভুলে কাহাকেও হত্যা করিয়াছ তো গোলাম আযাদ করা প্রভৃতি।

গোলামের প্রতি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, মারপিট প্রভৃতি ক্ষেত্রেও

গোলাম আযাদ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। কথায় কথায় গোলাম আযাদ করিবার বিধান চালু করা হইয়াছে।

মোটকথা; ইসলামী–প্রথা নামে মাত্র গোলামী–পন্থা। ইহা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনিব হওয়া অপেক্ষাও উত্তম। নামে মাত্র গোলামী হওয়া সত্ত্বেও এই প্রথাটি এইভাবে বিলোপ হইতে ছিল এবং মুসলমানও ইহার বিলোপ সাধনে খুব তৎপর ছিল। যদি তাহারা এই ব্যাপারে তৎপর না হইত তাহা কি অবস্থা হইত একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। কেননা লক্ষ লক্ষ যুদ্ধবন্দী গোলাম হইয়া মুসলমানদের হাতে ছিল। যদি তাহাদের সন্তানাদি ও বংশধর গোলামই থাকিয়া যাইত তাহা হইলে আজকের পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোক দাস দাসীতে পরিপূর্ণ থাকিত। অথচ আজ পৃথিবীতে দাস–দাসী পাওয়া যায় না।

নারী যুদ্ধবন্দী যখন বন্টিত হইয়া মুজাহিদের অংশে আসে তখন মুজাহিদের ঘরে থাকা অবস্থায় কি কি হইতে পারে? সার্বক্ষণিক সেবা তাহার দায়িত্বে। এমতাবস্থায় পরিবারের লোকদের সাথে মিলামিশা এবং কথাবার্তায় সে কি কি রং ধরিতে পারে? অতঃপর তাহাদের রহিয়াছে বাসনা কামনা। ইহা পুরা করিবার সুষ্ঠু সমাধানও অত্যন্ত প্রয়োজন। এই জন্য তাহাদিগকে বিবাহ প্রদান করা সওয়াবের কাজ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু স্বয়ং মনিবই যদি তাহাকে পছন্দ করিয়া বসে; মনিবের পছন্দ করা তাহার মুক্তির উসিলা হইয়া গেল।

দাসী মনিবের অধীনে আসার পর এই দাসীর জন্য এমন একটি ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন, যাহাতে দাসীর জৈবিক চাহিদা মিটিতে পারে আর সে অন্যের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন থেকে হেফাজতে থাকিতে পারে। অধিকন্তু মনিবের বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে কেহ তাহার দিকে কামনার লোলুপ হস্ত প্রসারিত করিতে না পারে। দাসীর এই দিক হেফাজতের জন্য তাহার মানিবই যথেষ্ট। সুতরাং বিবাহ–শাদীর মাধ্যমে যেভাবে সর্বদার জন্য সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, অনুরূপভাবে এখানেও নারী মনিবের জন্য খাস হওয়ার দ্বারা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিবাহ–শাদীর মধ্যে এক প্রকার ধর্মীয় শপথ হয়। এই ক্ষেত্রেও ধর্মীয় শপথ রহিয়াছে। অধিকন্তু বিবাহ–শাদীতে শুধু এক ধরনের বিশেষ সেব। নারীর দায়িত্বে অর্পিত হয়। আর এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সেবার দায়িত্ব অর্পিত হয়। বিবাহ–শাদী দ্বারা চাকরী হয় না কিন্তু এই

সম্পর্কের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে চাকুরীও হয়। বিবাহ-শাদীতে এক বিশেষ ক্ষেত্রের স্বামী মালিক হয় আর এই ক্ষেত্রে সকল দিকের। এই জন্য ইহার অবস্থা বিবাহ-শাদীর অবস্থা অপেক্ষা এবং এই ক্ষেত্রে অধিকার বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রের অধিকার অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে রহিয়াছে। এই জন্যই তাহারা স্ত্রীর ন্যায় থাকিতে পারে। আর তাহাদের এইরূপ থাকাও তাহাদের মুক্তির উসিলা হইয়া দাঁড়ায়। যেমন মনিবের দ্বারা তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর তাহারা মনিবের মালিকানা হইতে অন্যের মালিকানায় স্থানান্তরিত হইতে পারে না। যতদিন মনিব জীবিত থাকে ততদিন তাহারা মনিবের সেবিকা হিসাবে গণ্য হয়। মনিবের মৃত্যুর পর তাহারা আযাদ। তাহাদের সন্তানাদিও আযাদ। এমনকি মানিবের সম্পদের মীরাস পর্যন্ত পায়। নারীদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে?

তবে যদি মনিব ব্যতীত অন্যান্য লোকের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহাদের সাথে মনিবের সহবাসের অধিকার থাকে না। কেননা অন্য লোক তাহাদের পবিত্রতা রক্ষার জিন্মাদার হইয়া গিয়াছে। সমাজকে অপবিত্রতা মুক্ত করিবার এই সোনালী বিধান কায়েম হইয়াছে। যুদ্ধবন্দীদিগকে ঘরের সেবক নিযুক্ত করার মধ্যে আরও একটি উত্তম দিক ইহাও রহিয়াছে যে, ইসলাম সকল আসমানী দ্বীন অপেক্ষা উত্তম দ্বীন এবং সকল ধর্মের রহিত কারক।

অমুসলিম যুদ্ধবন্দীরা যদি মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করে তাহা হইলে দ্বীনী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করার ভাগ্য হইবে। মুসলমানদের ইলম আমলের সর্বপ্রকার পন্থা তাহাদের দৃষ্টির সামনে খুলিয়া আসিবে। যদি আল্লাহ পাক তাওফীক প্রদান করেন- তাহা হইলে সর্বদার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা হইতে পারে। এইভাবে তাহাদের দুনিয়াও ভাল থাকে, আখেরাতও ভাল থাকে। ইতিহাসে তাহাদের এইসব উন্নতির কথা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহাদের বাদশাহ হওয়ার কথাও বিদ্যমান রহিয়াছে।

দুনিয়াতে এমন কোন সম্প্রদায় আছে কি যাহারা যুদ্ধবন্দীদিগকে এবং বিজিত সম্প্রদায়কে দ্বীন ও দুনিয়ার দিক দিয়া এত উন্নতিতে পৌছাইয়াছে? দুনিয়াতে এমন কোন বিবেক আছে কি যাহা ইহা অপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা পেশ করিতে পারে?

অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যে অত্যাচার ও অবিচার করে তাহা দুনিয়াতে ফাসাদের সৃষ্টি করে। বদাচরণ প্রসারিত করে। সমাজ-ব্যবস্থাকে অপবিত্র করিয়া ফেলে। ইহার ফলে হারাম সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া কাহারও কাছে গোপনীয় নয়। হিন্দুস্তানের শাসকরা হিন্দুদিগকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করিতেছে। তাহাদিগকে মেথর, চামার, মজদুর, আবর্জনা পরিষ্কারকারী বানাইয়া ছাড়িয়াছে। সমস্ত অপবিত্রতা তাহাদের অংশে ছাড়িয়াছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহা কিছু করিয়াছে তাহা অনেকেই জানে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হইল যে, কাফেরদের এই ভুল প্ররোচনা বিশ্বাস করিয়া কোন কোন মুসলমানও উদাহরণহীন এই সোনালী বিধান সম্পর্কেও সংশয় পোষণ করিতেছে। তাহাদের উচিত তাহারা যেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করিয়া প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

বান্দাহ

জমীল আহমদ থানবী
মুফতি, জামিয়া আশরাফিয়া
নীলাগোমবাদ, লাহোর
২৮ শে শাওয়াল, ১৩৮৩ হিঃ

আল মাসালিহুল আকলিয়াহ লিল আহকামিন নাকলিয়াহ

(যুক্তির আলোকে শরয়ী আহকাম)

(তৃতীয় খণ্ড)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

প্রথম অধ্যায় / ক্রয়বিক্রয়

বায়ে সলম [১] হালাল হওয়ার কারণ

কোন কোন ব্যক্তির আপত্তি যে, বায়ে সলম বিবেক পরিপন্থী। কেননা ইহাতে অবর্তমান বস্তুর উপর লেনদেনের চুক্তি হয়। অবর্তমান বস্তুর বেচাকেনা বিবেক পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "তোমার কাছে নাই- এমন বস্তু বেচাকেনা করিও না।"

উত্তরঃ বায়ে সলম কোন কোন দিক দিয়া বিবেক সম্মত। কেননা বায়ে সলমে শস্যের বিবরণ, গুণ বর্ণনা, পরিমাণ ও জাতের পরিচয় এবং বিক্রেতা শস্য আদায় করিবার দায়িত্বশীল হওয়া শর্ত। কোন জিনিস ভাড়া দেওয়ার পর ভাড়া হিসাবে পাওনা অর্থ পূর্বে আদায় করা যায়। অথচ ভাড়াকৃত বস্তুর ফায়দা তখন বর্তমান থাকে না। এই লেনদেনটি ইহার সাথে তুলনা করা যায়। আর উল্লিখিত ভাড়া প্রদান বৈধ বিদায় এই লেনদেনটিও বৈধ। সুতরাং 'বায়ে সলম'কে সম্পূর্ণরূপে অবর্তমান বিক্রেয় বস্তুর সাথে তুলনা করা অর্থাৎ এমনকি

টীকাঃ

(১) প্রথমে জমির মালিককে টাকা দিয়া দিবে এই শর্তের উপর যে, জমির ফসল উঠার পর জমির মালিক তাহাকে নির্ধারিত দরে ফসল প্রদান করিবে।

বিক্রেয় বস্তু যাহার কোন অবস্থা ক্রেতা জ্ঞান নয়- এমন বস্তুর সাথে বায়ে সলমকে তুলনা করা সহীহ নয় (কেননা বায়ে সলমে বিক্রেয় বস্তুর কোন কোন অবস্থা সম্পর্কে ক্রেতা অবগত)। অবশ্য বায়ে সলমের বিক্রেয় বস্তু বাহ্যিক দিক দিয়া অবর্তমান বিক্রেয় বস্তুর সাথে তুলনীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামনে মওজুদ বস্তু বিক্রি করার সাথে তুলনীয়। (কেননা বায়ে সলমের বিক্রেয় বস্তু সারা বৎসর বাজারে পাওয়া যায়।

বস্তু দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের বস্তু হইল মানুষ যাহার মালিক হইতে পারে না এবং ইহার পরিমাণও তাহার সামনে পরিষ্কার নয়। দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু হইল এমন বস্তু বিক্রেতা যাহা আদায় করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। আর স্বভাবতঃ বিক্রেতা তাহা আদায় করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ পাক মানুষের স্বভাবে এই দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা রাখিয়াছেন। এইভাবে বস্তুসমূহের মধ্যে মোটামুটি পার্থক্য হইয়া যায়। কিন্তু বিস্তারিত পার্থক্য মানুষের চিন্তাশক্তির অধীনস্থ করা হয় নাই। বরং ইহার জন্য অহীর প্রয়োজন। সুতরাং ইহার প্রত্যেকটি বস্তুর পৃথক পৃথক আহকাম কুরআন হাদীছে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, অবর্তমান বস্তু বিক্রয় করা কখন জায়েয আর কখন জায়েয নয়।

অবর্তমান বস্তুর বিক্রি জায়েয হওয়ার উদাহরণ, 'বায়ে সলম' যখন ইহার শর্তসমূহের সাথে হয়। না-জায়েয হওয়ার উদাহরন, যেমন ফল ব্যবহার করার যোগ্য হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা।

ইজারা প্রদান বৈধ হওয়ার হেকমতঃ

যাহারা বলে যে, ইজারা (ভাড়া দেওয়া) বিবেক পরিপন্থী- তাহারা এই ধারণার বশঃবর্তী হইয়া বলে যে, কোন বস্তু ভাড়া লওয়ার অর্থ অবর্তমান বস্তু খরিদ করা। কেননা লেনদেনের বা ভাড়া লওয়ার চুক্তির সময় ভাড়াকৃত বস্তুর উপকার ও ফায়দা অবর্তমান থাকে। আর এই উপকার ও ফায়দা ভোগ করার বিনিময় হিসাবেই ভাড়ার অর্থ প্রদান করা হয়। সুতরাং অবর্তমান বস্তুর উপর ক্রয়-বিক্রয় হইল।

সমাধানঃ যদিও এই ক্ষেত্রে উপকার ও ফায়দা মওজুদ নাই; কিন্তু

উপকার ও ফায়দা অর্জনের মহল (স্থান) মওজুদ আছে। শরীয়ত ফায়দার মহলকে ফায়দার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছে। মানুষের প্রয়োজনের চাহিদার দিকে খেয়াল করিয়া স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং বিক্রেয় বস্তু এখানে বাহ্যিকভাবে অবর্তমান হইলেও প্রকৃতপক্ষে যেন মওজুদ রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 'বায়ে সলমে' ইহার উদাহরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

মদ, মৃত্যু জন্তু, শূকর, প্রতিমার ক্রয় বিক্রয়, যিনার বিনিময়, গণকঠাকুরের পারিশ্রমিক হারাম হওয়ার কারণ

বস্তুসমূহ হারাম হওয়ার ভিত্তি করেকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে একটি হইল– কতক জিনিস এমন রহিয়াছে যেগুলি স্বভাবগতঃভাবে গোনাহের সাথে জড়িত। অথবা এইসব জিনিস দ্বারা মানুষের যে উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয় তাহাও এক প্রকারের গোনা। যেমন মদ্য, প্রতিমা, তবলা প্রভৃতি। কারণ, উল্লিখিত জিনিসসমূহের বেচাকেনার পন্থা জারী করা এবং এইগুলি প্রস্তুত করার দ্বারা ইহাদের দ্বারা কৃতগোনাহ প্রকাশ করা অথবা মানুষদিগকে গোনাহের প্রতি আহবান করা, অথবা উৎসাহ প্রদান করা এবং গোনাহের নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আল্লাহর হেকমতের চাহিদা হইল যে, উল্লিখিত জিনিসসমূহ বেচাকেনা করা এবং এইগুলি ঘরে রাখা হারাম করা হউক। কেননা ইহার দ্বারা এইসব গোনাহ দূরীভূত করা পাওয়া গেল এবং মানুষকে এই দিকে মনোনিবেশ করা পাওয়া গেল যে, এইসব জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ

"আল্লাহ পাক ও তাঁহার রাসূল মদ, মৃতপ্রাণী, শূকর ও প্রতিমা বেচাকেনা হারাম করিয়াছেন।" অতঃপর বলিয়াছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"আল্লাহ পাক যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন উহার মূল্যও হারাম করেন।"

অর্থাৎ যখন কোন জিনিস হইতে উপকার লাভ করার পন্থা নির্ধারিত, উদাহরণ স্বরূপ মদ; ইহা শুধু পান করার জন্য নির্ধারিত। অনুরূপভাবে প্রতিমা; ইহা শুধু পূজা করিবার জন্য নির্ধারিত। আর আল্লাহ পাক এই জন্যই এইগুলি হারাম করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ পাকের হেকমতের চাহিদা হইল যে, তিনি ইহাদের বেচাকেনাও হারাম করিয়া দেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন– مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ। "যিনার পারিশ্রমিক অশ্লীল।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণকঠাকুর ও জ্যোতিষদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। গায়িকাদের পারিশ্রমিকও নিষেধ করিয়াছেন।

এইসব নিষিদ্ধ হওয়ার কারণঃ যেসব মাল অর্জন করাতে গোনাহের মিশ্রণ রহিয়াছে– এইসব মাল হইতে দুই কারণে উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ। তন্মধ্যে এক হইল এই যে, এই মাল নিজের জন্য হারাম করার মধ্যে এবং ইহা হইতে উপকৃত না হওয়ার মধ্যে গোনাহ হইতে বিরত থাকা হয়। পক্ষান্তরে এই প্রকার লেনদেনের দস্তুর জারী করার মধ্যে ফিতনা ফাসাদ চালু করা এবং মানুষকে গোনাহের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করা হয়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, "জিনিস বিক্রি করার ফলেই মূল্য অর্জিত হয়।" এই কথাটি জন্মগতভাবে মানবের বিবেক ও চিন্তাক্ষেত্র দখল করিয়া লইয়াছে। আর উর্ধ্ব জগতে এই মূল্যের জন্য এক কৃত্রিম সাদৃশ্য অস্তিত্ব লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লিখিত জিনিসসমূহের বিক্রয়ের অপকৃষ্টতা এবং উল্লিখিত কার্যসমূহের অপকৃষ্টতা উর্ধ্ব জগতের জ্ঞানে জিনিসসমূহের মূল্যে এবং কর্মসমূহের পারিশ্রমিকে অনুপ্রবেশ করে। আর মানুষের অন্তরেও ইহার অপপ্রভাব পড়ে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যের নিংড়ানেওয়ালা, যে শস্য হইতে মদ্য প্রস্তুত হয় ঐ শস্যওয়ালা, মদ্যপায়ী, মদ্য আদান প্রদানকারী, মদ্য গ্রহণকারী প্রত্যেকের প্রতি লানত করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, গোনাহের কার্যে সাহায্য সহযোগীতা করা, গোনাহের কার্যের প্রচার ও প্রসার এবং এই দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও গোনাহ এবং দুনিয়াতে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা।

উল্লিখিত জিনিসসমূহ হারাম হওয়ার আরও এক কারণ এই যে, অপবিত্র বস্তুসমূহ যেমন মৃতপ্রাণী, রক্ত, গোবর, পায়খানা প্রভৃতির সংশ্রবে থাকা বড়ই দোষণীয় এবং আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ। ইহার কারণে শয়তানের সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি হয়। অপবিত্রতা ও ময়লা-আবর্জনা হইতে দূরে থাকা এমন বিধানের অধীনে পরিচালিত হওয়া, যাহা বাস্তবায়ন করার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আর ইহা এমন এক বিধান যাহার অধীনে চলার দ্বারা ফিরিশতাদের সাথে সাদৃশ্যতা লাভ হয়। অধিকন্তু পবিত্র লোকদিগকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন।

যেহেতু অপবিত্রতা ও নাপাকীর সাথে কোন না কোন পর্যায়ের সংশ্রব বাধ্য হইয়া করিতে হয়। তাই যদি এই ক্ষেত্রে সর্বদিক থেকে ইহাদের সংশ্রব নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়- তাহা হইলে মানুষের জন্য চলাফেরা খুব কঠিন ও দুষ্কর হইয়া পড়িবে। সুতরাং যেসব অপবিত্র জিনিসের খুব বেশী প্রয়োজন- ইহা বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। যেমন এমন অপবিত্র বস্তু যাহা এক সময় পর্যন্ত গর্তের নীচে রাখিয়া দেওয়া হয় পরে প্রয়োজন মোতাবেক জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কেননা ইহা বিক্রি করার অনুমতি না দিলে মানুষ খুব অসুবিধায় পতিত হইবে। আর যে না-পাকীর প্রতি এমন শক্ত প্রয়োজন না পড়ে তাহা বিক্রি করা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা ইহা নিষেধ করাতে কেহ কোন অসুবিধায় পড়ে না। যেমন মদ্য ও শূকর বিক্রি করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় / পানাহার

শূকর হারাম হওয়ার কারণসমূহ

শূকর সম্পর্কে কে অবগত নয় যে, শূকর সর্বাধিক অপবিত্র ও নাপাক জিনিস ভোজী ও লজ্জাহীন বেহায়া প্রাণী। এখন ইহা হারাম হওয়ার কারণ প্রকাশ্য যে, এই প্রকারের না-পাক ও খারাপ জন্তুর গোশতের অপপ্রভাব গোশতভোজীর দেহ ও রূহের উপর পড়িবে। আর তাহাও অপবিত্রই হইবে। কেননা ইহা একটি সর্বসম্মত অভিমত যে, খাদ্যের প্রভাব অবশ্যই মানুষের রূহের উপর পতিত হয়। সুতরাং এইরূপ খারাপ জিনিসের প্রভাব অবশ্যই খারাপ হইবে- ইহা সন্দেহাতীত বিষয়। অবশ্য ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই ইউনানী চিকিৎসাবিদগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শূকরের গোশত ভক্ষণ করার ফলে বিশেষ করিয়া লজ্জা ও হায়া হ্রাস পাইয়া থাকে। সুতরাং যখন এই বিধানটি সর্বসম্মতিভাবে গৃহীত হইল যে, দেহ ও চরিত্র পরিবর্তনের অধিকতর শক্তিশালী মাধ্যম হইল খাদ্য, তাই শরীয়ত এই জন্তুর গোশত ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছে। ইহার জঘন্য অভ্যাসসমূহ পূরাপুরিভাবে শয়তানের কুঅভ্যাসসমূহের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। ফিরিশতা হইতে দূরত্ব সৃষ্টি করে। আর ভাল ভাল স্বভাবের পরিপন্থী অভ্যাসসমূহ পয়দা করে।

২। শূকর অপবিত্র জিনিসসমূহের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। ইহাদের সংস্পর্শে বেশী বেশী থাকিতে চায়। বিশেষ করিয়া মানুষের মল শূকরের প্রধান খাদ্য। আর এই অপবিত্র বস্তুটি হইতেই ইহার গোশত জন্মলাভ করে। ইহার গোশত ভক্ষণ করা প্রকারান্তে স্বীয় পায়খানা ভক্ষণ করা।

৩। 'মাখযানুল আদবীয়া' নামক গ্রন্থের রচয়িতা শূকরের গোশত ক্ষতিকর ও হারাম হওয়ার তেরটি কারণ লিখার পর বলিয়াছেন যে, শূকরের গোশত মানব স্বভাবের চাহিদার পরিপন্থী জিনিস। তিনি লিখিয়াছেন যে, শূকরের গোশত রক্ত পিত্তবর্ণ এবং থুক কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেলে। স্বভাবে জঘন্য লোভ-লালসার সৃষ্টি করে। অবিরাম মাথা ব্যথার কারণ হয়। পা এবং পায়ের গোছা শক্তভাবে ফুলিয়া উঠে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জোড়াসমূহে ব্যথার সৃষ্টি

হয়। বিবেক ত্রুটিযুক্ত হইয়া পড়ে। মনুষ্যত্ব, লজ্জা ও মর্যাদাবোধ দূরীভূত হইয়া যায়। অশ্লীলতা ও অসভ্যতা সৃষ্টি করে।

অনেক অমুসলিম সম্প্রদায় ইহার গোশত ভক্ষণ করে। ইসলামের নূর প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে বাজারেও ইহার গোশত বিক্রি করা হইত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে ইহার গোশত ভক্ষণ হারাম করা হইয়াছে। ইহার বেচাকেনা নিষিদ্ধ ও রহিত ঘোষিত হইয়াছে। ইহার গোশত খুব মোটা ধরনের হয় এবং দেখিতেও বিশ্রী লাগে।

সর্বপ্রকার হিংস্র জানোয়ার আর শিকারী পক্ষীসমূহ হারাম হওয়ার কারণ

হিংস্র জন্তুর স্বভাব হইল– থাবা ও চঙ্গলের দ্বারা ছিঁড়া, হামলার দ্বারা অন্য পশুকে আহত করা। ইহাদের অন্তর খুব কঠিন, নির্মম। এই ধরনের সকল হিংস্র জন্তু হারাম করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, أَيَأْكُلُهُ أَحَدٌ "কোন মানুষ কি ব্যাঘ্র খায়?" অর্থাৎ কেহই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করে না। ভক্ষণ না করার কারণ প্রকাশ্য যে, এইসব জন্তুর গোশত খাওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে হিংস্রতা জন্ম লাভ করে। কেননা ইহাদের স্বভাবে ভারসাম্যতা নাই। ইহাদের অন্তর দয়ামায়া ও অনুগ্রহ থেকে খালি। আর এইসব কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী পাখীর গোশত ভক্ষণ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।

কোন কোন জন্তুকে তিনি ফাসিক (লম্পট)ও বলিয়াছেন। ইহাদের গোশত ভক্ষণ করার ফলে ইহাদের মধ্যে যে বদ অভ্যাস ছিল অনুরূপ বদ অভ্যাস ভক্ষণকারীর মধ্যেও সৃষ্টি হয়। হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ عَنْ جَابِرٍ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْاَنْسِيَّةَ وَ لُحُوْمَ الْبِغَالِ وَ كُلَّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ *

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, খায়বরের জিহাদের দিনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রকার দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু হারাম করিয়াছেন।"

"হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের জিহাদের দিনে গৃহপালিত গাধা ও খচ্চরের গোশত এবং সকল প্রকার দাঁতবিশিষ্ট অর্থাৎ হিংস্র জন্তু ও থাবাবিশিষ্ট জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ হারাম করিয়াছেন।"

সুতরাং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল, খেকশিয়াল, বেজী, বাজপাখী, চিল প্রভৃতি হারাম। কেননা এইসব দন্তবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু।

মৃতপ্রাণী ও রক্ত হারাম হওয়ার কারণ

১। মৃতপ্রাণী ভক্ষণ হারাম করা খোদায়ী হেকমতের সম্পূর্ণ অনুকূল। কেননা জানোয়ারের দেহ পবিত্রকারক হইল রূহ। প্রাণীর দেহ হইতে রূহ যখন পৃথক হইয়া পড়ে তখন ইহার দেহের পঁচা দুর্গন্ধ দূরীকারক অন্য কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং ইহার পঁচা দুর্গন্ধপূর্ণ দেহকে বিকৃত ও নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে দেহ দুর্গন্ধময় ও খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং যাহারা শৈশবকাল থেকেই মৃতপ্রাণী ভক্ষণ করে– তাহাদের আকৃতি, গঠন এবং স্বভাব খুব নীচ ও বিশ্রী হয়। দেখিয়া মনে হয় যে, তাহাদের স্বভাব যেন মানবিক স্বভাব হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। সুতরাং জঘন্য স্বভাব, নির্মম অন্তর হইয়া পড়ে। আর ইহা তাহাদের জন্মগত স্বভাবের ন্যায় হইয়া যায়।

২। মৃতপ্রাণীর ভিতর এক প্রকার বিপজ্জনক বিষাক্ত পদার্থ থাকে। ইহার ফল মানুষের জন্য মঙ্গলময় নহে। এই জন্যই মৃতপ্রাণী ভোজী সম্প্রদায়ের লোকদের কথাবার্তা, বিবেক–বুদ্ধি মোটা ও বেকুফের ন্যায় হয়।

৩। রক্তের মধ্যেও এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যাহার কারণে অর্ধাঙ্গ, চামড়া ঢিলা হইয়া যাওয়া এবং হাত পায়ে অন্যান্য রোগের সৃষ্টি হয়।

৪। রক্ত পান করার ফলে হিংস্র প্রাণীদের স্বভাবের ন্যায় স্বভাব সৃষ্টি হয়। স্বভাবে ক্রোধ ও গোস্বা পয়দা হয়। যেমন চামার ও অন্যান্য মৃতপ্রাণী ভক্ষণকারীর স্বভাবে এইসব দোষ বাস্তবে দেখা যায়। তাই খোদায়ী হেকমতের

চাহিদা মোতাবেক এইসব জিনিস ভক্ষণ করা হারাম করা হইয়াছে।

৫। শূকর, মৃতপ্রাণী ও রক্ত ভক্ষণ করা হারাম ঘোষণা করার কারণ স্বরূপ আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "এইগুলি অপবিত্র জিনিস।" এইগুলি ভক্ষণ করার ফলে মানুষের ভিতর বাহির উভয় দিক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে কোন জন্তু যবেহ করা এবং যবেহকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করারও একই অবস্থা। অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা অন্তর অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত হয়। আর মানুষ ফাসেক হওয়া অর্থাৎ গোনাহগার হওয়ার কারণও ইহাই। আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ *

"মৃতজন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের গোশত ভক্ষণ করা হালাল নয়। কেননা এইসব নাপাক (অর্থাৎ এইগুলি ভক্ষণ করার ফলে বদ অভ্যাস ও বদ আমল প্রকাশ পায়।) অনুরূপভাবে আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়াও হালাল নয়। কেননা এই ধরনের পশুর গোশত খাওয়ার দ্বারা মানুষ ফাসেক ও বদকার হইয়া যায়।

সার কথাঃ ইসলামী শরীয়তে মৃতজন্তুর গোশত ভক্ষণ করিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে এই জন্য যে, মৃতজন্তুর গোশত স্বীয় ভক্ষণকারীকে নিজের রংয়ে রঞ্জিত করে। অর্থাৎ স্বীয় প্রভাবে প্রভাবিত করে। অধিকন্তু মৃতজন্তুর গোশত স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। অনুরূপভাবে যে জন্তুর রক্ত মৃত্যুর সময় দেহের ভিতরে থাকিয়া যায়। ইহারা মৃতের কাতারে শামিল। যেমন, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারা জন্তু, লাঠির আঘাতে মারা জন্তু।

এখন প্রশ্ন হইল যে, রক্ত মৃতজন্তুর ভিতরে স্ব অবস্থায় বহাল থাকে কিনা? অবশ্যই নয়। বরং তরল হওয়ার কারণে অতি অল্প সময়ে নষ্ট হইয়া যায় এবং রক্তের মধ্যে অন্য জিনিসকে অপবিত্র ও নষ্ট করিবার যে ক্ষমতা থাকে– এই ক্ষমতার দ্বারা দেহের সমুদয় গোশত নষ্ট করিয়া দেয়। অধিকন্তু পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর প্রমাণিত হইয়াছে যে, রক্তের মধ্যে এক প্রকার জীবানু থাকে ইহা মরিয়া দেহের মধ্যে এক প্রকার দুর্গন্ধময় পঁচা বস্তুতে পরিণত হয়,

যাহা সমুদয় দেহে ছড়াইয়া পড়ে। এই জন্যই সকল ধর্মের লোকদের কাছে মৃতজন্তু ভক্ষণ করা হারাম বলিয়া সাব্যস্ত। খোদাপ্রদত্ত ধর্মানুসারীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতি ঐক্যমত পোষণ করার কারণ হইল যে, পবিত্র দরবার হইতে তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে যে, এইসব জিনিস খারাপ ও কলুষিত। বাতিল ধর্মানুসারীরা এই জন্য ঐক্যমতে পৌছিয়াছে যে, তাহাদের জ্ঞান মতে অধিকাংশ মৃত জিনিসের মধ্যে বিষাক্ত প্রভাব রহিয়াছে। জন্তু মরার সাথে বিষাক্ত প্রভাব সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। আর এই বিষাক্ত প্রভাব মানুষের স্বভাবের পরিপন্থী।

এখন প্রয়োজন হইল মৃত জন্তুকে ঐ সকল জন্তু থেকে পৃথক করা, যাহা মৃত বলিয়া বিবেচ্য নয়। এই ক্ষেত্রে শরয়ী আহকামের বিস্তারিত বিবরণ তালাশ করিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া যাইতে পারে। সহীহ বিবেকসম্মত চিন্তা ফিকিরের মাধ্যমে ইহার কারণ অনুধাবন করা যাইতে পারে। অনেক অপ্রকাশ্য জিনিসের কারণ সামনে আসিতেছে।

সতর্কতাঃ মৃতজন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা– এই বস্তু চতুষ্টয়ের প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন মৃতজন্তু ভক্ষণের ফলে দেহ খারাপ হইয়া পড়ে। আর দেহের প্রভাব অন্তরের উপর পড়ে। শূকরের গোশতের প্রভাব পড়ে চরিত্র ও অভ্যাসের উপর। গায়রুল্লাহর নামে যবেহকৃত জন্তুর গোশতের প্রভাব পড়ে আকিদা–বিশ্বাসের উপর।

বিশেষ ধরনের কাক, চিল, সাপ–বিচ্ছু,

ইঁদুর হারাম হওয়ার কারণ

এই সকল প্রাণীর অভ্যাস হইল মানুষকে কষ্ট দেওয়া। ছোবল মারিয়া কোন কিছু লইয়া যাওয়া। লুটপাট করার উদ্দেশ্যে ইহারা সর্বদা অপেক্ষামান থাকে। শয়তানী প্ররোচনা কবুল করার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে প্রবল। এইসব কারণে এইগুলি ভক্ষণ করা হারাম। হাদীছের মধ্যে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ

وَ الْعَقْرَبُ وَ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ . رواه الترمذي

"অর্থাৎ পাঁচটি জন্তু ফাসেক (দুষ্ট)। ইহাদিগকে হরম শরীফেও হত্যা করা বৈধ। ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল, পাগলাকুকুর।

হরম শরীফে প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু উদ্ধত এবং বিদ্রোহী হরম শরীফেও নিরাপত্তা পায় না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত জন্তু পাঁচটির ঔদ্ধত্য ও দুষ্টামী এবং অবাধ্যতার কারণে ইহাদিগকেও হরম শরীফে হত্যা করার হুকুম করিয়াছেন। তিনি 'ফাসেক' শব্দ ব্যবহার করিয়া ইহাদের গোশত হারাম হওয়ার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহাদের গোশত ভক্ষণ করিবে তাহাদের মধ্যে ফেসক অর্থাৎ অশ্লীলতার অভ্যাস সৃষ্টি হইবে। ইহাদিগকে ফাসেক বলিয়া এই দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই সকল জন্তু যে যত সময়ই লালন-পালন করুক না কেন শেষ পর্যন্ত ইহারা তাহাকে ক্ষতি করিবে। লালন-পালন করার পর লালন-পালনকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার বিধান ভাঙ্গিয়া অবাধ্য হইয়া পড়িবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার দিকে লক্ষ্য করার বিষয় হইল যে, তিনি এইসব জন্তুকে হারাম বলেন নাই; বরং ফাসেক বলিয়াছেন। যদি তিনি ইহাদিগকে হারাম বলিতেন, অতঃপর হারাম হওয়ার কারণ বলিতেন আর এই ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ বর্ণনাই উদ্দেশ্য- তাহা হইলে তাহাকে দুইবার বলিতে হইত। তাই তিনি একবারেই হারাম হওয়ার কথা এবং হারাম হওয়ার কারণ উভয়টি বর্ণনা করিয়াছেন। 'সারগর্ভ বর্ণনা করা' রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম গুণ।

যাহারা এইসব জন্তুর গোশত ভক্ষণ করিবে- তাহারা ইহাদের অভ্যাসে অভ্যস্থ হইয়া পড়িবে। আর ইহাদের অভ্যাস খারাপ। তাই গোশত ভক্ষণকারীর অভ্যাসও খারাপ হইয়া পড়িবে। এই জন্য ইহার গোশত ভক্ষণ হারাম করা হইয়াছে। তবে সর্বপ্রকার কাকের গোশত হারাম নয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহের গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে।

মাটির নীচের পোকামাকড় ও সহস্রপদ কেন্না প্রভৃতি হারাম হওয়ার কারণ

যেসব প্রাণীর অভ্যাস হইল নীচ হইয়া থাকা আর মাটির নীচে লুকাইয়া থাকা। উদাহরণ স্বরূপ- ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণী যাহা গর্তের ভিতর অবস্থান করে এইসব কিছু হারাম। হারাম হওয়ার কারণ এই যে, এইসব প্রাণী ভক্ষণকারীর মধ্যে ইহাদের অভ্যাস অনুপ্রবেশ করে। অধিকন্তু গর্তের ভিতর অবস্থানকারী সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যে বিষাক্ত উপাদান থাকে। এইগুলি ভক্ষণ করার দ্বারা মানুষ ধ্বংস হইয়া যায়।

কুকুর এবং বিড়াল হারাম হওয়ার কারণ

কুকুর এবং বিড়াল উভয় হিংস্র জন্তু। উভয় হারাম জিনিস ভক্ষণ করে। কুকুরের মধ্যে কতগুলি বদ অভ্যাস রহিয়াছে বিধায় কুকুর শয়তানের ন্যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরকে শয়তান বলিয়াছেন। সুতরাং কুকুরের মাংস ভক্ষণকারী শয়তান ও হিংস্র জন্তুর মত হইয়া পড়িবে। অধিকন্তু কুকুর সর্বাধিক দুষ্ট প্রকৃতির, অপমানিত, নীচ এবং লোভী প্রাণী। ইহার অতিশয় লোভের প্রমাণ যে, যখন সে পথ চলে তখন লোভের অতিশয্যের কারণে মাটির উপর নাক রাখিয়া ঘ্রাণ লইয়া লইয়া চলে। স্বীয় দেহের সমস্ত অঙ্গ ছাড়িয়া শুধু মলদ্বার শুকিতে থাকে। যখন ইহার দিকে পাথর নিক্ষেপ করিবে তখন দেখিবে যে, ইহা লোভ ও গোস্বার অতিশয্যের কারণে ইহা কামড়াইতে থাকে।

মোটকথা; ইহা খুব লোভী প্রাণী। অপদস্থ ও বদহিম্মত প্রাণী। তাজা গোশতের তুলনায় পঁচা গোশতের প্রতি অধিক অনুরাগী। মিষ্ট দ্রব্য অপেক্ষা অপবিত্র জিনিসের দিকে ইহার আগ্রহ অধিক। যদি একটি কুকুর এমন একটি মৃতজন্তু পায় যাহা শত শত কুকুর ভক্ষণ করিয়া শেষ করিতে পারিবে না, তাহা হইলেও দ্বিতীয় কোন কুকুরকে ইহার সামান্য পরিমাণও ভক্ষণ করিতে দিবে না। ইহা কুকুরের অত্যাধিক লোভ ও কৃপণতার পরিচায়ক। কুকুরের বিভিন্ন বদ অভ্যাসের মধ্যে ইহাও একটি যে, যখন সে কোন গরীব লোককে এবং ছিড়াফাটা কাপড় পরিহিত কোন লোককে দেখে তখন তাহার পিছনে পিছনে লেলাইয়া চলে। তাহার উপর হামলা করিয়া বসে। যেন সে ঐ ব্যক্তিকে

অপদস্থ ও নীচ মনে করে। এইরূপ করা অহংকারের নিদর্শন। যখন মূল্যবান পোশাক পরিহিত জাকজমকপূর্ণ ব্যক্তিকে দেখে তখন তাহার অনুগত হইয়া পড়ে, যেন ইহা তাহাদের অনুগত হওয়াতে লজ্জাবোধ করে না। আর ইহা খোশামোদকারীদের নিদর্শন।

যেহেতু কুকুরের মধ্যে এইসব নিন্দনীয় অভ্যাস রহিয়াছে সুতরাং যে ব্যক্তি কুকুরের গোশত খায় তাহার মধ্যেও এইসব নিন্দনীয় অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে। এই জন্যই এই জন্তুটি হারাম করা হইয়াছে। যেহেতু কুকুর পালন করিতে কুকুরের সাথে সাথে থাকিতে হয়– এই জন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পালন করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, যাহাতে ইহাদের নিন্দনীয় কুঅভ্যাসগুলি মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলিতে না পারে।

অধিকন্তু কুকুরের এইসব কুঅভ্যাসের প্রতি ফিরিশতাদের ঘৃণা রহিয়াছে। সুতরাং ইহার গোশত ভক্ষণকারী হইতেও ফিরিশতা দূরে থাকে। এই জন্যই যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। অবশ্য সৃষ্টির পরিচালনা ব্যবস্থায় নিয়োজিত ফিরিশতার বেলায় এই হুকুম প্রযোজ্য নহে। কুকুর ঘরে থাকা অবস্থায়ও তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া থাকে।

গিরগিট হারাম হওয়া এবং ইহা হত্যা করার জন্য শক্তভাবে তাগীদ করার রহস্য

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিট হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে পুড়াইবার জন্য নমরূদ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ অগ্নি আরও তেজ করিবার জন্য গিরগিট অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দিতেছিল।

এক প্রকার প্রাণী রহিয়াছে– সর্বদা গর্হিত ও শয়তানী কার্যে লিপ্ত থাকা যাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। ইহারা শয়তানের অতি নিকটবর্তী। শয়তানের ইশারা–ইঙ্গিতে ইহারা অন্যদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হইলেন যে, গিরগিটও এই প্রকার প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি জানাইয়া দিলেন যে, ইহা হযরত ইবরাহীম

(আঃ)–এর জন্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দিয়াছিল। শয়তানের প্ররোচনায় এইরূপ

করিয়াছিল। অধিকন্তু ইহা তাহার স্বভাবজাত কর্ম ছিল। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে এই ফুঁকের ফলে অগ্নিতে কোন প্রভাবই পড়ে নাই।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কারণে গিরগিট হত্যা করার প্রতি উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একঃ ইহা হত্যা করার ফলে মানুষের কষ্ট পাওয়ার একটি পথ বন্ধ হইল, যেন শয়তানী বাহিনী ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। আর শয়তানের কুমন্ত্রণার পথ রুদ্ধ হইল। দুইঃ ইহার গোশতের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়া গেল।

মাখযানুল আদবিয়া নামক গ্রন্থে গিরগিটের গোশত সম্পর্কে লিখা আছে যে, ইহা সাধারণভাবে কাহাকেও দংশন করে না, তবে যদি কোন সময় কাহাকেও দংশন করিয়া বসে তাহা হইলে দংশিত লোক মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় না। ইহার কোন চিকিৎসা নাই। ইহার গোশত বিষাক্ত। ইহার ভক্ষণ কারীও ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা ভক্ষণ করার ফলে বমি হইতে থাকে আর অন্তরে দারুণ ব্যথার সৃষ্টি হয়। ইহা সর্বদা সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকে। গরমের দিনে ইহার চেহারা লাল থাকে। ইহার লেজ সর্বদা উপরের দিকে খাড়া হইয়া থাকে। চক্ষু কুটুরীতে এই দিকে ঐ দিকে ঘুরাইতে থাকে, যাহাতে ইহার দৃষ্টি হইতে শিকার রেহাই পাইতে না পারে। যখন ইহার শিকার যেমন, মাছি বা অনুরূপ প্রাণী সামনে আসে তখন জিহবা বাহির করিয়া জিহবা দ্বারা পেঁচ দিয়া শিকার মুখের ভিতর লইয়া যায়। আর যখন দূর হইতে শিকার দেখে তখন সেখানে গিয়া শিকার করে। বিচ্ছু, কেন্না প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণীও শিকার করিয়া ভক্ষণ করে। ইহা হইতেও গিরগিট হারাম হওয়ার কথা বুঝা যায় যে, এইসব বিষাক্ত খাদ্যের কারণে ইহার গোশত ও বিষাক্ত হইয়া যায়।

পেঁচা ও বাদুড় হারাম হওয়ার কারণ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, খাদ্যের প্রভাব শুধু দেহের উপরই পড়ে না বরং আখলাক চরিত্র ও চালচলনের উপরও পড়িয়া থাকে। পেঁচা বোকা প্রাণী। ইহা সর্বজন বিদিত। এমনকি পেঁচার বোকামীর কথা প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন যখন কোন ব্যক্তি বোকা ও নির্বোধের ন্যায় কাজ করে– তখন তাহাকে বলে যে, "!হে উল্লু (পেঁচা) তুই! এমন কাজ কিভাবে করলি?"

মাখযান' নামক গ্রন্থের রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, এই প্রাণীর গোশত ভক্ষণের ফলে মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল ও অকর্মন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা হারাম হওয়ার কারণ পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইহার গোশত ভক্ষণ করার পর ভক্ষণকারী উল্লু (বোকা) হইয়া যায়।

বাদুড়ের অবস্থাও তদ্রূপ। অন্ধ হওয়া, বোকা হওয়া এবং অপদস্থ ও নীচ হইয়া থাকা ইহার স্বভাব। ইহার এই স্বভাবের কথা সকলেই জানে। এমন কি প্রবাদ হিসাবেও চালু আছে। যেমন, যখন কোন ব্যক্তি পরিষ্কার ও উজ্জ্বল সত্যকে অমান্য করে তখন তাহাকে বলা হয়- হে চামচিকা! উজ্জ্বল দিবসকেও রাত্র বলিতেছিস।"

সুতরাং যে ব্যক্তি বাদুড়ের মাংস ভক্ষণ করিবে সে সত্য দর্শনে অন্ধ হইয়া পড়িবে। এই জন্যই ইহার গোশত খাওয়া হারাম করা হইয়াছে।

গাধা ও খচ্চর হারাম হওয়ার কারণ

যে সকল প্রাণী নাপাক ও অপবিত্র জিনিসের মধ্যে জীবন-যাপন করে এবং তথায়ই অবস্থান করে, আর এইসব অপবিত্র বস্তুই ভক্ষণ করে, এমনকি ইহাদের দেহ পর্যন্ত নাপাক ও অপবিত্র ময়লা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে যেমন গাধা। গাধা এইসব অপবিত্র ময়লাযুক্ত বস্তুতে লেপটিয়া থাকার পরও গাধা নির্বোধ ও বোকা হয়। সাথে সাথে ইহা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত প্রাণী। এমন কি নির্বোধিতার ক্ষেত্রে ইহাকে প্রবাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

যেমন, যখন কেহ নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর কাজ করে তখন তাহাকে গাধা বলিয়া সম্বোধন করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি গাধার গোশত ভক্ষণ করিবে অবশ্যই তাহার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা, বোকামী ও বেতমীজীর প্রভাব পড়িবে। এই জন্তুর উল্লিখিত স্বভাব মানব জাতির স্বাভাবিক স্বভাবের পরিপন্থী। এই জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিমত মোতাবেকও ইহার গোশত ভক্ষণ না করা উচিত। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমন জন্তুর গোশত ভক্ষণ করিতে এবং দুধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহা অপবিত্র জিনিস ভক্ষণ করে। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হইল এই যে, যেহেতু এই জন্তুর অঙ্গসমূহ নাপাক জিনিস শোষণ করিয়া লইয়াছে। আর নাপাক জিনিসসমূহ প্রতিটি অঙ্গে

অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সেহেতু ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহও নাপাক বস্তুর পর্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। অথবা এমন প্রাণীর মত হইয়া গিয়াছে যে, নাপাক ও অপবিত্র ময়লার মধ্যে জীবন-যাপন করে।

হারাম প্রাণী ও হারাম বস্তু সৃষ্টি করার রহস্য

প্রশ্নঃ যেহেতু কোন কোন প্রাণী এবং কোন কোন বস্তু আহার করিতে মানুষকে নিষেধ করা হইয়াছে। আর এইগুলি মানুষের জন্য হারাম করা হইয়াছে, অতএব আল্লাহ পাক এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? অধিকন্তু এইগুলি মানুষের কি কাজে আসিতে পারে?

উত্তরঃ আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন যে,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا *

"তিনিই ঐ সত্তা যিনি যমীনে যাহাকিছু রহিয়াছে ঐ সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক সমস্ত হালাল ও হারাম জিনিস মানুষের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা একই বস্তু যদি এক কারণে হারাম হইয়া থাকে; ইহাই আবার অন্য কারণে হালাল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, গাধার গোশত ভক্ষণ করা হারাম কিন্তু গাধার উপর আরোহণ করা এবং ইহার পিঠে মালপত্র বহন করা হালাল। অনুরূপভাবে সকল প্রকার হিংস্র জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা হারাম কিন্তু ইহার চামড়া দ্বারা পোশাক প্রস্তুত করিয়া পরিধান করা হালাল। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রাণী ও অন্যান্য হারাম বস্তু সম্পর্কেও একই ধারণা পোষণ কর যে, এইগুলি এক দিক দিয়া হারাম আবার অন্য দিক বিবেচনায় হালাল। আর যে সকল প্রাণী থেকে কোনভাবে উপকৃত হওয়া যায় না- ইহাদের দ্বারাও আল্লাহর কুদরতের উপর প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায় যে, ইহাদের সৃষ্টি করার মধ্যেও হেকমত রহিয়াছে। এইগুলি দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং ব্যবহার করা ব্যতীত ইহাদের সৃষ্টি করার মধ্যে ইহাও একটি হেকমত যে, এইসব হারাম জিনিস আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমানা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

اَلَا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَحَارِمُهٗ *

"জানিয়া রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহের সীমানা রহিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার সীমানা হইল তাঁহার হারামকৃত জিনিসসমূহ।" সুতরাং ইহাতে বান্দাদের পরীক্ষা রহিয়াছে।

হারাম প্রাণী ও বস্তুসমূহের হারাম হওয়ার কারণসমূহের সারকথা

যে সকল প্রাণী হারাম করা হইয়াছে– উহার হারাম হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

১। অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত হওয়া।

২। হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করার ফলে মানুষের স্বভাবও হিংস্র হইয়া যায়।

৩। শয়তানী কার্যকলাপের সাথে সাদৃশ্যতা।

৪। কোন কোন প্রাণী ও বস্তু ভক্ষণ করার ফলে বিষাক্ত প্রভাব পড়ে বলিয়া এইগুলি ভক্ষণ করা হারাম।

৫। কোন কোন প্রাণী এমন রহিয়াছে, যাহার গোশত ভক্ষণ করার ফলে মানুষ বদ অভ্যাস ও বদ চরিত্র হইয়া যায়।

৬। কোন কোন জানোয়ার এমন রহিয়াছে, যাহার গোশত ভক্ষণ করার ফলে ভক্ষণকারীর মধ্যে বদ ইতিকাদ পয়দা হয়। যেমন গায়রুল্লাহর নামে যবেহকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করা।

টিকটিকি হারাম হওয়ার কারণ

'মাখযানুল আদবিয়া' নামক গ্রন্থে লিখা আছে যে, "ইহার আরবী নাম "ওযগ"। কিন্তু পরিভাষায় ইহাকে 'সামে আবরচ এবং শহরী ওযগ নাম রাখা হয়। ইহা ভক্ষণ করার দ্বারা মুখ থেকে রক্ত নির্গত হওয়া এবং ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি হয়।" উল্লিখিত অভিমত হইতে ইহা হারাম হওয়ার কারণ পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইহার গোশত ভক্ষণ করার ফলে মুখ থেকে রক্ত নির্গত হওয়ার রোগ ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। আর এইসব রোগের পরিণতি হইল ধ্বংস।

আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্যদের যবেহকৃত, আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত ও মৃতপশু হারাম হওয়ার দিক দিয়া সমপর্যায়ের হওয়ার কারণ

উল্লিখিত পশুগুলি সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রঃ) প্রশ্ন উত্তর আকারে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহার আলোচনার অনুবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি–

প্রশ্নঃ আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্যদের কর্তৃক যবেহকৃত পশু ও মৃতপ্রাণী হারাম হওয়ার দিক দিয়া সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার কি কারণ? প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইল এই যে, মৃতপ্রাণীর রক্ত পশুর দেহ হইতে নির্গত হয় না বরং দেহাভ্যন্তরেই শোষিত হইয়া যায়। আর গোশতের সাথে মিশিয়া যায়। এই কারণেই ইহার গোশত হারাম। কিন্তু আহলে কিতাব ব্যতীত অন্যান্যদের দ্বারা যবেহকৃত পশু ও আল্লাহর নাম ব্যতীত যবেহকৃত পশুর অভ্যন্তরে রক্ত শোষিত হয় না; বরং রক্ত বাহির হইয়া আসে। ইহা সত্ত্বেও এইসব জন্তু কিভাবে হারাম সাব্যস্ত হইতে পারে?

উত্তরঃ জন্তুর গোশত হারাম হওয়ার কারণ শুধু ইহাকেই একটিই মনে করা অর্থাৎ দেহের মধ্যে রক্ত শোষিত হওয়াকেই মনে করা ভুল। বরং হারাম হওয়ার বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। যদি শুধু রক্ত শোষিত হওয়ার কারণেই মৃতজন্তু হারাম হইত– তাহা হইলে এই প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য হইত। কিন্তু যেহেতু জন্তু হারাম হওয়ার কারণ বিভিন্ন রহিয়াছে– সেহেতু মাত্র এক কারণ পাওয়া যায় না বলিয়া অন্যান্য কারণে হারাম হইতে পারে না– এমন কথা বলা যায় না। কেননা এই কারণ না পাওয়া গেলে অন্যান্য কারণের কারণেও মৃতপ্রাণী হারাম হইতে পারে। চিন্তা করিলে এই ধরনের অনেক কারণ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এক কারণ না পাওয়া গেলে শরীয়তের নির্দেশ কিভাবে অস্বীকার করা যাইতে পারে? হয়তবা শরীয়ত অন্য কারণে এই ক্ষেত্রে নির্দেশ জারী করিয়াছে। (ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নমুনা হিসাবে সামনে আসিবে যে, জানোয়ার যবেহ করার সময় তকবীর পাঠ করার এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হারাম হওয়ার রহস্য কি?"

প্রশ্নঃ দুই প্রকার জন্তুর মৃত্যুর কারণ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কি শরীয়ত উভয় প্রকার মৃতজানোয়ার একই পর্যায়ভুক্ত করে নাই? যেন শরীয়ত দুইটি ভিন্ন ও বিপরীত বিষয়কে একত্রি করিয়াছে। পক্ষান্তরে দুইটি সাদৃশ্য ও একই পর্যায়ভুক্ত বিষয়কে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিকভাবে যবেহ একই প্রকার কার্য। অতঃপর ইসলামী শরীয়ত কোন কোন যবেহের পশু মৃত নয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আর কোন কোন যবেহকৃত পশু মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। অথচ এই পার্থক্যের কোন কারণ নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দুই সাদৃশ্য ও সমতুল্য বিষয়কে পৃথক পৃথক করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত পশু এবং মৃত পশুকে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে দুইটি বিপরীত জিনিসকে এক সাথে একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জবাবঃ শরীয়ত উভয় প্রকার মৃতের আভিধানিক নামের দিকে দৃষ্টি দিয়া উভয়কে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে নাই। (কারণ একটির আভিধানিক অর্থে ইহা মৃত বলিয়া নামকরণ করা হয়। আর অপরটিকে আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত বলা হয়।) বরং ইহাদিগকে শরয়ী নামের দিকে দৃষ্টি দিয়া একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মৃতের আভিধানিক অর্থ অপেক্ষা শরয়ী অর্থ ব্যাপক। (অর্থাৎ শরয়ী অর্থে মৃত শব্দ মৃতকে এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ কৃত পশুকেও শামিল করে।)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দটি কখনও আভিধানিক অর্থে কখনও ব্যাপক অর্থে আবার কখনও বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। পরিভাষাবিদরাও এইরূপই করিয়া থাকে। সুতরাং শরীয়ত ও পরিভাষা কোন ক্ষেত্রেই ইহা মন্দ নহে। অবশ্য এই দুইটিকে অর্থাৎ মৃতকে ও আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃতকে হারাম হওয়ার দিক দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। কারণ আল্লাহ পাক আমাদের জন্য নাপাক জিনিস হারাম করিয়াছেন।

কোন জিনিস হারাম হওয়ার কারণ হইল উহা নাপাক ও অপবিত্র হওয়া। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও হারাম হওয়ার এই কারণ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার কখনও কখনও গোপন রাখিয়াছেন। কিন্তু

যাহা গোপনীয় হয় উহাতে এমন একটি আলামত রাখা হয়, যাহা এই অপবিত্রতা ও নাপাকীর উপর দলীল হয়। সুতরাং যে জানোয়ার মরিয়া যায়, ইহাতে প্রবাহিত রক্ত শোষিত হইয়া যায় বলিয়া ইহা হারাম। সুতরাং ইহাতে নাপাকী ও অপবিত্রতা প্রকাশ্য। অধিকন্তু অগ্নিপূজক, মুরতাদ (ধর্মত্যাগী), বিসমিল্লাহ পাঠ বর্জনকারীর যবেহকৃত পশু আর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত পশু প্রভৃতির মধ্যে গোপনীয় অপবিত্রতা ও নাপাকী ছড়াইয়া থাকে। হারাম হওয়ার এই কারণটি গোপণীয় হওয়ার কারণে একটি নিদর্শন এই গোপনীয় কারণের স্থলাভিষিক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে নিদর্শনটি হইল– আল্লাহর নাম ছাড়িয়া যবেহ করা। এই গোপনীয় কারণের দিকে আল্লাহ পাক নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। অর্থাৎ জানোয়ার যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম পাঠ না করাকে আল্লাহ পাক ফেসক বলিয়াছেন। আর ফেসক (অশ্লীল কার্য) অপবিত্র। সুতরাং যেখানে অপবিত্রতা রহিয়াছে। তথায় হারাম হওয়ার হুকুম লাগে। আল্লাহ পাক বলেন–

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“এবং তোমরা ঐ জানোয়ার খাইও না, যাহার যবেহের সময় আল্লাহর নাম পাঠ করা হয় নাই। নিশ্চয়ই ইহা নাপাক অপবিত্র।” (সুরায়ে আনআম)

ইহার বিস্তারিত বিবরণ হইল এই যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম যবেহকৃত পশুকে পবিত্র করিয়া দেয়। আর যবেহকারী ও যবেহকৃত পশু থেকে শয়তান দূর এবং বিতাড়িত করে। পক্ষান্তরে যবেহ করার সময় যদি আল্লাহর নাম পাঠ না করা হয় তাহা হইলে যবেহকারী ও যবেহকৃত পশুর উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে এবং ইহাতে অনুপ্রবেশ করে। ফলে শয়তানের অপকৃষ্টতা ও অপবিত্রতা জানোয়ারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কেননা এই অবস্থায় শয়তান পশুর রক্তের স্থলাভিষিক্ত হয়। রক্ত শয়তানের সওয়ারী এবং বাহক হইয়া থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ بَنِي آدَمَ كَمَجْرَى الدَّمِ

“শয়তান বনী আদমের মধ্যে তাহার শিরাধমনী ও রক্ত প্রবাহিত হওয়ার

স্থান দিয়া চলে।” আর ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক অপবিত্র। যবেহকারী যখন আল্লাহর নাম পাঠ করে তখন যবেহকৃত পশুর ভিতর হইতে নির্গত রক্তের সাথে শয়তানও বাহির হইয়া পড়ে এবং যবেহকৃত পশু পবিত্র হইয়া যায়। যদি আল্লাহর নাম পাঠ না করা হয় তাহা হইলে এই অপবিত্রতা বাহির হইয়া আসে না। যখন আল্লাহ পাকের দুশমন শয়তানের ও ভূতের নাম লইয়া যবেহ করা হয় তখন যবেহকৃত পশুর মধ্যে অপবিত্রতা আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু অগ্নিপূজক প্রভৃতিরা যখন যবেহ করে তখন তো যেন আল্লাহর নামেই যবেহ করিতেছে। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের যবেহকৃত পশু হারাম হওয়ার কারণ হইল যে, যবেহ করা আল্লাহর ইবাদতের নামান্তর। এইজন্যই আল্লাহ পাক উভয় বিষয় একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ *

“সুতরাং তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং যবেহ কর।”

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

“হে নবী! আপনি বলুন; নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি সমস্ত দুনিয়ার পালনকর্তা।”

وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ط فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ * لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَائُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ *

“এবং বড় জানোয়ারসমূহকে (যেমন উট, গরু, মহিষ প্রভৃতি) আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন বানাইয়াছি। তোমাদের জন্য ইহাদের মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। তোমরা ইহাদের দলে দলে যবেহ করার অবস্থায় ইহাদের যবেহ করিতে আল্লাহর নাম পাঠ কর। অতঃপর যখন ইহারা কাঁত হইয়া যমীনের উপর পড়িয়া যায় তখন ইহাদের গোশত তোমরা নিজেরা খাও; আর যাহারা তোমাদের কাছে চায় না এবং যাহারা চায়– উভয় প্রকার লোককে

আহার করাও। এইভাবে আল্লাহ পাক এইসব পশুকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। আল্লাহর কাছে ইহাদের গোশত পৌছে না আবার ইহাদের রক্তও পৌছে না। কিন্তু তাঁহার কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌছে।”

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক বলিতেছেন যে, তিনি এই সব পশু মানুষের অধীন করিয়াছেন। তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছেন। তাহারা যেন আল্লাহর নামে ইহাদের যবেহ করে। কেননা মানুষের তাকওয়া আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণীয়। তাহা হইল– আল্লাহ পাকের অনুগত হইয়া তাহার নৈকট্য লাভ করা আর পশু যবেহ করার সময় তাহার নাম লইয়া যবেহ করা। সুতরাং পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম না লওয়া অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। কেননা এই অপছন্দনীয় কার্যের ফলে যবেহকৃত পশুর মধ্যে অপবিত্রতার প্রভাব পড়ে। অনুরূপভাবে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করিলে যবেহকৃত পশু মৃত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং আল্লাহর নাম পরিত্যাগ করার দ্বারা এবং অন্যের নামে পশু যবেহ করার কারণে পশু হারাম হইয়া যায়। ফলে আল্লাহর দুশমন; যে সর্বাধিক অপবিত্র মাখলুক তাহার নামে যবেহকৃত পশু অবশ্যই হারাম হইবে। কারণ যবেহকারীর কাজ, ইচ্ছা এবং তাহার অপবিত্রতা অবশ্যই যবেহকৃত পশুর উপর প্রভাব ফেলে।

যখন মৃত পশুর রক্ত পশুর গোশতের মধ্যে শোষিত হইয়া গোশতে পরিণত হইয়া যায়– তখন এই পশু হারাম হওয়ার কারণ কি?

এখানে এক বিষয়ের ফয়সালা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন যে, পশুর মৃত্যুর পর ইহার রক্ত গোশতের মধ্যে শোষিত হইয়া যায় না। রক্ত পরিবর্তন হইয়া গোশতে পরিণত হয়। অবশ্য পরিবর্তন হওয়ার জন্য হজম করার শক্তি এবং পরিবর্তন করার শক্তি থাকা জরুরী। দেহের সমস্ত শক্তি যেমন দর্শন ক্ষমতা এবং প্রাণশক্তি প্রভৃতি প্রাণী জীবিত থাকার সাথে সম্পর্কিত।

ইহার কারণ এই যে, প্রাণীর প্রাণ-শক্তির সাথে ইহার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ

যেমন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির সম্পর্ক একটি আয়নার উদাহরণ। আয়নার ভিতর কোন বস্তু আলোকিত হওয়ার জন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা অতঃপর ইহা বিচ্ছুরিত করার পিছনে অন্য একটি শক্তি কাজ করে, যাহা আয়নার ভিতর নাই; বরং ইহা সূর্যের ভিতর থাকে। ইহা সূর্য হইতে গৃহীত শক্তি। অনুরূপভাবে প্রাণীর প্রাণ-শক্তি প্রাণীর রূহের মধ্যে থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকে না। এই কারণেই সূর্যের সাহায্য ব্যতীত আয়না কোন বস্তু প্রতিবিম্ব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অক্ষম। অনুরূপভাবে রূহানী প্রাণ-শক্তির অভাবে প্রাণীর দেহ প্রাণী হিসাবে বেকার। সুতরাং প্রাণীর মৃত্যুর পর সর্ব শক্তির দিক দিয়া যখন ইহা অক্ষম; সুতরাং ইহার রক্ত পরিবর্তিত হইয়া গোশতে পরিণত হওয়াও অসম্ভব। অনুরূপভাবে গোশতের ভিতর রক্ত শোষিত হওয়ার শক্তি নাই, সুতরাং ইহাও অসম্ভব। এইজন্য মৃতপ্রাণী মৃত্যুর পর কাটিলে রক্ত বাহির হইয়া আসে না। আর যদি শোষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত।

হলকুমের উপর দিয়া পশু যবেহ করার হেকমত

১। অন্তর, কলিজা, প্রাণীর রক্ত জমা হওয়ার জায়গা আর এখান থেকে রক্ত বাহির করিবার জন্য সর্বাধিক নিকটবর্তী পথ হইল হলকুম। এইজন্যই রুগীর অন্তর ও কলিজা হইতে কোন উপাদান বাহির করিতে হইলে চিকিৎসকরা রুগীর হলকুমের রাস্তা দ্বারা বমি করাইয়া বাহির করে।

২। যদি এই স্থান ব্যতীত শরীরের অন্য কোন স্থান দ্বারা রক্ত বাহির করা হইত তাহা হইলে যবেহকৃত পশুর প্রাণ বাহির হইতে বিলম্ব হইত। ফলে পশু কষ্ট পাইত। আর হলকুমের উপর দিয়া যবেহ করার দ্বারা তাড়াতাড়ি পশুর প্রাণ বাহির হয়।

৩। শ্বাসের আসা-যাওয়ার রাস্তা ইহাই। অধিকন্তু শ্বাস রূহের সাহায্যকারী। সুতরাং রূহ এবং রূহের সওয়ারী অর্থাৎ রক্ত এই রাস্তা দিয়া বাহির হওয়াই সঙ্গত।

৪। খাদ্য হইতে রক্ত জন্ম লাভ করে। খাদ্য এই রাস্তা দিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সুতরাং দেহ হইতে রক্ত পৃথক করার সময় এই রাস্তা দিয়া পৃথক করাই সঙ্গত।

মৎস্য ও টিড্ডি যবেহ ব্যতীত হালাল হওয়ার কারণ

মৎস্য যবেহ না করার কারণ, মৎস্যের দেহের মূল উপাদান হইল পানি। পানির বৈশিষ্ট্য হইল যে, পানি পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারক। অধিকন্তু অপবিত্রতা পানিতে প্রভাব ফেলিতে পারে না। অনুরূপভাবে পানীয় জন্তুর প্রাণ পৃথক হওয়ার সময় অপবিত্রতা প্রভাব ফেলিতে পারে না। যেহেতু মৎস্যে অপবিত্রতা প্রভাব ফেলিতে পারে না সেহেতু ইহা যবেহ করারও প্রয়োজন নাই।

টিড্ডি যবেহ না করার করণ, টিড্ডির দেহে প্রবাহিত রক্ত থাকে না। সুতরাং ইহার দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক সরাসরি; রক্তের মাধ্যমে নয়। যেমন পাথর, পাহাড় গাছপালা প্রভৃতির সাথে ইহাদের রূহের সম্পর্ক সরাসরি। সুতরাং ইহার দেহ হইতে রূহ পৃথক হওয়ার সময় দেহ অপবিত্র হয় না; কারণ ইহাতে রক্ত নাই। আর দেহের গোশতে রক্ত শোষিত হইয়াই দেহ অপবিত্র হয়। অবশ্য পানিতে বসবাসকারী প্রাণী ও মাটির নীচে গর্তে বসবাসকারী পোকা মাকড়ের মধ্যে উল্লিখিত কারণ অর্থাৎ রক্ত না থাকার কারণ বিদ্যমান থাকার পরও ইহাদের জন্মগত অপকৃষ্টতা ও অপবিত্র স্বভাবের কারণে এবং ইহারা অপবিত্র ও ক্ষতিকর আহার্য্য হওয়ার কারণে ইহাদিগকে হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু মৎস্য এবং টিড্ডি জন্মগত অপকৃষ্ট ও অপবিত্র স্বভাব হইতে পবিত্র। এমনকি পরেও ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার অপকৃষ্ট ও অপবিত্র স্বভাব পাওয়া যায় না। তাই এই দুইটি প্রাণীকে হারাম হওয়ার গণ্ডি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ اَمَّا الْمَيْتَتَانِ الحُوْتُ وَ الْجَرَادُ وَ الدَّمَانِ الكَبِدُ وَ الطِّحَالُ*

"আমাদের জন্য দুইটি মৃতপ্রাণী ও দুইটি রক্ত হালাল করা হইয়াছে। মৃতপ্রাণী দুইটি হইল; মৎস্য আর টিড্ডি আর রক্ত দুইটি হইল; কলিজা ও প্লীহা।"

অনেকের সংশয় হইয়াছে যে, কলিজা ও প্লীহা দুইটি অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও ইহারা রক্তের সদৃশ? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের

সংশয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মন্তব্য করিলেন। অধিকন্তু মৎস্য ও টিড্ডির মধ্যে প্রবাহিত রক্তই নাই। তাই ইহাদের যবেহ করার প্রথা চালু হয় নাই।

উট, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং দুম্বা হালাল হওয়ার কারণ

১। উল্লিখিত পশুসমূহ প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বভাবের মোয়াফেক। ইহাদের স্বভাবও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মধ্যপন্থী। এই জন্য এইগুলিকে হালাল করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক এইসব জন্তুকে দানকৃত জন্তু বলিয়াছেন। ইহাদের স্বভাব মানব স্বভাবের অনুকূল ও মধ্যপন্থী হওয়ার কারণে জগতের অধিকাংশ মানুষ ইহাদের গোশত ভক্ষণ করিয়া থাকে। মানুষের জন্মগত স্বভাবের চাহিদা হইল এই যে, যেভাবে মানুষ মাটি হইতে উৎপন্ন শাক-শব্জী ও খাদ্য-শস্যকে আহার্য্য বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে অনুরূপ প্রাণী জগত থেকেও কিছু প্রাণী আহার্য্য হিসাবে গ্রহণ করুক। অধিকন্তু প্রাণী মানবের আহার্য্য বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হওয়াতে মানব স্বভাবের সাথে ইহাদের যথেষ্ট মিলও রহিয়াছে। এই জন্য আল্লাহ পাক মানবের জন্য প্রাণী হালাল করিয়াছেন।

২। যেহেতু মানবের মধ্যে কোমলতা ও উষ্ণতা উভয় বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তাহার খাদ্যেও উভয় গুণাবলী বিদ্যমান থাকা উচিত। তাই এমন সব প্রাণী মানুষের খাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে যাহাদের মধ্যে কোমলতা ও উষ্ণতা উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

হরিণ, বন্যগাধা, খরগোশ, উটপাখী প্রভৃতি হালাল হওয়ার কারণ

যেসব জানোয়ার জঙ্গলে বসবাস করে এবং গরু, ছাগল, উট প্রভৃতির সাথে সাদৃশ্য রাখে– ইহারা হালাল। কেননা ইহাদের মধ্যে গরু, ছাগল ও উটের পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। আর ইহাদের স্বভাব মানব স্বভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন হরিণ, বন্যগাধা ও উটপাখী প্রভৃতি।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্যগাধার গোশত হাদিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গোশত ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

মোরগ, জলকুকট, চড়ুঁই, কবুতর ও অনুরূপ প্রাণী হালাল হওয়ার কারণ

উল্লিখিত প্রাণীসমূহের গোশত মানুষের স্বভাবের উপযোগী এবং মানবের জন্য উপকারী। তাই ইহাদের গোশত হালাল করা হইয়াছে।

বেহেশতে মদ্য হালাল হওয়ার কারণ

প্রশ্নঃ ইহজগতে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম; অথচ বেহেশতে বৈধ। ইহা কেন?

উত্তরঃ আল্লাহ পাক বলেন যে, দুনিয়ার ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টিকারক মদ্যের সাথে বেহেশতের মদ্যের কোন সম্পর্ক নাই। তাই বেহেশতের মদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَ سَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا *

"মানুষ যখন বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এমন মদ্য পান করাইবেন যাহা নিজেও পবিত্র আর পানকারীর অন্তরকেও পবিত্র করিবে।"

বেহেশতী মদ্য সম্পর্কে ইহাও বলিয়াছেন–

وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يَسْمَعُوْنَ

فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا *

"আয়াতসমূহের সারকথা হইল এই যে, "ইহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মদ্যের পেয়ালা যাহা নির্মল স্বচ্ছ পানির ন্যায় পরিচ্ছন্ন। ইহা বেহেশতীদের দেওয়া হইবে। ইহা মাথা ব্যথা সৃষ্টি করা, বেহুশী ও মাতালতা সৃষ্টি করার দোষ হইতে পবিত্র। বেহেশতে কোন প্রকার অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজন কথাবার্তা শুনা যাইবে না। কোন গোনাহের কথাও শুনা যাইবে না। বরং প্রতিদিক হইতে সালাম আর সালাম শুনা যাইবে, যাহা রহমত ও মহব্বতের নিদর্শন।"

ইহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, মদ্যের মধ্যে দুইটি বৈশিষ্ট্য হয়। একটি নেশা। অপরটি আনন্দ। উভয়ের মধ্যে একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। নেশা হইল

বেহুশীর নাম। আর বেহুশীর মধ্যে পেরেশানীও নাই আবার আরামও নাই, চিন্তাও নাই আবার আনন্দও নাই।

নেশা ও আনন্দ একত্রিত হইতে পারে না। যেমন বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত বস্তুর মধ্যে উষ্ণতা ও শীতলতা একত্রিত হইতে পারে না। যেহেতু উষ্ণতা ও শীতলতা একে অপরের বিপরীত। সেহেতু এই দুইটি এক বস্তুর প্রভাব হইতে পারে না। এই কারণে পানি এবং অগ্নিকে পৃথক পৃথক স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি বিষয় এক বস্তুতে হইতে পারে না সেহেতু নেশা এবং আনন্দ এক বস্তুর প্রভাব হইতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, নেশা এক জিনিসের বৈশিষ্ট্য আর আনন্দ অপর জিনিসের বৈশিষ্ট্য। যদি মদ্যের মধ্যে এমন জিনিস না থাকে যাহার বৈশিষ্ট্য নেশা; বরং আল্লাহর কুদরতী চালনি দ্বারা চালিয়া ইহা হইতে পৃথক করিয়া দেয়। তখন এই অবস্থায় মদ্যের মধ্যে শুধু স্বাদ আর আনন্দই অবশিষ্ট থাকিবে। তখন প্রত্যেক বিবেকবানের মতে মদ্যপান নিশ্চয়ই হালাল হইবে।

মোটকথা; সকল বিবেকবান এবং মদ্য হারাম স্বীকারকারীদের মতে মদ্য হারাম হওয়ার কারণ হইল নেশা। যতক্ষণ পর্যন্ত মদ্যে নেশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা মদ্য হারাম বলে। যদি মদ্য সিরকায় পরিণত হয় আর ইহাতে নেশা না থাকে তাহা হইলে ইহা পান করিতে মুসলমানরা দ্বিধাবোধ করে না। অনুরূপভাবে কুরআন ও হাদীছেও এই কারণই উল্লেখ রহিয়াছে। মোটকথা; মদ্য হারাম হওয়ার কারণ হইল মদ্য নেশাদার হওয়া।

যেহেতু ইহা একটি পৃথক জিনিসের সাথে কায়েম রহিয়াছে আর এই কারণে ইহা পৃথক হওয়া সম্ভব সুতরাং মদ্য হইতে ইহা পৃথক হইয়া পড়িলে মদ্যে একমাত্র আনন্দদায়ক উপাদানটি বিদ্যমান থাকিবে। আর ইহা সত্য যে, যাহারা মদ্যপান করে, আনন্দ লাভের জন্যই করে। বেহুশ হওয়ার জন্য পান করে না। আল্লাহ পাকের কালামেও বেহেশতের মদ্যে স্বাদ রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। আর স্বাদই আনন্দের মূল জিনিস। আর ইহাতে নেশা নাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মদ্য অবৈধ হওয়ার কারণও মদ্যে নেশা বিদ্যমান থাকা। আল্লাহ পাকের কালাম– لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ "ইহাতে কোন অনর্থক কথা নাই আবার গোনাহেরও কথা নাই।" ইহার উপর দলীল।

অধিকন্তু পার্থিব জগতে নেশাদার জিনিস এই জন্য নিষিদ্ধ যে, মানুষ নেশাগ্রস্ত থাকার সময় আল্লাহ পাকের নির্দেশসমূহ পালন করিতে পারে না। দুনিয়াবী জীবন বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত এই সম্ভাবনা বিদ্যমান। মৃত্যুর পর সমস্ত আহকাম রহিত হইয়া যায়। বেহেশতে মানুষ সর্বপ্রকার আহকাম হইতে মুক্ত। সুতরাং সেখানে মদ্য হালাল হইলে কি অসুবিধা হইবে?

পাত্রে মাছি পড়িলে উহাকে ডুবাইয়া বাহির করার কারণ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَاِنَّ فِيْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِيْ الْاُخَرِ دَاءٌ *

"যখন তোমাদের কাহারও পাত্রে মাছি পতিত হয় তখন ইহা যেন পাত্রে ডুবাইয়া দেয়। অতঃপর ইহা যেন পাত্র হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয়। কেননা ইহার এক ডানাতে রহিয়াছে ঔষধ আর অপর ডানাতে রহিয়াছে রোগ।"

অন্য এক রেওয়ায়েতে ইহাও আসিয়াছে যে, মাছির যে ডানাতে রোগ রহিয়াছে, সে যেন উহা প্রথমে পাত্রে ডুবাইয়া দেয়।

ইহার বিস্তারিত আলোচনা এই যে, আল্লাহ পাক প্রাণীর স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছেন দেহের পরিচর্যার জন্য। প্রাণী–দেহে এমন কিছু কষ্টদায়ক উপাদান জন্ম নেয়, যাহা প্রাণী দেহের অংশ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। স্বভাব অধিকাংশ সময় এইসব উপাদানকে দেহাভ্যন্তর হইতে দেহের বাহিরের অংশের দিকে তাড়াইয়া দেয়। এই জন্যই জানোয়ারের লেজ খাওয়া নিষেধ করা হইয়াছে। মাছি অনেক সময় দেহের অপকৃষ্ট ও খারাপ বস্তুসমূহ ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যাহা দেহের অংশ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর মাছির স্বভাব ভক্ষিত এইসব অপকৃষ্ট উপাদানসমূহকে ইহার স্বল্প মর্যাদার অঙ্গ অর্থাৎ ডানার দিকে তাড়াইয়া দেয়। আল্লাহ পাকের হেকমত হইল যে, আল্লাহ পাক যে জিনিসের মধ্যে বিষ রাখিয়াছেন আবার ঐ জিনিসের মধ্যে বিষ নষ্টকারী উপাদানও রাখিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জানোয়ারের বিষ নষ্টকারী উপাদান ঐ জানোয়ারের মধ্যেই রাখিয়াছেন। যেমন সাপের বিষ নষ্টকারী উপাদান সাপের

মাথার মধ্যে রাখিয়াছেন। অন্যান্য প্রাণীরও একই অবস্থা। যদি কোন প্রাণীর মধ্যে বিষ থাকে আর বিষ নষ্টকারী উপাদান বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে এই প্রাণী জীবিতই থাকিতে পারিবে না।

পানি ও অন্যান্য পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা এবং ফুঁক দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِيْ الْاِنَاءِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ فَلْيَنَحِّ الاِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ اِنْ كَانَ يُرِيْدُ

"আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ পান করে তখন সে যেন পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। যদি নিঃশ্বাস ফেলিতে চায়– তাহা হইলে পাত্র হইতে যেন মুখ সরাইয়া লয়। আবার যখন পান করিবার ইচ্ছা করে তখন যেন পাত্রে মুখ লাগায়।"

অন্য এক হাদীছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ *

"রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে কখনও ফুঁক দেন নাই।"

অন্য এক হাদীছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছেঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّنْفَخَ فِيْ الاِنَاءِ

"পাত্রে ফুঁক দিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।" (ইবনে মাজা)

পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা ও পানিতে ফুঁক দেওয়া এই জন্য নিষেধ যে, নিঃশ্বাস সর্বপ্রকার দুষিত ময়লাসহ বাহির হইয়া আসে। যদি পানিতে নিঃশ্বাস ফেলা হয় বা ফুঁক দেওয়া হয় তাহা হইলে দুষিত ময়লা পানিতে মিশিয়া পানি দুষিত হইয়া যায়। এইসব দুষিত পদার্থ দেহের ভিতর হইতে নাকের মাধ্যমে

বাহিরে আসে। আবার পানির সাথে মিশিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে দেহের ভিতর কঠিন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা যেন এক খোদায়ী মেশিন। ইহার মাধ্যমে সর্বপ্রকার ময়লা, দুষিত পদার্থ সর্বদা বাহিরে বাহির হইয়া আসে। আর সতেজ ও নির্মল বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে। এইভাবে মানবের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে।

সারকথা; দেহের ভিতরের দুষিত আবর্জনা এবং ময়লাযুক্ত উপাদান যাহা শ্বাসের মাধ্যমে বাহির হইয়া আসে তাহা শ্বাসের মাধ্যমে আহার্য্য বস্তুর সাথে মিশানো এই জন্য নিষিদ্ধ যে, ইহা হইতে দেহের ভিতর বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

গোশত ভক্ষণ করা মানুষের জন্য কেন জায়েয হইল?

আল্লাহ পাক মানুষকে সিংহ, চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ প্রভৃতির ন্যায় ধারালো দন্ত দান করিয়াছেন। ইহা ইঙ্গিত করিতেছে যে, মানুষের প্রকৃত খাদ্য গোশত। বিবেকবান লোকদের কাছে ইহা গোশত ভক্ষণের অনুমতি প্রদান অপেক্ষা কম নয়। আল্লাহ পাক মানুষকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা কোন না কোন কাজের জন্য দিয়াছেন। যেমন চক্ষু দেখার জন্য, কর্ণ শ্রবণ করিবার জন্য। সুতরাং ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহাদের দ্বারা দেখা ও শ্রবণ করার অনুমতি রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ধারালো দাঁতের কথা চিন্তা করা যাক। তবে এতটুকু কথা সত্য যে, সকল প্রাণীর গোশত এক রকম নয়। প্রত্যেকের গোশতের মধ্যে পৃথক পৃথক প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং যে প্রাণীর গোশত মানুষের জন্য উপকারী উহার গোশত ভক্ষণ করা জায়েয। আর যে প্রাণীর গোশত ক্ষতিকর– ক্ষতির পরিমাণ মোতাবেক উহার গোশত না জায়েয। কেননা আল্লাহ তা'আলার আদেশ, নিষেধ মানুষের লাভ ও ক্ষতির ভিত্তিতে হইয়া থাকে। আল্লাহর লাভ ও ক্ষতির ভিত্তিতে নয়। এইজন্যই শূকর ও সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী নিজেদের বদ চরিত্র ও বদ অভ্যাসের কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। আর এই ভিত্তিতেই ইহাদের গোশত ভক্ষণ হারাম করা হইয়াছে, যাহাতে ইহাদের গোশত ভক্ষণের ফলে মানুষ বদ স্বভাবী না হইয়া পড়ে। যেমন গরম খাদ্য-দ্রব্যের দ্বারা শরীরে উষ্ণতা আর অন্যান্য

খাদ্য-দ্রব্যের দ্বারা শীতলতা পয়দা হয়। অনুরূপভাবে প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করার দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রাণীর অভ্যাসের অনুরূপ অভ্যাস ও চরিত্র জন্ম লাভ করে।

গোশত এবং শাক শব্জী আহার করার দ্বারা মানবের রূহানী আখলাক কি ভাবে পয়দা হয়?

ইতিপূর্বে আমরা লিখিয়াছি এবং এখনও স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, খাদ্য মানুষের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যেমন গরম আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করার ফলে শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া আর ঠাণ্ডা আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করার ফলে শরীর শীতল ও ঠাণ্ডা থাকা সর্বজন সম্মত বিষয়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করার ফলে মানবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে থাকে। দৈনন্দিন শাকশজী ও খাদ্য-শস্য ভক্ষণ করার ফলে মানবিক স্বভাবে নম্রতা কোমলতা, ধৈর্য এবং অনুগ্রহ পয়দা হয়। গোশত ভক্ষণ করার ফলে বীরত্ব, সাহস, শক্তি এবং ক্রোধের মধ্যে আলোড়ণ পড়ে। কারণ উষ্ণতা ও কোমলতা উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের ধারক মানুষ।

এই জন্য মানুষের জন্য শাকশজী ও গোশত উভয় হালাল করা হইয়াছে। যদি মানুষের মধ্য হইতে ক্রোধের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা হইলে মানুষ মানবিক গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। আর তাহার অনেক বিষয়ে ত্রুটি দেখা দিবে। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে গরম হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া জরুরী। কখনও তিক্ত ঔষধ উপকারী প্রমাণিত হয়। আবার কখনও মিঠা ঔষধ। যে ক্ষেত্রে তিক্ত ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজন তথায় মিঠা ঔষধ ব্যবহার করিলে ক্ষতি হইবে। উপকারের স্থলে অপকার হইবে। অনুরূপভাবে কখনও রাগ-ক্রোধের দ্বারা কার্য হাসিল হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে নরম আচরণ খুব ক্ষতিকর হয়। আবার কখনও কখনও কোমল ও নরম আচরণের দ্বারা সমস্যার সমাধান করিতে হয়। রাগ ও গোস্বা এই ক্ষেত্রে সবকিছু হরমদরম করিয়া ফেলে। আহার্য্য বস্তু সম্পর্কেও অনুরূপ চিন্তা করা যায়। মরিচ খুব ঝাল, নিম খুব তিক্ত, চিনি খুব মিষ্টি। মানুষের জন্য এইগুলি সৃষ্টি করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সর্বদা একই জিনিস ব্যবহার করা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কখনও তিক্ত, কখনও

মিষ্টি দ্রব্য, কখনও ফলমূল, শস্যদানা, কখনও শাকশজী, কখনও গোশত ব্যবহার করা উচিত। অনুরূপভাবে কখনও অনুগ্রহ করা উচিত। আবার কখনও রাগ ও ক্রোধ করা উচিত। এইভাবেই ইনসাফ কায়েম হইবে।

মানুষের মধ্যে গোস্বা হওয়া, ধৈর্য ধারণ করা প্রভৃতির শক্তি থাকার হেকমত

মানুষের স্বাভাবের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ফলে বুঝা যায় যে, তাহাকে বিভিন্ন ধরনের শক্তি প্রদান করা হইয়াছে, যাহাতে সে বিভিন্ন সময় স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তাহার শক্তিসমূহ ব্যবহার করিতে পারে। মানুষের এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, মানুষ কোন কোন স্বভাবের দিক দিয়া ছাগলের সদৃশ। আবার কোন কোন স্বভাবের দিক দিয়া সিংহের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহ পাক মানুষের কাছে চাহিতেছেন যে, মানুষ যে সময় ছাগলের ন্যায় নম্র হওয়া প্রয়োজন তখন যেন সে ছাগলের ন্যায় নম্র হইয়া পড়ে। আবার যখন সিংহের ন্যায় হওয়ার প্রয়োজন হয়- তখন যেন সে সিংহের ন্যায় হইয়া পড়ে। আল্লাহ পাক কখনও চান না যে, মানুষ সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে ছাগলের ন্যায় ভীত ও নম্র থাকে। আবার সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে সিংহই হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ পাক ইহাও চান না যে, মানুষ সর্বক্ষণ নিদ্রিত থাকুক বা সর্বক্ষণ জাগ্রত থাকুক। অথবা তিনি ইহাও চান না যে, মানুষ সর্বক্ষণ আহার করুক বা সর্বক্ষণ মুখবন্ধ করিয়া রাখুক। অনুরূপভাবে তিনি ইহাও চান না যে, মানুষ তাহার আভ্যন্তরিণ শক্তিসমূহ থেকে মাত্র একটি শক্তির উপর জোর দিক আর অন্যান্য শক্তি অনর্থক ও বেকার মনে করুক। যেই আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে ধৈর্য ধারণ, নম্রতা, অনুকম্পা, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী রাখিয়াছেন। ঐ আল্লাহই তাহার মধ্যে রাগ হওয়া ও প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছার শক্তি রাখিয়াছেন। সুতরাং খোদা প্রদত্ত কোন শক্তিকে সীমার বাহিরে ব্যবহার করা আর অন্য শক্তি পৃথক করিয়া রাখার মধ্যে কি সামঞ্জস্য থাকিতে পারে? ইহার ফলে তো আল্লাহ পাকের উপর আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে, তিনি তো মানুষের মধ্যে কোন কোন শক্তি এমনও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা ব্যবহার যোগ্য নয়। কেননা মানুষের মধ্যে উভয় প্রকার শক্তি তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কোন শক্তিই খারাপ নহে। তবে ইহার অপব্যবহার

খারাপ। কুরআন পাকে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفٰى وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ *

আয়াতের সারকথা; যদি কেহ তোমাকে কোন দুঃখ দেয়, উদাহরণ স্বরূপ; দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে অথবা চক্ষু ছিদ্র করিয়া দিয়াছে– ইহার শাস্তি এই পরিমাণ দুঃখ দেওয়া যাহা সে দিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায় তুমি তাহার অপরাধ মাফ করিয়া দাও যে, তোমার ক্ষমার কোন শুভ ফলাফল প্রকাশ পায় আর তাহাকে সংশোধন করে। (অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ, ভবিষ্যতে সে এই খারাপ অভ্যাস হইতে ফিরিয়া আসে।) এই অবস্থায় তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই উত্তম। আল্লাহ পাকের কাছে এই ক্ষমার বিনিময় পাওয়া যাইবে।

এই আয়াতে উভয় দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সময়ের সুযোগ ও অবস্থার চাহিদার সাথে ক্ষমা করা ও প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে সম্পর্কিত করা হইয়াছে। ইহাই সূক্ষ্ম দর্শনভিত্তিক পন্থা। বিশ্ব নিখিলের পরিচালনা এই পন্থায়ই হইয়া থাকে। স্থান কালের প্রতি খেয়াল রাখিয়া গরম ও ঠাণ্ডা ব্যবহার করা বিবেকবানের কাজ। যেমন তোমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছ যে, আমরা শুধু এক প্রকার খাদ্যের উপর সর্বদা জোর দিয়া থাকিতে পারি না। বরং সময় সাপেক্ষে গরম ও ঠাণ্ডা খাদ্য পরিবর্তন করিতেছি। শীত ও গ্রীষ্মকালে কালের উপযোগী পোশাকও পরিবর্তন করিতেছি।

অনুরূপভাবে আমাদের চরিত্রগত অবস্থাও সময় সাপেক্ষে পরিবর্তন হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাগ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে নরম আচরণ ও ক্ষমা করার দ্বারা অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িবে। অনুরূপভাবে নরম আচরণ ও বিনয় প্রদর্শনের স্থান রহিয়াছে। সে ক্ষেত্রে শক্তি প্রদর্শন করা নীচ পর্যায়ের লোক বলিয়া মনে করা হইবে।

সারকথা; প্রত্যেক সময়, প্রত্যেক স্থানের পৃথক পৃথক চাহিদা রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সময়ের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল না রাখে সে জানোয়ার। মানুষ নহে, সে বন্য; সভ্য নহে। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা, অপরাধী এবং অত্যাচারীকে শাস্তি প্রদান না করা কুরআনী শিক্ষা নহে; বরং কুরআনী শিক্ষা হইল এই যে, অপরাধ মাফ করা যায় না, শাস্তিই প্রদান করিতে হইবে। এই

দিকটি বিবেচনা করা। সুতরাং অপরাধীর ক্ষেত্রে হউক বা সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রেই হউক যে ব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেতে কল্যাণকর সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কোন কোন সময় কোন অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার দ্বারা সে আরও সাহসী হইয়া উঠে। আল্লাহ পাক বলেন, অন্ধের ন্যায় শুধু অপরাধ ক্ষমা করার অভ্যাস করিও না। বরং খুব চিন্তা করিয়া দেখ যে, সত্যিকারের কল্যাণ কিসের মধ্যে? মাফ করার মধ্যে, না শাস্তি প্রদানের মধ্যে? সুতরাং যে ব্যবস্থা সময় ও সুযোগ উপযোগী হয় তাহাই গ্রহণ কর।

জানোয়ার যবেহ করার সময় তকবীর বলার রহস্য

প্রত্যেক প্রভাবের জন্য একটি প্রভাব বিস্তারকারী অবশ্যই প্রয়োজন। যেমন সূর্যের প্রভাবে আয়না আলোকিত হয় এবং আঁতশ কাঁচের ভিতর সূর্যের কিরণের তাপ আসে। উভয় ক্ষেত্রে সূর্য প্রভাব বিস্তারকারী। আর আয়না ও আঁতশ কাঁচ গ্রহণকারী বা প্রভাবিত। যদি সূর্য না থাকে তাহা হইলে আয়নার আলোক আর আঁতশ কাঁচের দহন প্রকাশ পাইবে না। আর যদি আয়না ও আঁতশ কাঁচ না থাকে তাহা হইলেও এই আলোক ও দহন প্রকাশ পাইবে না।

অনুরূপভাবে তাকবীর, আল্লাহর নাম উচ্চারণ প্রভৃতি প্রভাব বিস্তারকারী। হালাল প্রাণীসমূহ প্রভাব কবুলকারী। যদি প্রভাব বিস্তারকারীর দিক খালি হয় অথবা আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কাহারও নাম উচ্চারণ করা হয়– তাহা হইলে পশু হালাল হওয়া কল্পনা করা যায় না। যদি প্রভাব গ্রহণকারীর দিক সম্পূর্ণ খালি হয় অথবা হালাল প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী যবেহ করা হয়– তাহা হইলেও প্রাণী হালাল হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না।

তাকবীর কার্যকর ও প্রভাব বিস্তারকারী সাব্যস্ত হওয়ার রহস্য; জানোয়ারের শরীর, রূহ, হাত, পা, চক্ষু প্রভৃতি আহার পানাহার, পেশাব পায়খানার দিক দিয়া মানুষের ন্যায় হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের হেকমত জানোয়ারকে মানুষের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছে। আর মানুষকে আল্লাহ পাক ইহাদের উপর শক্তি দান করিয়াছেন। ইহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে নিয়ামত। সুতরাং এই সকল জানোয়ারের প্রাণ বাহির করিবার সময় আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এই নিয়ামতের কথা ভুলিয়া যাওয়া কোন অবস্থায়ই ঠিক নয়। এই নিয়ামতের

কথা না ভুলার পন্থা হইল ইহাদের যবেহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা। যেমন আল্লাহ পাক বলিতেছেন,

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

"তাহারা যেন ঐ সকল চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যাহা আল্লাহ পাক তাহাদিগকে রিযিক স্বরূপ দিয়াছেন।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, খাদ্য-শস্য, ফলমূল প্রভৃতি বনী আদমের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে- ইহা সকলে জানে। কে ইহা জানে না যে, যদি এই সকল জিনিস না হইত তাহা হইলে বনী আদমের জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িত। তবে বনী আদমের জন্য প্রাণী হালাল হওয়ার বিষয়টি অপ্রকাশ্য। কেননা ইহাদের হাত, পা, কান, চোখ প্রভৃতি শক্তিশালী অঙ্গসমূহ মানুষের ন্যায় ইহাদের জন্যও উপকৃত হওয়ার যন্ত্রবিশেষ।

খাদ্য-শস্য ফলমূল প্রভৃতি মানুষের কাজে আসে। পক্ষান্তরে প্রাণী মানুষের সদৃশ বলিয়া মনে হয়। খাদ্য শস্য ও ফলমূলের হাত, পা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি নাই। তাই ইহা মানুষের সদৃশ নয়। সুতরাং খাদ্য-শস্য ও ফলমূল সৃষ্টি করাই মানুষের জন্য হালাল হওয়ার অনুমতি দেওয়া। পক্ষান্তরে প্রাণী যেহেতু মানব সদৃশ- তাই ইহাদের শুধু সৃষ্টি করাই মানবের জন্য হালাল হওয়ার অনুমতি নয়। বরং ইহাদের হালাল হওয়ার জন্য পৃথকভাবে অনুমতির প্রয়োজন।

কারণ, যবেহ করার সময় যে কষ্ট প্রদান করা হয়- তাহা হইল কষ্ট প্রদানের চরম পর্যায়। কেননা যবেহ করা হইল হত্যা করা। অনুমতি ব্যতীত যবেহ করিলে নিঃসন্দেহে ইহা হইবে চরম পর্যায়ের জুলুম। কেন জুলুম সাব্যস্ত হইবে না? আমাদের আর তোমাদের মালিকানা তো নামে মাত্র মালিকানা। আর আমাদের মালিকানাধীন কোন জিনিস অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা জুলুম মনে করা হয়। সুতরাং আল্লাহ পাকের মালিকানাধীন কোন জিনিস বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা জুলুম হইবে না কেন? সুতরাং জানোয়ার ব্যবহার করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন। সকলেই জানে যে, মালিকের পক্ষ হইতে তখনই অনুমতি পাওয়া যায় যখন ব্যবহারকারী মালিককে মালিক মনে করে। যদি মালিককে মালিক মনে না করিয়া অন্যকে মালিক মনে করিয়া বসে, তাহা হইলে

মালিকের মর্যাদাবোধের কারণে মালিকের পক্ষ হইতে অনুমতির পরিবর্তে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

অনুরূপভাবে পুরস্কারের আশা তখনই হইতে পারে যখন মালিকের হক মালিককে আদায় করা হয়। যদি মালিকের হক অন্য কাহাকেও আদায় করা হয় তখন সে মালিকের পক্ষ হইতে পুরস্কার পাওয়া দূরের কথা বরং সে শাস্তিযোগ্য হইয়া পড়িবে। এই জন্যই অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া আর প্রাপ্ত না হওয়ার মধ্যে সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য যবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের মালিকানার ও যবেহের অনুমতির ঘোষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। মুসলমান ও আসমানী কিতাবের অনুসারীদের ধর্মমতে জন্তু যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা জরুরী মনে করার ইহাই কারণ বলিয়া মনে হয়।

সারকথা; যবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করিয়া যবেহ করা সম্পূর্ণ রূপে বিবেক সম্মত।

আল্লাহ পাকের নাম ব্যতীত অন্য নামে যবেহকৃত জানোয়ার হারাম হওয়ার কারণ

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া আল্লাহ পাকের অনুমতির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ পাকের অনুমতির ঘোষণা হওয়া জরুরী, যাহাতে যবেহের অবস্থা দেখিয়া এমন ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, যবেহকারী আল্লাহ পাকের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। অথবা আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীতই আল্লাহর অধীনস্থ ভাল ভাল জিনিসকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছে। আর এইরূপ করার দ্বারা তো সে জালেম হিসাবে গণ্য হইবে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ সাব্যস্ত হইবে।

অধিকন্তু অনুমতি প্রদানের ঘোষণার মধ্যে এই ফায়দাও রহিয়াছে যে, আল্লাহর নাম শুনিয়া জানোয়ারের জন্য খোদার মালিকানার ও স্বীয় অধীনস্থতার বিশ্বাসের উপর প্রাণ দেওয়া সহজ হইয়া যাইবে।

মোটকথা; আল্লাহ পাক সকল বাদশাহের বাদশাহ। আর প্রাণী তাঁহার অধীনস্থ। সুতরাং যদি ইহাদের যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার উপর ইহারা হালাল হওয়া মওকুফ হয়। আর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম

উচ্চারণ করিলে হারাম হইয়া যায়। তাহা হইলে এই হুকুমটি যুক্তি সম্মত ও সঠিক হইয়াছে। কেননা মালিকের অনুমতিতে তাহার মালিকানাধীন বস্তু ব্যবহার করিলে মালিকের অসন্তুষ্টি থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা মালিকের সহ্য হওয়ার কথা নয়। যদি মালিকের পক্ষ হইতে অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তাহার মালিকানাধীন কোন বস্তুকে অন্যের বলিয়া দাবী করিয়া থাকে, আর অন্যের নামেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যবহার কারীর এই পন্থা মালিকের পছন্দ হওয়ার তো কোন কথাই উঠে না; বরং ব্যবহারকারী বিদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত। তাহার জন্য বিদ্রোহীতার শাস্তি নির্ধারিত। তাহার থেকে সে বস্তু কাড়িয়া লওয়া অপরিহার্য।

এই কারণেই খোদার নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত পশু অথবা অন্যের জন্য মনে করিয়া নামে মাত্র আল্লাহর নামে যবেহকৃত পশু মুসলমানগণ হারাম বলিয়া থাকে। যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করার অপকৃষ্টতা উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গেল।

মদ্য এবং জুয়া খেলা হারাম হওয়ার কারণ

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং জাতীয় ব্যবস্থাপনা বিবেক ও বিবেচনা ব্যতীত পরিপূর্ণ হইতে পারে না। মদ্যপানের ফলে মানুষের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইহার দ্বারা ঝগড়াবিবাদ ও ব্যক্তিগত পেরেশানীর সৃষ্টি হয় এবং মানুষের স্বভাবে যেসব অনর্থক চাহিদা রহিয়াছে তাহা মানুষের বিবেককে পরাজিত করিয়া ফেলে। অতঃপর স্বভাবে এমন এমন বদঅভ্যাস পয়দা হয় যে, সংশোধনের সর্বপ্রকার চেষ্টা প্রয়াস নষ্ট করিয়া ফেলে। যদি ইহাদের গতিপথে বাধা না দেওয়া হয় তাহা হইলে মানুষ ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এই প্রতিবন্ধকতার জন্য মদ্য হারাম করা হইয়াছে।

মদ্যপানে অনেক খারাবির আশংকা রহিয়াছে, যাহার কারণে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন। মদ্যের প্রভাবে খোদার দিকে খালেছভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ব্যবস্থাপনা বিশৃঙ্খল হইয়া

পড়ে। এই জন্য আল্লাহ পাক মদ্যকে নাপাক বলিয়াছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেনঃ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ "মদ্য নাপাক ও শয়তানের আমল।"

এই জন্য আল্লাহ ইহাকে খুব শক্তভাবে হারাম করিয়াছেন। হেকমতে ইলাহীর চাহিদা হইল এই যে, ইহাকে মলমূত্রের সমপর্যায় বলিয়া ঘোষণা করা হউক, যাহাতে ইহার উপকৃষ্টতা ও ক্ষতির দিকটি মানুষের সামনে ধরা পড়ে। আর মানুষ নিজে নিজেই ইহা হইতে স্বীয় অন্তর ফিরাইয়া লইতে পারে। মদ্য হারাম হওয়ার আরও অন্যান্য দিক রহিয়াছে, যাহা ফিতনা ফাসাদের উৎস্য। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ *

"মদ্যপান ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করিতে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখিতে চাহিতেছে। তবে কি তোমরা বিরত হইবে না?"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهٗ فَقَلِيْلُهٗ حَرَامٌ *

"যে জিনিস খুব নেশা সৃষ্টি করে ইহার সামান্যও হারাম।"

কেমারবাযী অর্থাৎ জুয়া খেলা এই জন্য হারাম যে, ইহার দ্বারা সম্পদ বিনষ্ট হয়। ঝগড়া সৃষ্টি হয়। অর্থ-সম্পদ দ্বারা যাহা যাহা করা উদ্দেশ্য হয়- তাহা পুরা হয় না। সামাজিক জীবনের বুনিয়াদ, পারস্পরিক সহায়তা বর্জিত হয়। ইহা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়। যদি আমাদের এইসব কথা তোমাদের বিশ্বাস না হয়; তাহা হইলে জুয়ারীদের অবস্থার প্রতি খুব ভালভাবে লক্ষ্য কর। তাহা হইলে দেখিবে যে, জুয়ারীরা এইসব ক্ষতি হইতে খালি নহে এবং তাহাদের জীবন ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। মদ্যপায়ীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাহাদের ক্ষতি অগণিত।

যে ঘরে বা সম্প্রদায়ে বা জাতিতে মদ্যপানের আধিক্য থাকিবে সেখানে

বিপদাপদের পরিমাণও অধিক হইবে। এই জন্যই ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে মদ্যপানের আধিক্যের কারণে তাহাদের মধ্যে বিপদাপদ ও অপরাধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। দূরে যাওয়ার দরকার নাই। ইউরোপে বেলজিয়াম নামক ছোট্ট একটি দেশ রহিয়াছে। ইহার লোক সংখ্যা সারে তিন মিলিয়নের বেশী নয়। কিন্তু এক লক্ষ নয় হাজার মদখানা রহিয়াছে। অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ, বণিতা সবকিছু মিলিয়া প্রতি পঁয়ত্রিশ জনের জন্য একটি একটি শরাব খানা রহিয়াছে। গত অর্ধ শতাব্দীতে বেলজিয়ামের লোক সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু শরাবখানা শতকরা দুই শত আটান্নটি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রতিটি বেলজিয়ামী বাৎসরিক পাচান্ন গ্যালন শরাব পান করে। বৎসরে সর্বমোট দুই কোটি দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করে। অর্থাৎ দৈনিক সাতান্ন হাজার ছয়শত পাউণ্ড শরাবের পিছনে খরচ করে। মাথাপিছু সাড়ে তিন পাউণ্ড আর বাড়ী পিছু পনর পাউণ্ড ব্যয় হয়।

তাহাদের মদ্যপানের আধিক্যতার প্রত্যক্ষফল এই যে, তাহাদের মধ্যে দিন দিন অপরাধ বাড়িয়া চলিয়াছে। অপরাধীদের শতকরা আশি জন আত্মহত্যা করে। শতকরা চুয়াত্তুর জন বন্দীখানায় থাকে। শতকরা উনিশ জন অভাব অনটনে দিন কাটায়। তাহাদের দেশে পাগলের সংখ্যা পঁচাত্তর। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মদ্যপান হারাম করিয়া মানবজাতির প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ করিয়াছে। ইসলাম সর্বপ্রকার খারাপ কার্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

কুপ্রবৃত্তির প্রতি এই পবিত্র ধর্মের কতটুকু ঘৃণা রহিয়াছে- ইহার এই ঘোষণাই উজ্জ্বল সাক্ষী। এখাণে আমাদের প্রশ্ন ইহা নহে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম যদি কুপ্রবৃত্তির দিকে পরিচালিত হইতে পথ নির্দেশ করে নাই তাহা হইলে মদ্যের ন্যায় এই মারাত্মক জিনিসটা হারাম করে নাই কেন? এই প্রশ্নের না পড়ার কারণ হইল যে, আমরা এখন এই দিকটি লইয়া আলোচনা করিতে চাই না তবে আমাদের জিজ্ঞাসা হইল যে, যেহেতু সারা দুনিয়ার মানুষ স্বীকার করে যে মদ্য মানুষের মধ্যে শয়তানী ধারণার সৃষ্টি করে। আর এই অবস্থায় যদি কোন ধর্ম মদ্য পানের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং মদ্যপান সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে ইহাকি এই ধর্মের শয়তানী ধারণাসমূহ বর্জন করানর, ইহার সত্যতা, ও পবিত্রতার প্রতি আহবানের উপর

অকাট্য দলীল ও সাক্ষ্য নহে? যদি ইসলাম একটি শয়তানী ধর্ম মত হয়, আর শয়তানী ইচ্ছাসমূহ পুরা করা আর ইহার পথ সুগম করা ইসলামের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইসলাম মদ্যপান হারাম ঘোষণা করিল কেন? মদ্যপানের মূলোৎপাটনই বা করিল কেন?

কতক নামধারী মুসলমানের কথা শুনিয়া আমরা বড়ই আশ্চর্য হই। তাহারা বলে যে, ইসলামী বিধানগুলি নাকি প্রাথমিক যুগের লোকদের জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছিল। তাহাদের এই কথার সারমর্ম হইল এই যে, এইসব বিধান এক জংলী সম্প্রদায়ের জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছিল। বর্তমানের উন্নত জাতিসমূহের জন্য ইহা প্রযোজ্য নয়। তবে তাহাদের তথাকথিত উন্নত জাতিসমূহ আজ যেভাবে মদ্যপানে লিপ্ত হইয়াছে- তাহা দেখিয়া বলিতে হয় যে, এই সব উন্নত জাতি অপেক্ষা পূর্ববর্তী জংলী জাতিসমূহ শতগুণে ভালছিল। আজ বড়ই পরিতাপের সাথে বলিতে হয় যে, মানুষ অবস্থা ও ঘটনার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না; বরং অন্তরে যে ধারণার সৃষ্টি হয় উহারই অনুকরণ করে। ইসলাম যে পবিত্রতার শিক্ষা দিয়াছে- ইহার সমকক্ষ কোন পবিত্রতা হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রকৃত পবিত্রতাকে প্রবৃত্তির অনুকরণ বলা হইতেছে। আর মদ্যপান মদ্যপায়ীকে যে শয়তানী ও কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করিতেছে উহাকে পবিত্রতা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইতেছে।

মদ্য এমন একটি বস্তু যাহা মানুষের মধ্যে শয়তানী উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আর মদ্য পানের প্রথার শিকড় কাটিয়া ইসলাম মানুষকে পশুত্বমূলক উত্তেজনা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এখন পর্যন্ত দুনিয়া এই প্রকৃত নূর হইতে বে-খবর রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃত নূর প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষের চোখ খুলিয়া যাওয়ার সময় খুব বেশী দূরে নয়।

মানুষ যখন ইসলামী এইসব বিধান সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করিবে তখন অনুধাবন করিতে পারিবে যে, ইসলাম মানুষকে এমন পবিত্রতা শিক্ষা দেয়, যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারে না।

সুদ হারাম হওয়ার কারণ

সুদের বিভিন্ন পন্থাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত পন্থা হইল করজ

প্রদানের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ করা। যেমন করজ গ্রহণকারী যে পরিমাণ করজ গ্রহণ করিয়াছিল– আদায় করার সময় তদাপেক্ষা অধিক আদায় করা বা উত্তম বস্তু আদায় করা ইহা হারাম ও বাতিল পন্থা। কেননা যাহারা করজ গ্রহণ করে– তাহারা নিজেদের প্রয়োজন ও পেরেশানীর কারণেই করজ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহা আদায় করিতে না পারার কারণে যদি ইহা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কখনও ইহা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া এবং ব্যাপক শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিবে। আর সম্পদ বৃদ্ধির এই পন্থা যখন চালু হইয়া পড়িবে তখন ক্ষেতখামারের কার্যাবলী ও সমস্ত শিল্পকার্য পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। এই জন্যই এই ব্যবসাকে হারাম করা হইয়াছে।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اٰكِلَ الرِّبٰو وَ مُؤكِلَهٗ وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهٗ *

"ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, ইহার সাক্ষীদ্বয় ও ইহার চুক্তিপত্র লেখকের প্রতি লানত করিয়াছেন।" (মুসলিম, তিরমিযি)

আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে বলেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰو اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ
تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ *

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। আর অবশিষ্ট সুদ ছাড়িয়া দাও। যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক। সুতরাং যদি তোমরা তাহা না কর (সুদের লেন-দেন হইতে বিরত না থাক) তাহা হইলে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা রহিয়াছে।"

সুদ প্রদান নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, যদি সুদ প্রদানকারী না থাকে অর্থাৎ সুদের উপর যদি কেহই করজ গ্রহণ না করে; তাহা হইলে তো সুদখোর বলিতে কেহই থাকিবে না; বরং এই কুপ্রথা[illegible]। এই বিশেষ দিকটির প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে এমন সব লোকদের গোনাহ

অধিক যাহারা সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে করজ গ্রহণ করে এবং সুদখোর লোকদের থেকে করজ গ্রহণ করে।

যেসব জাতি সুদের ব্যবসাকে নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা জায়গায় জায়গায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিতেছে। এইসব জাতির মধ্যে এক জাতি হইল ইহুদী। চার আঙ্গুল স্থানেও তাহাদের কোন স্বতন্ত্র আবাস ভূমি নাই, যে দেশেই যায়– সে দেশেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, শেষ পর্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইতে হয়। তাহাদের এই অবস্থার মূল কারণ হইল এই যে, তাহারা সুদখোর সম্প্রদায়। যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, তাহাদের গ্রাম হইতে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় তখন তাহারা দেশের বাদশাহের কাছে তাহাদের নামে বিচার দাবী করে। তখন বাদশাহ তাহাদিগকে বলে যে, তোমরা এই দেশ ত্যাগ কর।

অধিকন্তু সুদখোরদের চরিত্র খুব খারাপ হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি এক কাহিনী বর্ণনা করিল। আমি এক সুদখোরের কাছে এক দরিদ্র ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিলাম। সুদখোর বলিল– আমি তাহাকে পাঁচ টাকা দান করিব? অথচ আমার এই পাঁচ টাকা সুদে বাড়িতে বাড়িতে একশত বৎসরে পঁচিশ হাজার টাকায় পরিণত হইবে।

লখনুতে এক রাজা ছিল। তাহার রাজত্ব ধ্বংস হইয়া ছিল শুধু সুদের কারণে। কোন কোন নির্বোধ লোক বলিয়া থাকে যে, সুদ ব্যতীত জীবন ব্যবস্থা চালানো সম্ভব নয়। অথচ বার শত বৎসরের অভিজ্ঞতা সাক্ষ দিতেছে যে, সুদ ব্যতীত জীবন ব্যবস্থা চলিতে পারে। (আমি বার শত বৎসরের কথা এই জন্য বলিয়াছি যে, তের শতাব্দীতে মুসলমানেরা সুদের লেন-দেন শুরু করিয়া দিয়াছে।)

সুদের আরও বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে। ইহাদের হারাম হওয়ার কারণ খুব সূক্ষ্ম। ফিকাহের কিতাবসমূহে ইহাদের বিবরণ রহিয়াছে।

সুদ হারাম হওয়ার সুদৃঢ় দলীল

সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে– এমন আয়াতসমূহ

উল্লিখিত আয়াত ব্যতীতও অন্য একটি আয়াত যাহাতে আরও জোরদারভাবে সুদ খাওয়া হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে– তাহা হইলঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰو إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ وَ إِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা ঈমান রাখ; তাহা হইলে আল্লাহকে ভয় কর, আর মানুষের কাছে সুধের যে অর্থ পাইবে তাহা ছাড়িয়া দাও। যদি ইহা না কর তাহা হইলে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে লড়াইয়ের ঘোষণা শুন। যদি তোমরা তওবা কর– তাহা হইলে মূলধন তোমাদের জন্য হইবে। তোমরা কাহারও প্রতি জুলুম করিবে না। আবার তোমরা মজলুমও হইবে না। যদি কোন অভাবী লোক তোমাদের কাছে ঋণী হয় তাহা হইলে তাহার স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাহাকে সময় প্রদান কর যদি তোমরা বুঝ তাহা হইলে তোমাদের বেলায় ইহা উত্তম যে, তোমরা নিজেরাই মাফ করিয়া দাও।

আহার করার পূর্বে হাত ধৌত করার রহস্য

আহার করার পূর্বে হাত ধৌত করা বৈধ হওয়ার রহস্য হইল এই যে, এই কার্যের প্রভাবে মানুষ অনেক সংক্রামক রোগ হইতে রেহাই পাইয়া থাকে। মানুষের হাত ধৌত করার ফলে হাত হইতে সংক্রামক জীবানুসমূহ পৃথক হইয়া পানির সাথে ঝরিয়া যায়। ফলে ইহারা মানুষের দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায় / জেনায়াত ও হদুদ

(অপরাধমূলক কার্য ও শরয়ী শাস্তির বর্ণনা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

পবিত্র স্বভাব মানুষ যাহাতে আরাম ও নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করিতে পারে সে জন্য আল্লাহ পাক এমন কিছু বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন যাহা অনুসরণ করিলে মানুষ একের প্রতি অপর কখনও জুলুম ও অত্যাচার করিতে পারিবে না। আর যাহারা এই বিধান লংঘন করিবে– তাহাদের প্রতি আরোপিত শাস্তি অন্যান্য বিদ্রোহীদের জন্য শিক্ষা হইয়া দাঁড়াইবে।

মোহসিন ব্যভিচারী ও গায়রে মোহসিন ব্যভিচারীর শাস্তির মধ্যে পার্থক্যের কারণ

মোহসিন ব্যভিচারীর শাস্তি– পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করা। গায়রে মোহসিন ব্যভিচারীর শাস্তি– বেত্রাঘাত। এমন ব্যক্তিকে মোহসিন বলা হয় যাহার মধ্যে নিম্নোল্লেখিত গুণাবলী পাওয়া যায়।

(১) স্বাধীন হওয়া দাস না হওয়া। (২) মুসলমান হওয়া। (৩) বিবেকবান হওয়া। (৪) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। (৫) কোন নারীর সাথে বিশুদ্ধভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং তাহার সাথে সহবাস করিয়াছে। অধিকন্তু তাহার স্ত্রীও উল্লেখিত গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়।

পাথর মারিয়া হত্যা করার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ আরোপ করার পিছনে রহস্য এই যে, পাথর মারিয়া হত্যা করার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান হইল শক্ত শাস্তি। এই সব গুণাবলী বিদ্যমান থাকা নেয়ামত। আর বড় বড় নেয়ামতের মধ্যে ডুবিয়া থাকার পরও অপরাধ করা চরম শাস্তি পাওয়ার কারণ হয়।

দ্বিতীয় রহস্যঃ বিশেষ করিয়া এই সকল গুণাবলী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়। যেমন বিবেক প্রতিবন্ধক হয়– ইহা কে না জানে? অনুরূপভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া বিবেক পরিপক্ক ও পূর্ণ করে। আর ইসলাম মানুষকে প্রবৃত্তির চাহিদা হইতে ফিরাইয়া রাখে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বইচ্ছায় বিশুদ্ধভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সামর্থ রাখে। বিশুদ্ধভাবে বিবাহ করার পর ইচ্ছামত সহবাসও করিতে পারে। আর সহবাসে তৃপ্তিও হাসিল করিতে পারে। হালাল জিনিসের দ্বারা তৃপ্তি অর্জন করার সুযোগ হারাম জিনিস থেকে ফিরাইয়া রাখে। নারীদের উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হওয়া এই জন্য শর্ত করা হইয়াছে যে, যাহার প্রতি মনের টান রহিয়াছে– তাহাকে সহবাস করার দ্বারা তৃপ্তি লাভ হয়। আর উল্লিখিত গুণাবলী মনের টানে পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করে। কেননা পাগলিনীর সাথে সহবাস করিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্কা নারীর নিজেরই সহবাসের দিকে আগ্রহ কম। তাই পুরুষেরও তাহার দিকে এতটা আগ্রহ জন্মে না। দাসীর প্রতি আগ্রহ কম হয়। কেননা তাহার সাথে সহবাস করার দ্বারা যে সন্তান পয়দা হইবে ইহা গোলাম হইয়া যায়। অনুরূপভাবে কাফের নারী ভিন্ন ধর্মী হওয়ার কারণে তাহার প্রতি মনের আগ্রহ কম হয়। নারী–পুরুষ উভয় পক্ষে উল্লিখিত গুণাবলী থাকার ফলে নেয়ামত ও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ পরিপূর্ণ হয়। আর এই বিষয় দ্বয় অপরাধমূলক কাজের পথে শক্ত প্রতিবন্ধক। ইহা সত্বেও যদি কেহ অপরাধে লিপ্ত হয়– তাহা হইলে অবশ্যই শক্ত শাস্তি হওয়া চাই। আর তাহা হইল রজম বা পাথর মারিয়া হত্যা করা। এইসব গুণাবলীর অনুপস্থিতিতে প্রতিবন্ধক শক্ত না হইয়া হালকা হইয়া যায়। প্রতিবন্ধক মুক্ত হয় না; বরং তুলনামূলকভাবে প্রতিবন্ধক কম থাকে। ইসলাম, বিবেক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া প্রভৃতি কি প্রতিবন্ধক নয়? আর এইসব প্রতিবন্ধক আছে বলিয়াই শাস্তি নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা শক্ত না হইলে শাস্তিও হালকা হইয়া আসে। তাহা হইল বেত্রাঘাত।

চুরি করার শাস্তি স্বরূপ চোরের হাত কর্তন করা হয় কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তিতে লজ্জাস্থান কর্তন করা হয় না কেন?

চুরির শাস্তিতে চোরের হাত কর্তন করার নির্দেশ দেওয়া আর ব্যভিচারের শাস্তিতে লজ্জাস্থান কাটার নির্দেশ না দেওয়া আল্লাহ পাকের হেকমত এবং

পরিণাম দর্শিতার ভিত্তিতে হইয়াছে। কেননা আল্লাহ পাকের হেকমত, তাঁহার অনুগ্রহ এমনকি সৃষ্টির বিবেকের চাহিদাও ইহা নহে যে, অপরাধী যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করে তাহা কাটিয়া ফেলা হউক। তাহা হইলে তো কুদৃষ্টিকারীর চক্ষু বাহির করিয়া ফেলা হইত। অশ্লীল কথাবার্তা বলার ফলে মানুষের জিহবা কাটিয়া দেওয়া হইত। খারাপ কথা শুনার দ্বারা কর্ণ কাটিয়া দেওয়া হইত। অন্যায়ভাবে কাহাকেও থাপ্পড় মারিলে হাত কাটিয়া দেওয়া হইত।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কত সীমা লংঘন ও অত্যাচার করিতে হইত ইহার কোন সীমারেখা নাই। কেননা এই ধরনের শাস্তিতে মর্যাদার পার্থক্য হয় না। আর মর্যাদার পার্থক্য না করাও অত্যাচার।

আল্লাহ পাকের মহান নামসমূহ, তাঁহার গুণাবলী এবং তাঁহার প্রশংসিত কার্যসমূহও ইহার চাহিদা করে না। কেননা শুধু নিরাপত্তা কায়েম করাই শরয়ী শাস্তির বিধান চালু করার উদ্দেশ্য নয়। যদি ইহাই উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে অপরাধীকে হত্যা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িত। শরয়ী শাস্তির বিধান চালু করার উদ্দেশ্য অপরাধীকে অপরাধের জন্য ভয় দেখানের মাধ্যমে অপরাধ হইতে বিরত রাখা। আর শাস্তি প্রদান করা হয়, যাহাতে ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার অপরাধ না করার শিক্ষা গ্রহণ করে। আর অন্যান্যরাও অপরাধীর শাস্তি দেখিয়া জুলুম অত্যাচার ও অপরাধ হইতে বিরত থাকে।

অধিকন্তু শাস্তি পাওয়ার পর অপরাধী খালেছভাবে তওবা করিয়া ফেলে। আর তাহার পরকালের কথা স্মরণ হয়। অন্যান্য মানুষের অসুবিধার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিয়া খারাপ কার্য হইতে ফিরিয়া আসে। এইসব হেকমতের চাহিদা অঙ্গ কর্তন করা নহে বরং ইহার চাহিদা হইল শাস্তি প্রদান করা।

অতঃপর প্রশ্ন হইল যে, চোরের হাত কাটা নির্ধারণ করা হইল কেন? এই ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা বিশেষ প্রয়োজন যে, চোর চুরি করে অপ্রকাশ্যে ও গোপনীয়ভাবে। চুরির অর্থ বুঝাইবার জন্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ 'সারাকা'। সারাকা শব্দই প্রমাণ করে যে, চুরি গোপনীয়ভাবে হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, যখন কেহ কাহারও প্রতি গোপণীয়ভাবে দেখে তখন তাহার সম্পর্কে বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুককে চুরি করিয়া দেখে। চোর

কখনও চায় না যে, অন্য কেহ তাহার সম্পর্কে অবগত হউক। তাই যাহাতে অন্য কেহ তাহার সম্পর্কে অবগত হইতে না পারে সেজন্য সে সর্বদা অপ্রকাশ্য ও আতংকিত থাকে। কেননা ধরা পড়িলে তো শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। যখন কোন জিনিস চুরি করে তখন নিজকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করিতে থাকে। আর পলায়ন করিবার সময় হাত পায়ের দ্বারা সাহায্য লাভ করে। কেননা মানুষের হাত দুইটি পাখীর ডানার সমতুল্য। আর পলায়ন করার ক্ষেত্রে পা কতটুকু সাহায্য করে তাহা সকলেই জ্ঞাত। সুতরাং চোরের হাত কাটিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। তাহার বাহুর শক্তি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। আর দ্বিতীয়বার যদি চুরি করে তাহা হইলে যেন অতি সহজে ধরা যায়। সুতরাং যখন একবার চুরি করে তখন তাহার এক হাত কাটা হইবে, যাহাতে তাহার দৌরাত্ম দুর্বল হইয়া আসে।

অতঃপর দ্বিতীয়বার যখন চুরি করে তখন তাহার পা কর্তন করা হয়, যাহাতে সে পলায়নের ক্ষেত্রে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সে পলায়ন করিতে না পারে। অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করা খুব বিরল। তাই ইহার পর হাত কাটার শাস্তি নির্ধারণ করা হয় নাই। কেননা তৃতীয়বার চুরি করা বিরল হওয়ার পরও যদি চুরি করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইবে, যাহাতে জনসাধারণ তাহার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

ব্যভিচারীর শাস্তি স্বরূপ তাহার লজ্জাস্থান কর্তন করা হয় না– কারণ ব্যভিচারী তাহার সমুদয় শরীর দ্বারা ব্যভিচার করে। সমুদয় দেহের দ্বারা স্বাদ উপভোগ করে এবং কামভাব পুরা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে ব্যভিচার হইয়া থাকে। চোর যে বিষয়ের আশংকা ও ভয় করে ব্যভিচারীর উহার আশংকা ও ভয় নাই। অর্থাৎ চোর সর্বদা আতঙ্কিত থাকে নাজানি তাহাকে তালাশ করা হইতেছে। কিন্তু ব্যভিচারীর এই ধরনের আতঙ্ক নাই। এইজন্যই অবিবাহিত ব্যভিচারীর সমুদয় অঙ্গে বেত্রাঘাত করা হয়। আর বিবাহিত ব্যভিচারীর সমুদয় অঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল যে, ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর নিক্ষেপ না করিয়া শুধু যদি বেত্রাঘাত করার বিধান জারী হইত তাহা হইলে কি অসুবিধা ছিল?

ব্যভিচারের শাস্তিতে একরকম বিধান জারী না করিয়া দুই ক্ষেত্রে দুই

প্রকার বিধান চালু করার কারণ এই যে, ব্যভিচারের ফলে বংশ পরিচয়ে মিশ্রণ ও সন্দেহ দেখা দেয়। বংশ পরিচয়ে সংশয় ও সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণে সন্তানের পরিচয় এবং দ্বীন জিন্দা করিবার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার দ্বারা নারী নামক যমীনে ফসল করা মানব জাতির বংশপরম্পরা বিনষ্ট হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যভিচার হত্যার সাথে সাদৃশ্য রাখে। এই জন্য ব্যভিচারের কোন কোন ক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ করার ধমকি দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে অন্যান্য লোক এই কার্য হইতে বিরত হইয়া পড়ে। আর দুনিয়াতে নিরাপত্তা ও সংশোধন কায়েম হয়। কেননা সংশোধনের ফলে মানুষ আল্লাহর ইবাদতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আর আল্লাহর ইবাদত পরকালীন নিয়ামত লাভের মাধ্যম।

অধিকন্তু ব্যভিচারীর লজ্জাস্থান কর্তন করার ফলে সে ভবিষ্যত বংশদর হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। ইহা আল্লাহ পাকের হেকমত ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আল্লাহ পাকের চাহিদা হইল– মানুষের সন্তানাদি ও বংশধর অধিক হয়। আর লজ্জাস্থান কাটিয়া ফেলার ফলে ভবিষ্যত বংশ বিস্তারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। তাই ব্যভিচারীর লজ্জাস্থান কাটিয়া ফেলা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অধিকন্তু ব্যভিচারীর লজ্জাস্থান কর্তন করিতে গেলে তাহার সতর খুলিতে হইবে। ইহা নাজায়েয। আর পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্যভিচারের অপরাধ সমুদয় দেহ দ্বারা হইয়া থাকে। সুতরাং সমুদয় দেহ ছাড়িয়া একমাত্র লজ্জাস্থান কর্তন করা ইনসাফ পরিপন্থী। অতএব নির্মল যুক্তির চাহিদা হইল ব্যভিচারীর সমুদয় দেহে শাস্তি প্রদান করা।

মদ্যপানে, ব্যভিচারে, পুংমৈথুনে এবং চুরির শাস্তিতে কাফ্‌ফারা নির্ধারণ না করার কারণ

এই সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রঃ) লিখিয়াছেন– যেসকল কার্য কোন অবস্থায়ই বৈধ নহে বরং সর্বাবস্থায় গোনাহের কার্য, ইহাদের জন্য শরীয়তের পক্ষ হইতে কোন প্রকার কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করা হয় নাই। যেমন অত্যাচার করা ও অশ্লীল কার্য। এই জন্যই ব্যভিচার, মদ্যপান, সতী নারীর প্রতি অসৎ কার্যের অপবাদ প্রদান করা, চুরি করা প্রভৃতি কার্যের কোন কাফ্‌ফারা দিতে হয় না। এই সকল গোনাহের কার্যের কাফফারা নির্ধারণ না করা এই

সকল অপরাধে অপরাধীদের প্রতি সাবলীলতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন নহে। এইসব অপরাধের বেলায় কাফফারা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কাফফারা এমন সব কার্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে যাহা মূলতঃ বৈধ হয় কিন্তু কোন আনুসাঙ্গিক কারণে হারাম হইয়া যায়। যেমন রমযান মাসে রোযা রাখিয়া এবং এহরামের অবস্থায় সহবাস করিলে কাফফারা প্রদান অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু শিরোনামায় উল্লেখিত গোনাহসমূহ মূলতঃ কবীরা এবং খুব শক্ত গোনাহ। তাই এইসব অপরাধে কাফ্ফারা নাই।

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিলে কাফফারা ওয়াজিব হয় কিন্তু স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করিলে কাফফারা ওয়াজিব নয় কেন?

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِيْ يَاْتِي امْرَأَتَهٗ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ *

"ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে স্বীয় স্ত্রীর সাথে হায়েজ অবস্থায় সহবাস করে, সে এক দীনার বা অর্ধ দীনার সদকা করিবে।" (ইবনে মাজা)

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মূলতঃ যেসব কার্য বৈধ এবং কোন আনুসাঙ্গিক কারণে হারাম হইয়াছে। এই আনুসাঙ্গিক কারণ বহাল থাকা অবস্থায় এই কার্য করিলে কাফফারা প্রদান করা অপরিহার্য হয়। হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম। হায়েয আনুসাঙ্গিক অবস্থা। মূল অবস্থা নয়। তাই হায়েয অবস্থায় সহবাস করার ক্ষেত্রে কাফফারা নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর এই ক্ষেত্রে কাফ্ফারা নির্ধারণ বিবেক সম্মত ফয়সালা। মলদ্বারে সহবাস কোন অবস্থায়ই বৈধ নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কাফফারা প্রদানের কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব শরীয়তের মূল বিধান এই যে, মূলতঃ যে কার্যটি বৈধ আর আনুসাঙ্গিক কোন কারণে হারাম হইয়া যায়, উহা হারাম অবস্থায় সম্পাদন করিলে কাফফারা দিতে হইবে। আর যাহা মূলতঃ হারাম; কোন অবস্থাতেই বৈধ নহে। উহা সম্পাদন করিলে কাফফারা লাগিবে না। তবে এই অপরাধের জন্য শরীয়তের পক্ষ হইতে শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। আর এই সিদ্ধা[illegible]

হত্যা প্রমাণের জন্য দুই জন সাক্ষী আর ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন কেন?

হত্যা প্রমাণের জন্য দুইজন সাক্ষী আর ব্যভিচার প্রমানের জন্য চার সাক্ষী তলব করা হেকমতে ইলাহীর ভিত্তিতে সাব্যস্ত হইয়াছে। কেননা কেসাস ও ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং হত্যার ক্ষেত্রে সতর্কতা হইল মাত্র দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা। যদি এই ক্ষেত্রেও চার সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ অপরিহার্য হইত তাহা হইলে খুনাখুনি বাড়িয়া যাইত। মানুষ অধিক হত্যা করিতে সাহস পাইত। অধিকাংশ হত্যাকারী কেসাস হইতে রেহাই পাইয়া অধিক হত্যায় লিপ্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চার সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ অপরিহার্য। আর এই ক্ষেত্রে ইহাই সতর্কতা। চারজনের সাক্ষ্য অপরিহার্য করার মধ্যে এই বিষয়ে অধিক গোপনীয়তা অবলম্বিত হয়। অধিকন্তু সাক্ষীগন স্বচক্ষে দেখিয়াছে বলিয়া এইভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যাহাতে তাহাদের বর্ণনায় কোন সন্দেহ ও দুর্বলতার সম্ভাবনা না থাকে। যদি ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী ঘটনা স্বীকার করে, তাহা হইলে চার বার স্বীকার করিতে হয়। ইহাতেও বিষয়ের অধিক গোপনীয়তার দিকটি বিবেচনা করা হইয়াছে। কেননা এই বিষয়টি প্রকাশ হইয়া যাওয়া আল্লাহ পাকের কাছে খুবই অপছন্দনীয়। তাই এই কুকর্মটি মুমিনদের মধ্যে প্রচারকারীকে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে শক্ত আযাব দিবেন বলিয়া কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন।

এক ফোটা মদ্য পান করিলেও হদ (শরয়ী শাস্তি) অপরিহার্য হয় কিন্তু কয়েক সের মলমূত্র ভক্ষণ করার পরও হদ অপরিহার্য না হওয়ার কারণ

১। উল্লিখিত বিষয়টি ইসলামী শরীয়তের বিশেষ সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। নির্মল বিবেক সম্মত। জনসাধারণের মঙ্গল ও কল্যাণের সাথে সংযুক্ত। কারণ মলমূত্র ও নাপাক জিনিস ভক্ষণ করার প্রতি আল্লাহ পাক মানুষের স্বভাবে জন্মগত ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের এই জন্মগত স্বভাবই তাহাদিগকে এইসব জিনিস ভক্ষণ করা থেকে বাধা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই ইহাতে শরয়ী শাস্তির প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে মানুষের স্বভাব মদ্য পানের প্রতি খুব আগ্রহী। মদ্যের প্রতি মানব স্বভাবের এই আগ্রহ থাকার কারণে মদ্য পানের শক্ত শাস্তি নির্ধারিত হইয়াছে, যাহাতে মানুষ মদ্যপান হইতে বিরত হইয়া পড়ে। অল্প পরিমাণ পান করা হইতেও বিরত হয়, আবার অধিক পরিমাণ পান করা হইতেও বিরত হয়। এই কারণেই যদিও এত অল্প পরিমাণ মদ্যপান করে যাহার ফলে মদ্যপানকারী নেশাগ্রস্ত হয় না, এতটুকু পরিমাণ মদ্যপান করিলেও হদ (শরয়ী শাস্তি) জারী হয়। কেননা অল্প পরিমাণ পান করা অধিক পরিমাণ পান করার দিকে আহবান করে।

২। মদ্যপান করার দ্বারা মদ্যপায়ীর ক্ষতি হয় এবং অন্যদেরও ক্ষতি হয়। মলমূত্র ও নাপাক জিনিস ভক্ষণ করার ফলে শুধু ভক্ষণকারীর ক্ষতি হয়। অধিকন্তু মদ্যপানের ক্ষতি মলমূত্র ভক্ষণের ক্ষতি অপেক্ষা অনেক কম। (কেননা মদ্যপানের দ্বারা বিবেক নষ্ট হইয়া যায়।

শরীয়তে হদ ও কাফফারা নির্ধারিত হওয়ার হেকমত

গোনাহগারকে গোনাহের কারণে ধমকি দিতে হয়, যাহাতে মানুষ গোনাহের কার্য হইতে বিরত হইয়া পড়ে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

ليذوق و بال امره "যাহাতে স্বীয় কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করে।"

আর এই কারণেই হদ ও কাফফারা নির্ধারিত হইয়াছে। যদি হদ ও কাফফারা না থাকিত তাহা হইলে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ অসৎ ও অকল্যাণ কার্য

হইতে বিরত থাকিত না। তাহাদের দুষ্টামী আরও বৃদ্ধি পাইত। এই জন্যই কাফফারাও নির্ধারিত হইয়াছে। হদ নির্ধারণের আরও কিছু হেকমত ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

কেসাস গ্রহণের হেকমত

হত্যা, খুনাখুনি, ঝগড়াবিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি প্রভৃতি বন্ধ করিবার নিমিত্তে কেসাসের প্রথা জারী করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ *

"হে বিবেকবানেরা! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে।"

হত্যা হারাম হওয়ার কারণ

যদি মানুষের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ চালু থাকে তাহা হইলে দেশগ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িবে। উপজীবিকা অর্জনের সকল ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দিবে এবং সামাজিক জীবনে বিপদজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। এই জন্য হত্যা হারাম করা হইয়াছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্ষেত্রে হত্যা করা হালাল হইলে তাহা কেসাস প্রভৃতি গ্রহণের কারণে হইয়াছে। অনেক সময় সরাসরি হত্যা না করিয়া ধ্বংস করার জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করা হয়। এইসব পন্থাও হত্যার ন্যায় হারাম। উদাহরণ স্বরূপ, কখনও কখনও মানুষের মধ্যে জোশ পয়দা হয় আর তখন প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। তাই আহার্য্য বস্তুর মধ্যে অনেক সময় বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। অথবা যাদু-টোনার মাধ্যমে হত্যা করিয়া ফেলে। এইভাবে ধ্বংস করা ও হত্যার ন্যায়। বরং হত্যা করা অপেক্ষাও খারাপ। কেননা হত্যাকাণ্ড তো প্রকাশ্যভাবে হয়। ইহা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বিষ প্রয়োগে হত্যা বা যাদু টোনার মাধ্যমে হত্যা থেকে রেহাই পাওয়া মুশকিল। সুতরাং সামাজিক পরিবেশ ঘোলাটে করার কারণে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কারণে এই কার্যও হারাম।

চুরি হারাম হওয়ার কারণ

আল্লাহ পাক মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ এইভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত হালাল যমীন হইতে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ উ

ৎপাদন করে। গৃহপালিত পশু চড়ায়ে, খেতখামার চাষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এইভাবে নিরাপদ জীবন ধারণের মাধ্যমে শহর বন্দর সর্বস্থানে নিজেদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করে। এই জন্য চুরি ডাকাতি, ছিনতাই রাহজানী পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা এইসব অশোভণীয় কার্য সমাজ জীবনে ফাসাদের সৃষ্টি করে। শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই জন্য এইসব কার্য আল্লাহর কাছে খুব অপছন্দীয় ও ঘৃণিত।

ব্যভিচার হারাম হওয়ার কারণ

ফাসেক ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের অন্তর যদি যাচাই করিয়া দেখা যায়- তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, লাভজনক ও উপকারী ব্যবস্থাপনার প্রতি আস্থাশীল। কিন্তু তাহাদের কুপ্রবৃত্তি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর কুপ্রবৃত্তির প্রভাবই তাহাদিগকে অসৎ কার্যের দিকে টানিয়া নেয়। তাহারা খুব ভালভাবে জানে যে, তাহারা গোনাহগার এবং মানুষের স্ত্রী-কন্যার প্রতি ব্যভিচার করিতেছে। যদি অন্য কেহ তাহাদের স্ত্রী এবং বোনের প্রতি অনুরূপ আচরণ করে তাহা হইলে তাহারা গোস্বায় কাঁপিয়া উঠে। তাহারা খুব ভাল করিয়াই জানে যে এই জঘন্য কার্যের প্রভাব তাহার প্রতি যেভাবে পতিত হয় অন্যের উপরও তদ্রূপই পতিত হয়। আর এই প্রভাব সামাজিক জীবনে খুব খারাপ প্রভাব ফেলিয়া থাকে। সমাজ ব্যবস্থাকে ক্ষতি গ্রস্থ করিয়া ফেলে। ইহা জানা সত্ত্বেও কুপ্রবৃত্তির তাড়না তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া ফেলে। এই প্রকৃতিগত প্রভাবের রহস্য এই যে, সমাজ জীবনে নারীদের তুলনায় পুরুষের প্রভাব বেশী। আল্লাহর নির্দেশে তাহাদের মধ্যে এই খেয়াল পয়দা হইল যে, প্রত্যেকের স্ত্রী অন্যদের থেকে পৃথক থাকা প্রয়োজন। আর এই ক্ষেত্রে অন্যরা যেন স্ত্রী কন্যাদের উত্ত্যক্ত না করে। প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচারের মূল হইল এই উত্ত্যক্ত। তাই এই ধারণা আর এই প্রভাব সকলের স্বভাবজাত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ব্যভিচার হারাম হওয়ার এক কারণ হইল এই স্বভাবজাত বিষয়।

ইহার দ্বিতীয় কারণ একটি বিবেক সম্মত বিষয়। তাহা এই যে, ব্যভিচারের ফলে বংশ পরিচয় ঘোলাটে হইয়া পড়ে। অধিকন্তু ইহা হত্যাকাণ্ড এবং ফেতনা ফাসাদের উৎস। এই জন্য ইহা খুব খারাপ ও বিশ্রী পন্থা। তাই আল্লাহ পাক ইহা নিষেধ করিয়া বলিয়াছেনঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا *

"এমনসব কার্যের কাছেও যাইও না যাহা ব্যভিচার পর্যন্ত টানিয়া নেয়। কেননা ব্যভিচার লজ্জাহিনতা এবং মন্দ রাস্তা।"

কেননা যদি এই রাস্তা খুলিয়া যায় তাহা হইলে উপরে উল্লেখিত অসুবিধাগুলি অবশ্যই দেখা দিবে। আর এই গুলি বড় বড় অসুবিধা ব্যভিচার পর্যন্ত টানিয়া নেয়- এমনসব কার্যে না যাওয়ার অর্থ- অপর নারীদের প্রতি দৃষ্টি ফেলিও না। তাহাদের সৌন্দর্য্য ও গুণাবলীর আলোচনা শুনিও না, যাহা শুনার ফলে তোমাদের অন্তরে ব্যভিচারের ধারণা সৃষ্টি হয়। আর এইভাবে তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়।

পুংমৈথুন হারাম হওয়ার কারণ

এই অভ্যাসের ফলে মানবের বংশধারার মূল্যেৎপাটন হইয়া যায়। এই পন্থা অবলম্বন করার দ্বারা যেন মানুষ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া তাহার চাহিদার পরিপন্থী এক পন্থায় স্বীয় জৈবিক চাহিদা পূরণ করিতেছে। এই জন্য এই কার্যটি মানুষের স্বভাবে খুব সাংঘাতিক ও ঘৃণিত কার্য হিসাবে বিবেচিত। ফাসেক ও মন্দ লোকেরা এই ধরনের কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারাও ইহার বৈধতা স্বীকার করে না। বরং ইহা অবৈধ বলিয়া জানে। যদি তাহাদের প্রতি এই কার্যের সম্পর্ক করা হয় তখন তাহারা লজ্জা-শরমে মরিয়া যাওয়াও সহ্য করিতে প্রস্তুত হয়। তবে যাহারা নির্মল স্বভাবের মূল হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের এই কার্যে লজ্জা আসে না। প্রকাশ্যভাবে এই আমলে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

হদ এবং তাযীরের মধ্যে পার্থক্য

হদ আরবী শব্দ। ইহার অর্থ বিরত রাখা এবং পরিমাপ করা। শরয়ী পরিভাষায় কোন অপরাধের শাস্তি প্রদানের যে পরিমাপ আল্লাহ পাক নির্ধারণ করিয়াছেন, কাহারও অভিমতের দ্বারা ইহার মধ্যে কোন রূপ কমবেশী না করা। এই ধরনের শাস্তিকে হদ বলা হয়। যেমন বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে দুররা মারা, চোরের হাত কাটিয়া দেওয়া প্রভৃতি। আর তাযীর এমন শাস্তি, শরীয়তের পক্ষ হইতে যাহার

সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই। বরং স্থান, কাল ও অবস্থা ভেদে কোন অপরাধী কেমন শাস্তি প্রাপ্ত হইবে– তাহা বিচারকদের মতামতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য শরীয়তের পক্ষ হইতে কতগুলি মূলনীতি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার বিরোধিতা করা বৈধ নয়।

তাযীরের আভিধানিক অর্থ আদব শিখানো, সম্মান করা। আর আল্লাহ পাকের প্রদত্ত আহকামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই শরীয়তের তাযীর চালু করা হইয়াছে, যাহাতে মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাকের আহকামের সম্মান ও ইযযত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আহকামে ইলাহীর সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়। অধিকন্তু তাযীর ও হদ শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ কর্মের শাস্তি হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাফ্ফারা এমনসব বিষয়ের বিনিময় ও জরিমানা হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে যাহা মূলতঃ বৈধ। কিন্তু কোন আনুসাঙ্গিক কারণে হারাম হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, রমযান মাসে দিনের বেলায় আর এহরাম অবস্থায় সহবাস করা। রমযান মাসে দিনের বেলায় সহবাস করার অপরাধের কাফফারা হইল ধারাবাহিকভাবে ষাট রোযা রাখা, অথবা ষাট মিসকীনকে দুই বেলা আহার করান। আর এহরাম অবস্থায় সহবাস করার কাফফারা হইল কুরবানী করা।

এলামুল মুকীনীন নামক গ্রন্থে লিখা আছে যে, তাযীর এমন সব গোনাহের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে যেসব গোনাহের শাস্তি হদ বা কাফফারা নয়। কেননা গোনাহ মূলতঃ তিন প্রকার। এক প্রকার গোনাহের শাস্তিকে হদ বলা হয়। আর এই প্রকার গোনাহে কাফফারা নাই। দ্বিতীয় প্রকার গোনাহের শাস্তিতে কাফফারা প্রদান করিতে হয়। ইহাতে হদ নাই। তৃতীয় এক প্রকার গোনাহ রহিয়াছে, যাহাতে হদও নাই আবার কাফফারাও নাই। প্রথম প্রকারের উদাহরণ। যেমন, চুরি, ব্যভিচার অপবাদ দেওয়া। এইসব অপরাধে হদ নির্ধারিত।

দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ অর্থাৎ যাহাতে কাফ্ফারা রহিয়াছে কিন্তু হদ নাই। ইহার উদাহরণ, রমযান মাসে দিনের বেলায় অথবা এহরাম বাঁধা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা। তৃতীয় প্রকারের গোনাহ, যাহাতে হদও নাই আবার কাফফারাও নাই কিন্তু তাযীর রহিয়াছে। যেমন অপরিচিত নারীদের চুম্বন করা। তাহার সাথে পৃথক কোন ঘরে বসা, ছতর খুলিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করা। মৃতজন্তু ও শূকরের গোশত ভক্ষণ করা প্রভৃতি। প্রথম প্রকারে তাযীরের স্থানে

হদই যথেষ্ট। দ্বিতীয় প্রকারের কাফ্ফারার সাথে সাথে তাযীর ওয়াজিব কিনা? এই সম্পর্কে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। তৃতীয় প্রকারে সকলের ঐক্যমতে শুধু তাযীর নির্ধারিত।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার কারণ

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এই জন্য হারাম যে, যাহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে ঐ ব্যক্তির অবশ্যই কষ্ট হয়। যে ব্যক্তি ওয়াদা করে তাহাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী যখন জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াদা ভঙ্গ করে তখন আল্লাহ পাকের দরবার হইতে ঐ ব্যক্তির প্রতি লানত বর্ষিত হইতে থাকে। আর তাহার থেকে ফিরিশতাদের সুদৃষ্টি দূর হইতে থাকে। অস্বস্থি ও অস্থিরতা বিভিন্নভাবে তাহাকে ঘিরিয়া লয়। এইজন্যই আল্লাহ পাক বলেন, أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ "তোমরা নিজেদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পুরা কর।" তিনি এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার দ্বারা মানুষ অভিশপ্ত না হইয়া পড়ে।

দাড়ি রাখার আর গোঁফ কর্তন করার হেকমত

দাড়ির মাধ্যমে বড়-ছোটর পার্থক্য হইয়া যায়। পুরুষের জন্য এক প্রকার সৌন্দর্য্য আর তাহাদের আকৃতির পরিপূরক। এইজন্য দাড়ি বাড়ানো অপরিহার্য। আর দাড়ি মুণ্ডাইয়া ফেলা অগ্নিপূজকদের তরীকা। আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে যেভাবে রাখিতে ইচ্ছা করেন দাড়ি মুণ্ডানের ফলে ইহাতে পরিবর্তন ও বিরোধিতা পাওয়া যায়। দাড়ি মুণ্ডানের কারণে বড় বড় খান্দানের অনেক নেতৃস্থানীয় লোকেরাও সাধারণ, নিম্ন পর্যায়ের লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। সকল নবী ও নেককার লোকগণ দাড়ি রাখিয়া আসিতেছেন। যদি দাড়ি মুণ্ডানের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকিত তাহা হইলে তাহারাই প্রথমে দাড়ি মুণ্ডাইতেন। কারণ তাহারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতীক হইয়া আগমন করিয়াছিলেন।

গোঁফ কাটিয়া ছোট করিয়া ফেলার কারণ হইল এই যে, লম্বা গোঁফওয়ালা যখন পানাহার করে তখন খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য তাহার গোঁফে লাগিয়া যায়। আর গোঁফে ধূলিবালি ও ময়লা লাগিয়া থাকে। পানাহারের সময়

খাদ্য বস্তুর সাথে তাহা মিশিয়া পেটে চলিয়া যায়। ফলে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু ইহা অগ্নিপূজকদের তরীকা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ قَصُّوْا الشَّوَارِبَ و الحفُوا اللُّحٰى *

"মুশরিকদের বিরোধিতা কর। গোঁফ কাট আর দাড়ি লম্বা কর।"

পিতা-মাতার নাফরমানী করা হারাম হওয়ার কারণ

সন্তানাদির লালন-পালনের পিতা-মাতা এমন কষ্ট মুছিবত সহ্য করিয়া থাকে আর এত বেশী মেহনত পরিশ্রম করিয়া থাকে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই তাহাদের সেবা করা সন্তানাদির জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারিত করা হইয়াছে।

দাবা খেলা, কবুতর বাজি, বটের পাখীর খেলা, ঘুড়ি খেলা, তাশ প্রভৃতি খেলা হারাম হওয়ার কারণ

কতক মানুষ এমন রহিয়াছে যাহারা ভুল চিন্তা ফিকিরের মধ্যে লিপ্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা তাহারা দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে উদাসীন হইয়া পড়ে এবং অনর্থক সময় নষ্ট করে। যেমন দাবা খেলা, কবুতরবাজী, বটের পাখির খেলা এবং অন্যান্য জানোয়ারের লড়াইমূলক খেলা প্রভৃতি। মানুষ যখন এইসব কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজনের খবরও থাকে না। এইগুলি সম্পর্কে উদাসীন হইয়া পড়ে। এমনকি কখনও কখনও পেশাব আটকাইয়া বসিয়া থাকে। খেলার স্থান থেকে সরিয়া পেশাব করিতেও যায় না। যদি এই ধরনের কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ার অভ্যাস হইয়া পড়ে, আর এই ধরনের কার্য ব্যাপক প্রচলন হয় তাহা হইলে এইসব লোক দেশের জন্য বোঝা হইয়া পড়িবে। এমনকি তাহাদের নিজেদের খবরই তাহারা রাখিবে না। এই জন্যই এই ধরনের কার্যগুলি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছনে পিছনে যাইতে দেখিয়া বলিলেন, এক শয়তান অপর

শয়তানের পিছনে পিছনে যাইতেছে। অনুরূপভাবে পশুর মধ্যে লড়াই লাগাইতেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। দাবা খেলা সম্পর্কেও রেওয়ায়েত রহিয়াছে। অনুরূপভাবে যেসব কার্যে উল্লিখিত দোষসমূহ পাওয়া যায়- এইসব কার্য হারাম হওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

পুরুষদের রেশম ও স্বর্ণ পরিধান নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

১। স্বর্ণ এমন একটি জিনিস যাহার মালিক হইলে অনারবী লোকের একে অপরের উপর অহংকার করিয়া থাকে। যদি এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের অলংকার পরিধানের প্রচলন ব্যাপক হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পুরুষ নারী উভয় পক্ষ স্বর্ণালংকার পরিধান করা শুরু করিয়া দেয়- তাহা হইলে পার্থিব সম্পদ তালাশের আধিক্যতা দেখা দিবে। কিন্তু রৌপ্য পরিধানের অনুমতি প্রদান করাতে এই অসুবিধাটুকু দেখা দেয় না। রৌপ্যের ক্ষেত্রে পুরুষদিগকে মাত্র আংটি পরিধানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ততটুকু অসুবিধার কথা নয়। তবে নারীদের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহা হইল স্বর্ণ পরিধানে এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও নারীদিগকে ইহা পরিধানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে কেন? ইহার কারণ, নারীরা নিজেদের প্রতি স্বামীকে আকর্ষণ করার জন্য তাহাদের অধিক সাজসজ্জার প্রয়োজন হয়। এই কারণেই সমস্ত দুনিয়াতেই পুরুষ অপেক্ষা নারীদের সাজসজ্জার আধিক্যতা দেখা যায়। তাই পুরুষের তুলনায় নারীদের অধিক সাজসজ্জার অনুমতি প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পার্থক্যটুকু পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَ الْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ وَ حُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا

"আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হালাল করা হইয়াছে। আর পুরুষদের জন্য ইহা হারাম করা হইয়াছে।

অন্য এক হাদীছে আসিয়াছে যে, "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে জলন্ত আঙ্গারের ইচ্ছা করে সে যেন ইহা হাতের মধ্যে ধারণ করে।"

তিনি রেশম সম্পর্কে বলেনঃ

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে কিয়ামতের দিনে সে তাহা পরিধান করিতে পারিবে না।"

এই পর্যন্ত তো এইসব বস্তু পরিধান করা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অন্য যে কোন জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমপর্যায়ের। স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। যেমন–

لَا تَشْرَبُوا فِي اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ *

"স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করিও না। ইহাদের নির্মিত পেয়ালাতে আহার করিও না। ইহা তো দুনিয়াতে তাহাদের জন্য, আর পরকালে তোমাদের জন্য।"

২। নারীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও সামঞ্জস্যতা থেকে পুরুষদের পৃথক করা অত্যন্ত জরুরী। এই জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও রেশম পরিধান করা নারীদের জন্য খাছ করা হইয়াছে। আর রৌপ্যের আংটি পরিধান ব্যতীত উল্লিখিত বস্তুগুলি পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম করা হইয়াছে। আল্লামা ইবেন কাইয়েম (রহঃ) এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন যে,

بتحريم الذهب و الحرير على الرجال حرم الله ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله *

"পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হারাম করার মাধ্যমে পুরুষেরা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার উপায় আল্লাহ পাক হারাম করিয়া দিয়াছেন। এই ধরনের কাজ যে করে সে অভিশপ্ত।"

৩। আল্লাহ পাক বিলাস প্রিয়তা পছন্দ করেন না। রেশমী পোশাক পরিধান করা এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা এমন কাজ যাহা মানুষকে একবারে অধঃস্থলে পৌছাইয়া দেয়। আর চিন্তাধারাকে অন্ধকার ও অশুদ্ধ

খেয়ালের দিকে নিক্ষেপ করে। সারকথা; ইহা প্রমাণিত হইল যে, মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা খুব খারাপ বিষয়।

ইহা ধারাবাহিকভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন বিষয় নহে বরং মানুষের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে তাহাদের বিলাসপ্রিয়তাও বিভিন্ন হইয়া থাকে। কিছু সামগ্রী কাহারও জন্য বিলাসী উপকরণ বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও অন্যের জীবন ব্যবস্থার জন্য তাহা অতি স্বল্প। প্রয়োজন অপেক্ষাও অনেক কম। ইহার দ্বারা তাহার জীবন ব্যবস্থা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। আবার কাহারও দৃষ্টিতে যাহা খুব উত্তম জিনিস বলিয়া গ্রহণীয় অন্যের দৃষ্টিতে তাহা অসম্পূর্ণ এবং নিকৃষ্ট। এই জন্যই শরীয়ত যখন বিলাসপ্রিয়তার দোষ বর্ণনা করিয়াছে তখন এইসব জিনিস বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছে, যাহা মানুষ শুধু বিলাসী দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করে এবং এইসব দ্রব্য দ্বারা বিলাসিতা করা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। অধিকন্তু অনারবী ও রোমী লোকদিগকে এইসব দ্রব্য সম্পর্কে একমত পাইয়াছে। এই জন্য শরীয়ত এইসব দ্রব্যকে পূর্ণ বিলাসিতা ও আরাম আয়েশের সামগ্রী বিবেচনা করিয়া ইহাদের ব্যবহার হারাম করিয়া দিয়াছে। আর যে সকল বিলাসী সামগ্রী মানুষ খুব কম ব্যবহার করে অথবা আশেপাশের এলাকায় ইহাদের ব্যবহারের প্রথা চালু আছে– ইহাদের প্রতি শরীয়ত কোন দৃষ্টি দেয় নাই। এই জন্যই রেশম ও স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার হারাম করা হইয়াছে। ইহাদের ব্যবহার করার উপর ধমকিও দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تَأْكُلُوا فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَشْرَبُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ *

"তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে আহার করিও না এবং ইহাদের পেয়ালা দ্বারা পান করিও না। কেননা এইগুলি দুনিয়াতে তাহাদের (অমুসলমানদের) জন্য আর তোমাদের জন্য আখেরাতে।"

অন্য এক স্থানে বলেন–

اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করে তাহার পেটে জাহান্নামের অগ্নি নড়াচড়া করিতে থাকিবে।" আর নড়াচড়ার এই হুকুম শুধু স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করার সাথেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করার সমস্ত পন্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে গোসল করা, ওজু করা, ইহাদের মধ্যে তৈল রাখিয়া শরীরে মালিশ করা, ইহাদের সুরমাদানি ব্যবহার করা- প্রভৃতিও হালাল নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে হয়ত ইহাও অনুধাবন করা হইয়াছে যে, অমুসলমানদের পোশাক পরিচ্ছদের অনুরূপ পোশাক পরিচ্ছদ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। কেননা তাহাদের চলাফিরা ও পোশাক পরিচ্ছদের পন্থা থেকে দূরে থাকাই প্রধান উদ্দেশ্য। পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করা ইহার জলন্ত উদাহরণ। কেননা পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করিতে সংকোচবোধ করিয়া থাকে।[১]

ফটো রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

ইহার দ্বারা প্রতিমাপূজার দরজা খুলে। যখন ফটো রাখার প্রচলন ব্যাপক হইয়া পড়িবে অর্থাৎ সকল প্রকার লোক এই কার্যে লিপ্ত হইবে আবার এই দিকে যাহারা ফটো দেখে- তাহাদের সকলের বিবেক বুদ্ধিও এক রকম হয় না; বরং বিভিন্ন রকম হয়। তাই কোন না কোন সময় ইহাতে অনিষ্টতার সৃষ্টি হইবে। যেমন পূর্ববর্তী যুগে সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ববর্তী যুগে ফটো প্রস্তুতকারী তো প্রথমে ইহার পূজা করে নাই; বরং শুধু বড়দের স্মারক হিসাবে ফটো প্রস্তুত করিত। অবশেষে পূজা পর্যন্ত শুরু করিয়া দেয়।

নোট ঃ

১। পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করিতে সংকোচবোধ করে। অথচ সেও মুসলমান আবার নারীও মুসলমান। সংকোচবোধ করার কারণ নারী পুরুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের। অনুরূপভাবে চাকর-বাকর ও মেথরের পোশাক পরিধান করাও অপছন্দনীয়। কেননা তাহারা খুব নিম্নশ্রেণীর লোক। কাফের তো আরও নিম্নশ্রেণীর। তাহার পোশাকের অনুরূপ পোশাক কিভাবে পরিধান করা যাইতে পারে?

এক ব্যরিষ্টার সাহেবের কথা শুনুন; সে প্রতিদিন সকালে উঠিয়া স্বীয় পীরের ফটোর প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করিত। পরে অন্যান্য কার্য করিত। যখন উচ্চ পর্যায়ের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোক মওজুদ থাকিতে পারে তাহা হইলে সাধারণ লোকের কি অবস্থা হইবে? এই জন্য ফটো রাখা বিবেকের চাহিদা মোতাবেকও হারাম বলিয়া সাব্যস্ত।

চতুর্থ অধ্যায় / ফারায়েয

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *
نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

পরিত্যক্ত সম্পদে হকদারদের অংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণ

ইসলামী বিধান মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পদে হকদারদের অংশ পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক হকদারের নির্ধারিত অংশ হেফাজত হইয়া যায়। যদি মৃতব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও অভিভাবকদের মধ্য হইতে মাত্র একজনকে পূর্ণ সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইত আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অংশ নির্ধারিত না হইত- তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি সমুদয় সম্পদ স্বীয় প্রয়োজনে ব্যয় করিয়া ফেলিত এবং স্বীয় উপকার, প্রয়োজন ব্যতীত অন্যান্য হকদারের প্রয়োজনে ও শিক্ষাদীক্ষায় ব্যয় করিত না। আর তাহাদের অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিত না। পরিত্যক্ত সম্পদে অন্যায় ও ইনসাফবিহীন আচরণ শুরু করিত। এমনকি সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পদ ভোগ বিলাসে ব্যয় করিয়া ফেলিত। তাই আল্লাহ পাক ইনসাফবিহীন ও ন্যায় আচরণ বন্ধ করিবার জন্য, মৃত্যের পরিত্যক্ত সম্পদে প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্ধারণ করিয়া দিলেন, যাহাতে মাত্র একজন অন্যান্য হকদারদের প্রাপ্য নিজের প্রয়োজনে খরচ না করিতে পারে। বরং সকল হকদারই স্বীয় অংশ মোতাবেক প্রাপ্য সম্পদ লইয়া স্বাধীনভাবে খরচ করিয়া লাভবান হইতে পারে। কোন কোন স্থানে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে এক প্রথা চালু রহিয়াছে, যাহা খুবই খারাপ। তাহা হইল; পিতার বড় পুত্র তাহার সম্পদের মালিক হয়। আর অন্যান্য হকদাররা শুধু প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদের মালিক হয়। তাহাদের এই প্রথাতে ইনসাফবিহীন আচরণ প্রত্যক্ষ হইতেছে। তাহাদের এই প্রথার এমন কোন চিকিৎসা নাই যাহা অধিকার বঞ্চিত কোন হকদার করিতে পারে।

প্রত্যেক হকদারের প্রাপ্যাংশ নির্ধারিত হওয়ার দার্শনিক তত্ত্ব আল্লাহ পাক কুরান করীমে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে হকদারের হক নষ্ট হইয়া না পড়ে।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا .... وَ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا
يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ *

"পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়রা যে সম্পদ ছাড়িয়া যায় তাহা হইতে পুরুষদের অংশ রহিয়াছে। আবার পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়রা যে সম্পদ ছাড়িয়া যায় নারীদের জন্যও ইহা হইতে অংশ রহিয়াছে; ছাড়িয়া যাওয়া সম্পদ কম হউক বা বেশী হউক। আর অংশও রহিয়াছে নির্ধারিত অংশ।

.... যাহারা বে-ইনসাফীভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে- তাহারা শুধু অগ্নি উদরস্থ করে। তাহারা অতি সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ পাক তোমার জন্য ফরয করিয়াছেন, এক পুরুষ দুই নারীর সমান অংশ পাইবে। (নিসা)

অত্র আয়াতে শুধু ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণের আহকামের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা অধিকাংশ সময় মৃতব্যক্তি ছোটছোট বাচ্চা রাখিয়া যায়। আর তাহার বড় বড় ছেলেরা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা সমস্ত সম্পদ হজম করিয়া বসে। সুতরাং এইরূপ করার ক্ষেত্রে শক্ত ধমকি আসিয়াছে।

অতঃপর নির্ধারিত অংশের বিবরণ প্রদান يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ আয়াত থেকে শুরু হইয়াছে। আর ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই আয়াতের পর হইতে শুরু হইয়াছে। উল্লিখিত কারণটি তো উত্তরাধিকারীদের সাথে সম্পর্কিত। অধিকন্তু হকদারদের নির্ধারিত হক অনুযায়ী সম্পত্তি বন্টন করার মধ্যে সম্পদেও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। সম্পত্তি যত বেশীই হউক না কেন ইহার বিভিন্ন অংশের হকদার নির্ধারিত হওয়া ইহার হেফাজতের উপায়। কেননা প্রত্যেক অংশীদার স্বীয় নির্ধারিত অংশের কারণে এই ইজমালী সম্পত্তির কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টা করিবে।

সুতরাং কোন সম্পত্তির অংশীদার অধিক হওয়া ইহার হেফাজত মজবুতভাবে হওয়ার উপায়। ইহা তো সম্পত্তি বন্টন করিয়া পৃথক পৃথক না করিয়া ইজমালী রাখার অবস্থার আলোচনা। কিন্তু যদি সম্পত্তি বন্টন করিয়া প্রত্যেকের প্রাপ্যাংশ পৃথক পৃথক করিয়া দেওয়া হয়– তাহা হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশের উন্নতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিবে, যাহা সম্পত্তির মালিক একজন হওয়ার আর অন্যান্যর শুধু প্রয়োজনীয় খরচাদির পরিমাণ মালিক হওয়ার অবস্থায় সম্ভব ছিল না।

কেননা যে সম্পদের একজন যতটুকু অধিকার পায় তদাপেক্ষা অধিক ভোগ করিতে থাকিলে অন্যান্যরা কেন ইহার উন্নতির চেষ্টা করিবে? উন্নতির জন্য চেষ্টা করা তো এমন অবস্থায় হয় যখন প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক পৃথকভাবে মালিক হয়। তবে যদি কাহারও নির্ধারিত অংশকে পৃথক করিয়া দেওয়ার পর সে স্বীয় অংশ হইতে বে-হিসাব খরচ করিতে থাকে, আর ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা না করে, আর এই কারণে কেহ মীরাসী বিধান হেকমত পরিপন্থী বলিয়া মনে করে– তাহা হইলে ইহা হইবে বিবেক পরিপন্থী অভিমত। প্রকৃতপক্ষে তাহার বে-হিসাব খরচ করা এবং ভবিষ্যত চিন্তা না করা তাহার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত ও দূরদৃষ্টির অভাবে হইয়াছে। যদি তাহার এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয়– তাহা হইলে শুধু মীরাসের ক্ষেত্রে আপত্তি কেন? অন্যান্য ক্ষেত্রেও হওয়া চাই। এমনকি যে ব্যক্তি স্বীয় উপার্জিত অর্থে এইরূপ আচরণ করে তাহার উপার্জিত অর্থও তাহার হাত থেকে ছিনাইয়া লইয়া তাহার বড় ভাইয়ের হাতে সোপর্দ করা দরকার।

অধিকন্তু মানুষের একটি স্বাভাবিক স্বভাব হইল এই যে, নিজের জিনিস বে-হিসাব খরচ করিলেও এতটুকু দুঃখ পায় না যতটুকু দুঃখ পায় নিজের জিনিস অন্যের হাতে থাকা অবস্থায় চাহিলে যখন পায় না। তবে যদি কাহারও এই সত্য অনুভব করিবার যোগ্যতাই না থাকে তাহার সাথে আমাদের কোন কথা নাই।

মীরাস বন্টনের তত্ত্বকথাঃ

মীরাসী সম্পত্তি বন্টনের মূলনীতিসমূহের ভিত্তি তিনটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ মৃতব্যক্তির ইয্যত সম্মান [illegible] তাহার

স্থলাভিষিক্ত হওয়া। কেননা মানুষের পর কেহ তাহার স্থলাভিষিক্ত হউক– এই বিষয়ে সে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। দ্বিতীয়তঃ সেবা, সহানুভূতি প্রদর্শন, মহব্বত স্নেহ এবং এই ধরনের বিষয়। তৃতীয়তঃ নিকটাত্মীয় হওয়া, যাহা উল্লিখিত উভয় বিষয়কে শামিল করে।

উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় বিষয়টির বিবেচনা অগ্রাধিকার পাইয়া থাকে। এইসবের মধ্যে প্রধান এমন এক ব্যক্তি যে মৃতব্যক্তির বংশধারার স্তম্ভ। যেমন পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র। এইসব লোক মীরাসের অধিক হকদার। তবে তাহাদের মধ্যে হকদারিত্বের প্রাধান্য বিবেচিত হয় স্বভাবগত নিয়ম অনুযায়ী যুগ যুগ ধরিয়া যে নিয়ম নিখিল বিশ্বের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। পুত্র পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। তাহার প্রতিই মানুষের আশা আকাঙক্ষা থাকে। তাহার উদ্দেশ্যেই বিবাহ-শাদী করে এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করে। পিতা পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়া স্বভাবগত নিয়মের চাহিদা নয়। মানুষের পিতার প্রতি এই আশা আকাঙক্ষাও থাকে না যে, মৃত্যুর পর পিতা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবে। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি তাহার সম্পদ কাহাকে প্রদান করিবে– ইহার এখতিয়ার দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে এই ক্ষেত্রে পুত্রের প্রতি সহানুভূতিকে পিতার প্রতি সহানুভূতির উপর প্রাধান্য দিবে। এই জন্য সকল মানুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক নিয়ম রহিয়াছে যে, তাহারা পিতার মোকাবিলায় পুত্রকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকে। অতঃপর ভ্রাতার মধ্যেও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা পাওয়া যায়। অতঃপর যে ব্যক্তি ভ্রাতার ন্যায় বাহুবল বিবেচিত হয়। অধিকন্তু সে তাহার সম্প্রদায়ের ও বংশের হয়। (অর্থাৎ পিতামহ, পিতৃব্য)

অবশিষ্ট রহিল সেবা, মহব্বত ও স্নেহের দিক। এই দিক থেকে নিকটাত্মীয় মহিলা প্রাধান্য পাওয়ার জন্য বিবেচিত। তাহাদের মধ্যে মাতা ও কন্যা অগ্রাধিকার পাইয়া থাকে। অনুরূপভাবে যাহাদিগকে বংশধারার স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মোটামুটিভাবে কন্যাও পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। অতঃপর ভগ্নি। সেও স্থলাভিষিক্ত হওয়া থেকে খালি নহে। অতঃপর হকদার এমন এক নারী যে তাহার সাথে বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়াছে। স্ত্রী সেবিকা হইয়া থাকে।

অতঃপর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ও ভগ্নি। উল্লিখিত মহিলাগণ মীরাস পাওয়ার ভিত্তি হইল– শুধু সেবা ও স্নেহ অথবা আত্মীয়তা এবং সেবা ও স্নেহ।

নারীদের সহানুভূতি এবং স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা পাওয়া যায় না। কেননা নারীদের সাধারণতঃ ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহ হইয়া যায়। আর এইভাবে তাহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। তবে কন্যা ও ভগ্নির মধ্যে কিছু হইলেও সহানুভূতির গুণ ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা পাওয়া যায়। আর এই গুণাবলীর প্রধান স্থান হইল– সবচাইতে নিকটাত্মীয়া মহিলা। যেমন মাতা, কন্যা অতঃপর ভগ্নি। মৃতব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে পিতা এবং পুত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর ভ্রাতা। তারপর চাচা। অধিকন্তু স্নেহ-মমতা ও পিতা-পুত্রের মধ্যে সর্বাধিক পাওয়া যায়। অতঃপর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মধ্যে অধিক পাওয়া যায়। মীরাসের ক্ষেত্রে ফুফু চাচার ন্যায় নহে। কেননা বিপদাপদের সময় চাচা কাজে আসে কিন্তু ফুফু কাজে আসিতে পারে না। অধিকন্তু ফুফু আত্মীয়তার নৈকট্যের দিক দিয়া ভগ্নির সমকক্ষ নয়।

মীরাস বন্টনের বিভিন্ন নীতির মধ্যে ইহাও একটি নীতি যে, একই স্তরের নারী পুরুষ যখন মীরাসের হকদার হয় তখন পুরুষকে নারীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। কেননা ইযযত সম্মানের হেফাজতের সাহায্যের ক্ষেত্রে পুরুষই খাস। অধিকন্তু পুরুষের খরচাদিও অধিক। সুতরাং এই সম্পদ পাওয়ার অধিক হকদার পুরুষ। কিন্তু নারীদের ব্যাপার ভিন্ন। তাহারা নিজেদের স্বামী, পিতা এবং ভ্রাতাদের দায়িত্বে থাকে।

ইহার বিভিন্ন নীতির মধ্যে ইহাও একটি যে, যখন কোন সম্পত্তিতে একই স্তরের একদল উত্তরাধিকারী একত্রিত হয়, তখন প্রাপ্য সম্পদ সকলের মধ্যে বন্টন করা জরুরী। কেননা এই ক্ষেত্রে একের তুলনায় অপরের অগ্রাধিকার নাই। যদি তাহারা বিভিন্ন স্তরের হয়– তাহা হইলে তাহারা আবার দুই গ্রুপে বিভক্ত।

প্রথম গ্রুপঃ তাহারা সকলে একই নামে এবং একই কারণে উত্তরাধিকারী হইবে। যেমন মাতা, নানী, নানীর মাতা সকলেই এক নামের অন্তর্ভুক্ত এবং একই কারণে উত্তরাধিকারী তাহাদের সম্পর্কে নীতি এই যে, মৃতের নিকট সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হইবে।

দ্বিতীয় গ্রুপঃ যাহারা বিভিন্ন নামের অন্তর্ভুক্ত আবার তাহারা একই কারণে উত্তরাধিকারী নয়। তাহাদের মধ্যে কেহ দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী আবার কেহ নিকট সম্পর্কীয়। এই ক্ষেত্রে নিকট সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী দূর সম্পর্কীয়কে বঞ্চিত করিবে না; বরং তাহার অংশ হ্রাস করিয়া দিবে। মীরাসী সম্পত্তি বন্টনের এক নীতি এই যে, মীরাসের প্রাপ্যাংশ নির্ধারণে যে সকল সংখ্যা ব্যবহৃত হইবে– তাহা যেন এমন হয় যে, হিসাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকলেই প্রথম দৃষ্টির দ্বারাই পার্থক্য করিয়া লইতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারা এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَ لَا نَحْسِبُ *

"আমরা উম্মীলোক, লিখতেও পারি না আবার হিসাব করিতেও পারি না।"

কেননা, যে হুকুমটি পালনের দায়িত্ব সকলের উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে তাহাতে হিসাব করিতে হইলে হিসাবের ক্ষেত্রে অধিক চিন্তা ফিকিরের প্রয়োজন না হওয়া অত্যন্ত জরুরী। অধিকন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহার কমবেশীর ধারাবাহিকতা জ্ঞাত হইয়া যাওয়াও অপরিহার্য। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শরীয়তে প্রাপ্যাংশ নির্ধারণের জন্য দুই প্রকার সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছে।

এক প্রকারঃ দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ, এক ষষ্ঠাংশ। দ্বিতীয় প্রকার, অর্ধাংশ, এক চতুর্থাংশ, এক অষ্টমাংশ। অষ্টমাংশ। এই সংখ্যাগুলি মাত্র দুইটি মৌলিক সংখ্যা হইতে লওয়া হইয়াছে। প্রথম প্রকারের সংখ্যাগুলি লওয়া হইয়াছে তিন হইতে। দ্বিতীয় প্রকারের সংখ্যাগুলি লওয়া হইয়াছে দুই সংখ্যা হইতে। আর এইগুলি উভয় সংখ্যার মধ্যে তিন পর্যায়ে পাওয়া যায়। যদি নীচ হইতে উপরের দিকে চলিতে থাকে– তাহা হইলে একটি অপরটির দ্বিগুণ হয়। আর যদি উপর হইতে নীচের দিকে আসিতে থাকে– তাহা হইলে অপরটির আধা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি অপরটি হইতে কম হওয়া বা একটি অপরটি হইতে বেশী হওয়া সম্পূর্ণ প্রকাশ্য এবং সহজ বোধগম্য।

পুরুষের প্রাপ্যাংশ নারী অপেক্ষা দ্বিগুণ হওয়ার কারণ

আল্লাহ পাক বলেন–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ * فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"আল্লাহ পাক তোমাদিগকে নিজেদের সন্তানদের মধ্যে (মীরাস বন্টন) শিক্ষাদিতেছেন যে, এক পুরুষের মীরাসের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি নারীর সংখ্যা দুইয়ের অধিক হয়– তাহা হইলে তাহাদের সকলে মিলিতভাবে দুই তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি নারী একজন হয় তাহা হইলে সে পুরা সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে।"

পুরুষের অংশ নারীর অংশের দ্বিগুণ হওয়ার কারণ আল্লাহ পাক বর্ণনা করিতেছেন যে,

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا

"পুরুষেরা নারীদের উপর হুকুম জারী করনেওয়ালা। কেননা আল্লাহ পাক কতককে অন্য কতকের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। আর এই জন্য যে, তাহারা নিজেদের নারীদের প্রয়োজনে মাল খরচ করে।"

এক কন্যার সম্পদের অর্ধাংশ পাওয়ার কারণ

মৃতব্যক্তির এক কন্যা থাকিলে সে পুরা সম্পদের অর্ধাংশ পায়। কেননা যদি মৃতব্যক্তির একটি মাত্র পুত্র থাকে তাহা হইলে পুত্র পুরা সম্পদের মালিক হয়। আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন যে,

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ *

"অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পায়।"

পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাওয়ার এই নীতি মোতাবেক এক কন্যা সমুদয় সম্পদের অর্ধেকের হকদার।

দুই বা ততোধিক কন্যার দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পাওয়ার কারণ

দুই কন্যা পুরা সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পায়। যদি এক কন্যার সাথে এক পুত্র থাকিত তাহা হইলে এক কন্যা মাত্র এক তৃতীয়াংশ পাইত। সুতরাং যদি আরও কোন কন্যা থাকে– তাহা হইলে উল্লিখিত নীতি মোতাবেক দ্বিতীয় কন্যাও এক তৃতীয়াংশের কম পাইবে না। তৃতীয় কোন কন্যা থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে একই নীতি গ্রহণ করা হইবে। এই হিসাবে তৃতীয় কন্যাও এক তৃতীয়াংশের হকদার। কিন্তু যেহেতু মীরাসের ক্ষেত্রে নারীরা দুই তৃতীয়াংশের অধিক পাইতে পারে না; তাই নারীর সংখ্যা দুই–এর অধিক হইলেও দুই তৃতীয়াংশের মধ্যেই শরীক হইবে।

মৃতব্যক্তির সন্তান থাকিলে পিতা–মাতার প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত

আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ

"মৃতব্যক্তির পিতা–মাতার প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত, ঐ সম্পদ হইতে যাহা মৃতব্যক্তি ছাড়িয়া মৃত্যুবরণ করে; যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে। যদি তাহার সন্তান না থাকে তাহা হইলে পিতা–মাতা উভয়ে সম্পদের হকদার হয়। তখন তাহার মাতা পায় এক তৃতীয়াংশ। যদি মৃতব্যক্তির দুই বা ততোধিক ভাই (বা বোন) থাকে তাহা হইলে মৃতব্যক্তির মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাইবে।"

ইতিপূর্বে তোমরা পরিষ্কারভাবে অবগত হইতে পারিয়াছ যে, পিতা–মাতার তুলনায় সন্তানই মীরাসের অধিক হকদার। তাহাদের অধিক হকদারিত্বের প্রকাশ এইভাবে হইয়াছে যে, সন্তানদিগকে দুই তৃতীয়াংশ আর পিতা–মাতাকে এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পিতার প্রাপ্যাংশ মাতা হইতে অধিক নির্ধারিত করা হয় নাই। কারণ পিতা পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার এবং পুত্রের সাহায্য সহযোগিতার দিক দিয়া প্রাধান্য

পাওয়ার বিবেচনা করা হইয়াছে পিতাকে পুত্রের 'আসাবা' নির্ধারণ করা অবস্থায়। আর মাতা কখনও আসাবা হয় না। সুতরাং এই দিক দিয়া পিতার প্রাধান্য রহিয়াছে। তাই এখন দ্বিতীয়বার তাহাকে অধিক প্রদান করার মাধ্যমে তাহার প্রাধান্যের বিবেচনা করা হয় নাই।

মৃতব্যক্তির সন্তান না থাকিলে সমুদয় সম্পত্তির হকদার পিতা–মাতা হওয়ার কারণ

মৃতব্যক্তি সন্তানহীন হইলে যাহারা তাহার সম্পত্তির হকদার হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে– তন্মধ্যে পিতা–মাতা অপেক্ষা অধিক হকদার অন্য কেহ নাই। এই জন্য তাহার পিতা–মাতা তাহার সমুদয় সম্পদের হকদার হইবে। তবে পিতা–মাতার উপর প্রাধান্য পাইবে। তবে পিতার এই প্রাধান্য পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাওয়ার নীতির ভিত্তিতে নয় বরং মাতার অংশ প্রদানের পর পিতা 'আসাবা' হিসাবে অবশিষ্ট সম্পদ পাওয়ার ভিত্তিতে।

মৃতব্যক্তির মাতা এবং ভ্রাতা–ভগ্নি বিদ্যমান থাকিলে মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাওয়ার কারণ

যদি মৃতব্যক্তির মাতা এবং ভ্রাতা–ভগ্নি বিদ্যমান থাকে আর ভ্রাতা–ভগ্নি একাধিক থাকে তাহা হইলে মাতা সমুদয় সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ পায়। কেননা এই ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ যদি 'আসাবা' না হয় এবং মৃতব্যক্তির বেশ দূর সম্পর্কের আসাবা থাকে। আসাবা (বংশ সম্পর্কীয়) হওয়া আর স্নেহ–মহব্বত এক পর্যায়ভুক্ত নহে। তাই আসাবাদিগকে অর্ধেক সম্পদ আর স্নেহ–মহব্বতকারীদিগকে অর্ধেক সম্পদ মিলে। অতঃপর স্নেহ–মহব্বতের কারণে প্রাপ্ত সম্পদ মাতা ও তাহার সন্তানাদির মধ্যে বন্টিত হয়। যেহেতু মাতার অংশ এক ষষ্ঠাংষের কম হয় না তাই মাতাকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট সম্পদ মাতার সন্তানাদি অর্থাৎ মৃতের ভ্রাতা–ভগ্নিকে প্রদান করা হয়।

মাতা, বৈপিত্রেয় ভাই বৈপিত্রেয় ভাই চাচা

আর যদি এই ভ্রাতা ভগ্নিগণ আসাবা হয়, তাহা হইলে নিকটতম সম্পর্ক এবং সাহায্য সহযোগিতা উভয় গুণ তাহাদের মধ্যে একত্রিত হইল। অনেক সময় তাহাদের সাথে অন্যান্য উত্তারাধিকারীও থাকে। উদাহরণ স্বরূপ; কন্যা, পুত্র, স্বামী। যদি মাতাকে এক ষষ্ঠাংশের অধিক প্রদান করা হয় তাহা হইলে তো অন্যান্যদের অংশ কম হইয়া পড়িবে।

সন্তান না থাকিলে স্বামী স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদ হইতে অর্ধেক পায় আর সন্তান থাকিলে এক চতুর্থাংশ পায়। অনুরূপভাবে সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ আর সন্তান থাকা অবস্থায় এক অষ্টমাংশ পায়– এই তারতম্যের কারণ কি?

আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجكم اِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ *

"যদি তোমাদের স্ত্রীদের সন্তান না থাকে তাহা হইলে তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হইতে তোমরা অর্ধাংশ পাইবে। যদি তাহাদের সন্তান থাকে তাহা হইলে তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাইবে; কিন্তু তাহাদের অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর।

আল্লাহ পাক অন্য স্থানে বলেনঃ

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ *

"যদি তোমাদের সন্তান না থাকে তাহা হইলে তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে এক চতুর্থাংশ পাইবে। আর যদি সন্তান থাকে তাহা

হইলে এক অষ্টমাংশ পাইবে। তোমরা যে অসিয়ত করিয়াছ তাহা পুরা করার এবং তোমাদের ঋণ পরিশোধ করার পর।"

স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদ হইতে স্বামী অংশ পায়। কারণ স্ত্রী এবং তাহার সম্পদের উপর স্বামীর কবজ থাকে। সুতরাং তাহার কব্জ থেকে সমুদয় সম্পদ বাহির করিয়া ফেলিলে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীর সেবা করার, তাহার প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করার বিনিময়ে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অংশ লাভ করে। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর উপর প্রাধান্য পাইয়া থাকে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ *

"পুরুষরা নারীদের নিয়ন্ত্রক।" অতঃপর তাহাদের অংশ প্রদানের বেলায় ইহাও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, তাহারা একে অপর থেকে অংশ লাভ করিতে গিয়া সন্তানদের অংশ যেন সংকীর্ণ না হইয়া পড়ে। এই জন্য উপরে নির্ধারিত অংশ খুব উপযোগী হইয়াছে। আর স্বামী ও স্ত্রীর প্রাপ্যাংশের মধ্যে তারতম্য করা হইয়াছে।

সতর্কতাঃ বিধবা নারীদের প্রতি মানুষের আচরণ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য বোধ হয় যে, যখন কোন বিধবা নারী স্বামীর নিকট হইতে ওয়ারিস সূত্রে কোন সম্পত্তির মালিক হয় আর পরে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হয় তখন মৃত স্বামীর অন্যান্য ওয়ারিসরা তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লয়। বিধবাকে ইহা হইতে বঞ্চিতা করে। অথচ ইসলামী নীতি মোতাবেক উক্ত নারী দ্বিতীয় বিবাহের সময় উক্ত সম্পত্তি বিক্রি করার অথবা নিজেই ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার রাখে।

অনুরূপভাবে অনেকে আরও একটি ভুলের শিকার হইয়া বসে। তাহা হইল; কোন নারীকে কোন মালের মালিক বানানের পর সে বিধবা হইয়া পড়িলে বা তালাক প্রাপ্তা হইলে তাহার থেকে সে মাল ফিরাইয়া লওয়া হয়। অথচ আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ *

"তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহা ফেরত লওয়া তোমাদের জন্য হালাল নহে।" তবে যদি নারী এই মালের বিনিময়ে স্বামী হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে চায়– তাহা হইলে হইতে পারে।

নিঃসন্তান মৃতব্যক্তির ওয়ারিসগণের প্রাপ্যাংশ কমবেশী হওয়ার কারণ

আল্লাহ পাক এক জায়গায় বলিয়াছেনঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ وَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"যাহার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টিত হইতেছে যদি সে নিঃসন্তান হয় এবং তাহার পিতাও জীবিত না থাকে; কিন্তু তাহার ভাই অথবা বোন রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ করিয়া পাইবে। যদি ভাই বোন অধিক হয়– তাহা হইলে সকলে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে শরীক হইবে।

অন্য এক স্থানে বলেনঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

"আপনার কাছে তাহারা মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতেছে। নিঃসন্তান ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে। আপনি বলিয়া দিন যে, নিঃসন্তান ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে মাসআলা বর্ণনা করিতেছেন যে, যদি কোন এমন পুরুষ মৃত্যুবরণ করে যাহার কোন সন্তান নাই কিন্তু তাহার ভগ্নি রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে তাহার এই এক বোন অর্ধাংশের হকদার হইবে। আর যদি ভগ্নির সন্তান না থাকে তাহা হইলে এই ব্যক্তি এই ভগ্নির সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। যদি এই ব্যক্তির দুই ভগ্নি থাকে তাহা হইলে উভয়ে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে দুই তৃতীয়াংশের হকদার হয়। যদি এই ব্যক্তির ভাই বোন উভয়ই বিদ্যমান থাকে– তাহা হইলে

এক পুরুষ দুই নারীর সমান সম্পদ পায়– এই নীতির ভিত্তিতে সম্পদ বন্টিত হইবে।"

অত্র আয়াতে উল্লিখিত ভাই বোন সম্পর্কে সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, এই আয়াতে সহোদর ভাই–বোন এবং বৈমাত্রেয় ভাই–বোনের কথা বলা হইয়াছে। নিঃসন্তান ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের মীরাসী বন্টনের তত্ত্বকথা মৃতব্যক্তির 'মাতা ও ভাই–বোন বিদ্যমান থাকার অধ্যায়ে' বর্ণিত ভাই–বোনের অংশ নির্ধারণের দর্শনে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মৃতব্যক্তির চাচা এবং তাহার সন্তানদের মীরাসের হকদার হওয়ার আর তাহার খালা মীরাস থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ

মৃতব্যক্তির চাচার সন্তানেরা মীরাসের হকদার হওয়া আর তাহার খালা মীরাস থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ এই যে, তাহার চাচার সন্তানেরা তাহার পক্ষপাতিত্ব, সহযোগিতা, সাহায্য সহানুভূতি ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিক সংশ্লিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে মৃতের মাতার আত্মীয়রা অপরিচিত লোকের ন্যায়; আপনজনের ন্যায় নহে। তাহারা নিজেদের পিতার দিকে সম্পর্কিত হয়। সুতরাং তাহারা কন্যার আত্মীয়দের পর্যায়ে।

কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে আপত্তি এবং হযরত ইবনে কাইয়েম জাওয়ী (রঃ) –এর দার্শনিক জবাব

কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন হযরত ইবনে কাইয়েম (রহঃ)–এর সামনে উথাপিত করা হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রশ্ন এইভাবে উথাপিত হইয়াছিল যে, ধর্ম বিরাগী, ধর্মত্যাগী ও কাফেররা কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কে নিম্নোল্লেখিত প্রশ্ন উথাপন করে আমরা ইহার কি জবাব দিব? প্রশ্নগুলি হইতেছেঃ

কবর কিভাবে দোযখের গর্ত হইতে একটি গর্ত আর বেহেশতের বাগিচা হইতে একটি বাগিচা হইতে পারে? অধিকন্তু কবর কিভাবে প্রশস্ত ও সংকীর্ণ

হইতে পারে? অথচ কবর এত ছোট্ট যে মৃতব্যক্তি ইহাতে বসিতেও পারে না আবার দাঁড়াইতেও পারে না।

তাহারা ইহাও বলে যে, আমরা কবর খনন করি কিন্তু ইহাতে অন্ধ, বধির ফিরিশতা দেখিতে পাই না, যাহাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাহারা লোহার গদা এবং হাতুড়ী দ্বারা মৃতব্যক্তিকে মারিতে থাকিবে। অধিকন্তু কবরে অজগর সাপ দেখিতে পাই না। জলন্ত অগ্নির লেলিহান শিখাও অনুভূত হয় না। যদি কবর খুঁদিয়া মৃতব্যক্তির উল্লিখিত অবস্থাসমূহের কোন এক অবস্থা অবগত হইতাম তাহা হইলে মৃতব্যক্তিকে সর্বদা এক অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পাইতাম না। অথচ যদি আমরা তাহার চোখের উপর কোন একটি টুকরা রাখিয়া দেই অথবা তাহার বক্ষের উপর সরিষার কোন একটি দানা রাখিয়া দেই তাহা হইলে আমরা ইহাকে একই অবস্থায় দেখিতে পাই। ইহার অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখি না।

মৃতব্যক্তির দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায় তত দূর পর্যন্ত কবর কিভাবে প্রশস্ত হয় এবং সংকীর্ণ হয়? অথচ মৃতব্যক্তির দাফনের পরেও আমরা কবর পূর্বাবস্থায়ই দেখিতে পাই এবং মৃতব্যক্তির কবরস্থ করার সময় কবর যতটুকু প্রশস্ত ছিল তখনও ততটুকুই প্রশস্ত পাওয়া যায়। পূর্বাবস্থা হইতে অধিক প্রশস্ত পাওয়া যায় না। আর তদাবস্থা হইতে সংকীর্ণও পাওয়া যায় না। সুতরাং কবর সংকীর্ণ হওয়ার কথা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? ফিরিশতা এবং যে আকৃতি মৃতব্যক্তির সাথে প্রাতিস্থাপন করে অথবা তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে কবরে কি ভাবে তাহার স্থান সংকুলান হইতে পারে?

এই সব ধর্মত্যাগী কাফেররা ইহাও বলে যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কথা বলে যাহা বিবেক পরিপন্থী হয় এবং যাহা চোখে দেখা যায় না– বুঝিতে হইবে এই কথাতে সে নিশ্চিতভাবে ভুল করিয়াছে। তাহার এই কথা কখনও সহীহ নহে।

তাহারা ইহাও বলে যে, ফাসীতে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে আমরা এক দীর্ঘ সময় ফাসীকাষ্ঠে ঝুলন্ত দেখিতে পাই। সেখানে মুনকীর নকীর তাহাকে প্রশ্ন করিতে এবং তাহার দেহের উপর জলন্ত অগ্নিও দেখিতে পাই না। হিংস্র জন্তু যাহাকে ফাঁড়িয়া ছিড়িয়া ভক্ষণ করিয়াছে, পক্ষী যাহাকে স্বীয় ঠোটের দ্বারা টুকরা

টুকরা করিয়া হজম করিয়াছে অতএব তাহার দেহের বিভিন্ন অংশ পশুপক্ষীর উদরস্থ হইয়াছে। সাপের পেটে চলিয়া গিয়াছে। বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের দেহের বিভিন্ন অংশের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাহাকে মুনকীর নকীরের প্রশ্ন কি ভাবে সম্ভব হইতে পরে? তাহার সম্বন্ধে ইহা বলা কিভাবে সম্ভব যে, তাহার কবর বেহেশতের একটি টুকরা বা জাহান্নামের একটি গর্ত। তাহার জন্য কবর কিভাবে এত সংকীর্ণ হইবে যে, তাহার এক দিকের পাঁজর অপরদিকের পাঁজরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবে?

তাহাদের উল্লিখিত আপত্তিসমূহের জবাবঃ

তাহাদের আপত্তিসমূহের জবাব দেওয়ার জন্য আমরা ভূমিকা স্বরূপ এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিব, যাহাতে জবাব বুঝা সহজ হয়।

১। বিবেক যাহা সম্ভব বলিয়া জানে এবং যাহা অসম্ভব বলিয়া বিবেক নির্ভুল প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারে এমন কোন কথা আম্বিয়াগণ বলেন নাই। বরং আম্বিয়াগণের প্রদত্ত সংবাদ দুই ধরনের হয়। এক প্রকার হইল যাহা বিবেক স্বভাব সম্মত হয়। দ্বিতীয় প্রকার হইল যাহা নিছক বিবেক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ– গায়বের (অদৃশ্যের) কথা ধরা যাক। যেমন আলমে বরযখ, কিয়ামত, আযাব প্রভৃতি সম্পর্কে রাসূলগণ বিস্তারিত বিবরণ পেশ করিয়াছেন। তবে রাসূলগণের প্রদত্ত সংবাদ সর্বাবস্থায় নির্মল বিবেকের কাছে অসম্ভব হয় না। (যদি বাহ্যিকভাবে তাহা অসম্ভবও হয় এবং বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়– তাহা হইলে শরীয়তের অন্যান্য বিধান মোতাবেক ইহার ব্যাখ্যা প্রদান ওয়াজিব।) কবরে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সংবাদ দ্বিতীয় প্রকারের। প্রকৃতপক্ষে বিবেকের বিচারে এইসব ঘটনা অসম্ভব নয়। বরং বিবেকের শক্তি ততটুকু পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। ইহা ওহীর মুখাপেক্ষী। অবশ্য ইহাকে বিবেকের বিচারে অসম্ভব বলিয়া মনে করা শুধু মাত্র ধারণা। এইরূপ ধারণা পোষণকারী কবরের ঘটনাসমূহ বিবেকের বিচারে অসম্ভব হওয়াকে বিবেক সম্মত বলিয়া মনে করে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইলঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী কমবেশী না করিয়া সঠিক স্থানে রাখিয়া বুঝা। তাঁহার কথার এমন অর্থ না বুঝা যাহা তিনি ইচ্ছা করেন নাই। যে ব্যক্তি তাহার বাণীর উদ্দেশ্য ও মর্ম হইতে

অন্য দিকে ফিরিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার বাণীর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে অলসতা করিয়াছে– সে সরল পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের বাণী সম্বন্ধে মানুষ ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার ফল স্বরূপ ইসলামে অনেক বেদাতী ও পথভ্রষ্ট দলের জন্ম হইয়াছে। যেমন কদরীয়া, মুলহেদ, খারেজী, মু'তাজিলা, জাহামিয়া, রাফেজী প্রভৃতি। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম এমনসব লোকদের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের সহীহ বুঝ না থাকার কারণে এক বিষয়কে অপর বিষয় বলিয়া বুঝিয়া থাকে। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্য যাহা ছিল এবং সাহাবাগণ যাহা বুঝিয়াছিলেন– অধিকাংশ লোক তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহার দিকে অনেক কম লক্ষ্য করিতেছে।

তৃতীয় বিষয় হইল– আল্লাহ পাক মানুষের জন্য তিনটি পর্যায় নির্ধারিত করিয়াছেন। দুনিয়া, বরযখ, চিরস্থায়ী ঘর। প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য কিছু কিছু পৃথক পৃথক বিধান নির্ধারণ করিয়াছেন। আর প্রত্যেক পর্যায়ের বিধান ঐ পর্যায় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ পাক মানুষকে দেহ-আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্টি করিয়াছেন। জাগতিক জীবনে তাহার দেহের উপর বিধান জারী করিয়াছেন। আর আত্মাকে দেহের অধীনস্থ করিয়াছেন। এই জন্যই অন্তরে যে কথা লুকায়িত থাকুক না কেন উহার খেয়াল না করিয়া মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ–প্রতঙ্গের দ্বারা প্রকাশিত কার্যাবলী দ্বারা শরয়ী আহকামের অস্তিত্ব দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে আলমে বরযখের বিধানসমূহ রূহের জন্য জারী করিয়াছেন। তথায় দেহ রূহের অধীন করিয়াছেন। দুনিয়ার জীবনে রূহ দেহের অধীন। দেহে ব্যথার কারণে রূহ ব্যথিত হয়। দেহের উপভোগের মাধ্যমে রূহ উপভোগের স্বাদ হাসিল করে। পক্ষান্তরে কবরে বা আলমে বরযখে দেহের ব্যথিত হওয়া রূহের ব্যথিত হওয়ার অধীন হয়। রূহের দুঃখ–সুখ সহ্য করা রূহের সহ্যের অধীন হয়। দুনিয়াতে দেহ প্রকাশ্য ও রূহ অপ্রকাশ্য। আলমে বরযখে রূহ প্রকাশ্য হয় আর দেহ অপ্রকাশ্য ও গোপনীয় হয়। বরযখী আহকাম রূহের উপর জারী হয়। অর্থাৎ রূহের সুখ–দুঃখ পৌঁছিলে তখন রূহওয়ালার শরীরেও তাহা জারী হয়। যেমন জাগতিক জীবনে দেহের দুঃখ-সুখের প্রভাব রূহের উপর পড়িয়া থাকে।

আলমে বরযখের অবস্থার এই আলোচনার পর স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, আলমে বরযখে সংঘটিত বিষয়সমূহ মানুষের বাহ্যিক দেহের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া জরুরী নহে। এইগুলি অনুভব করে। তাই এইসব রূহানী বিধান। এইসব ঐ জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এইগুলি অনুভূত হওয়াও অপরিহার্য নহে। এমনকি সাধারণভাবে ইহাদের অনুভবও অসম্ভব।

তবে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে দুনিয়াতে নিদ্রিত ব্যক্তির মধ্যে এইসব ঘটনার নমুনা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেননা নিদ্রিত ব্যক্তি যে দুঃখ-সুখ অনুভব করে তাহা তাহার রূহের উপর জারী হয়। এই ক্ষেত্রে দেহ রূহের অধীন থাকে। অনুরূপভাবে আলমে বরযখেও দেহ ও রূহের সুখ-দুঃখ একই পন্থায় জারী হয়। বরং স্বপ্ন অপেক্ষাও অধিক সুদৃঢ়ভাবে জারী হয়। কেননা তথায় রূহ দেহ হইতে অধিক পরিপূর্ণভাবে পৃথক হয় এবং অধিক প্রকাশিত হয়, যেন দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক সাধারণভাবে প্রকাশ হয় না। কিন্তু দেহ হইতে রূহ পৃথক হইলেও সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয় না। এখন অবশিষ্ট রহিল- তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ আখেরাত। যেহেতু কিয়ামতের দিনে মানুষ দেহসহ কবর হইতে উঠিবে। তখন ঐ দিনের সুখ-দুঃখ তাহার দেহ এবং রূহ উভয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে।

উপরে উল্লেখিত বিষয়টি থেকে তোমরা হয়ত অনুধাবন করিতে পারিয়াছ যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের আযাব, সুখ-দুঃখ, কবরের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা সম্পর্কে এবং জাহান্নামের গর্ত হওয়া আর বেহেশতের বাগিচা হওয়া সম্পর্কে যে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন- তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবেক সম্মত। বিবেক পরিপন্থী নয়। এতটুকু কথা বুঝিয়া লওয়া যদি কাহারও পক্ষে মুশকিল হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা তাহার ভুল বুঝার এবং জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হইয়াছে।

মানুষের কবরে আযাব ও সওয়াব পাওয়ার নমুনা

একটি বিস্ময়কর বিষয় হইল এই যে, দুইজন ব্যক্তি এক বিছানায় ঘুমাইয়া আছে। তন্মধ্যে একজনের রূহ আরাম আয়েশে ডুবিয়া আছে। সে জাগ্রত হওয়ার পর তাহার দেহে স্বপ্নের আরাম আয়েশের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। অপর

ব্যক্তির রূহ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছে। জাগ্রত হওয়ার পর তাহার দেহেও এই দুঃখ-কষ্টের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অথচ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে না। আলমে বরযখের আযাব ও সওয়াবের বিষয়টিও এইভাবে বুঝিয়া লও।

দলীল প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী বিধান মোতাবেক রূহের সাথে দেহের সম্পর্ক চিরস্থায়ী। কোন সময় রূহ থেকে দেহ পৃথক হয় না।

সারকথা; মৃত্যুর পর এই নশ্বর দেহ রূহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। কিন্তু আলমে বরযখে রূহ স্বীয় আমলের স্বাদ উপভোগ করার জন্য একটি অস্থায়ী দেহের অধিকারী হয়। যেন আলমে বরযখের জন্য এই দেহটি কর্জ হিসাবে পাইয়াছে। এই দেহ পার্থিব জগতের দেহ; এক শ্রেণীর নহে। বরং ইহা স্বীয় আমল অনুযায়ী নূরের অথবা সূক্ষ্ম অন্ধকারের দেহ হয়।

সারকথা; মানুষের আমলের দুই অবস্থা অনুযায়ী আলমে বরযখে তাহার দেহ প্রস্তুত হয়। যদিও এই রহস্য অতিশয় সূক্ষ্ম কিন্তু ইহা বিবেক পরিপন্থী নয়। একজন পরিপূর্ণ ইনসান স্বীয় দেহের পরিবর্তে এই জীবনে এক নূরাণী অস্তিত্ব লাভ করে। দৃশ্যজগতে (অর্থাৎ অন্তর্চক্ষু দ্বারা দৃশ্য) ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি দৃশ্যজগত সম্পর্কে অবগত আছেন- তাহার দৃষ্টিতে আমলের দ্বারা প্রস্তুত দেহ কোন বিস্ময়কর ও অসম্ভব জিনিস নহে।

সারকথা; আমলের অবস্থা অনুযায়ী যে দেহ প্রস্তুত হয় তাহা আলমে বরযখে পাপ-পূণ্যের প্রতিদানের স্থানে পরিণত হয়। অর্থাৎ পাপ-পূণ্যের প্রতিদান ইহার উপর পতিত হয়। অন্তর্চক্ষুবিশিষ্ট লোকদের সজাগ থাকা অবস্থায় মৃতব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাহারা ফাসেক ও গোমরাহ লোকদের দেহ কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পায়। যেন এইগুলি ধূঁয়া দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সারকথা; মৃত্যুর পর প্রত্যেকে নব দেহ লাভ করে। তাহা কোন ক্ষেত্রে নুরাণী হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অন্ধকার হয়। কিন্তু আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়সমূহ মানবের বিবেক দ্বারা অনুধাবন করা হইতে আল্লাহ পাক গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা আল্লাহ পাকের বিশেষ হেকমতের পরিচায়ক। কেননা আখেরাতের বিষয়সমূহ গোপনীয় থাকার ফলে মুমিন ব্যক্তি অদৃশ্য বিষয়ের

উপর ঈমান রাখার সুযোগ পাইয়াছে। ফলে আখেরাত অস্বীকারকারী এবং ঈমানদারদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায়।

ফিরিশতারা যখন মৃত্যুর ঘাটে উপস্থিত ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয় এবং তাহার কাছে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে থাকে– তখন সে ব্যক্তি ফিরিশতাদের দেখিতে পায়। তাহাদের সাথে কথাবার্তা বলে। তাহাদের কাছে মৃতপ্রায় ব্যক্তির জন্য কাফন এবং বেহেশতের সুগন্ধি অথবা জাহান্নামের দুর্গন্ধ মওজুত থাকে। তাহারা উপস্থিত ব্যক্তিদের সালাম করে। তাহাদের দোয়াতে আমীন বলে। অনেক সময় মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে সালাম করে। আর সে কখনও শব্দের মাধ্যমে, কখনও ইঙ্গিতাকারে, আবার কখনও কখনও অন্তরে অন্তরে সালামের জবাব দিয়া থাকে। কখনও কখনও মৃতপ্রায় ব্যক্তি "খোশ আমদেদ" বলিয়া থাকে। অথচ মৃতপ্রায় ব্যক্তি ব্যতীত উপস্থিত লোকজনের কেহই ফিরিশতা দেখিতে পায় না। এই সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে।

আখেরাতে সংঘটিত বিষয়সমূহের মধ্যে ইহা প্রথম বিষয়। ইহা আমাদের সামনে দুনিয়াতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা ইহা দেখিতে পাই না। অথচ ইহা এই দুনিয়াতেই আমাদের চোখের সামনে হইয়া থাকে। অতঃপর ফিরিশতা হাত বাড়াইয়া রূহ কব্জ করিয়া লয় এবং রূহের সাথে কথাবার্তা বলিতে থাকে। উপস্থিত লোকজন ফিরিশতাকেও দেখে না এবং তাহাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার আওয়াজও শুনিতে পায় না। অতঃপর রূহ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই সময় ইহা সূর্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং মেশকের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। উপস্থিত লোকেরা এইসবের কিছুই দেখিতে পায় না এবং সুগন্ধও পায় না। অতঃপর ফিরিশতা রূহ লইয়া ফিরিশতাদের জমাতের সাথে মিলিত হয়। উপস্থিত লোকেরা তাহা দেখিতে পায় না। অতঃপর রূহ এক বিশেষ পদ্ধতিতে উপস্থিত হইয়া মৃতব্যক্তির লাশের গোসল দেখে এবং লাশ উঠাইবার সময় যাহা কিছু হয়– সবকিছু অবলোকন করে। আর বলিতে থাকে– "আমাকে আগে লইয়া চল, আমাকে আগে লইয়া চল।" অথবা বলে "আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" অথচ মানুষ এইসব কথার একটিও শুনিতে পায় না।

কবরে মৃতব্যক্তির কাছে ফিরিশতা উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা

অনুরূপভাবে যখন মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় আর কবরের উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়– এই মাটি মৃতব্যক্তির কাছে ফিরিশতার পৌছার পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না। এমনকি যদি পাথর খুদিয়া খুদিত পাথরের ভিতর মৃতব্যক্তির লাশ রাখিয়া চুনাসিমেন্ট দ্বারা খুদিত পাথরের গর্তের মুখ বন্ধও করিয়া দেওয়া হয়, তবুও এই ব্যবস্থা ফিরিশতাকে মৃতব্যক্তি পর্যন্ত পৌছার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কেননা ঘনবস্তু এবং সূক্ষ্ম বস্তু কোনটাই ফিরিশতার গমনাগমনের জন্য ফাঁক করিয়া দিতে বাধা হয় না। এমনকি ঘনবস্তুর ভিতর দিয়া তো জ্বীনও চলা ফিরা করিতে পারে। ফিরিশতাদের জন্য মাটি এবং পাথরের উদাহরণ উড়ন্ত পাখীর জন্য শূন্যস্থান। শূন্যস্থানে যেমন পাখী উড়িতে বাধা প্রাপ্ত হয় না– মাটি এবং পাথরের ভিতর দিয়া ফিরিশতা চলিতে বাধা প্রাপ্ত হয় না; বরং অনায়াসে চলিতে পারে। কবর সংকুচিত হওয়া অথবা প্রশস্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে রূহের জন্য হইয়া থাকে; মৃতব্যক্তির দেহের জন্য নয়। অবশ্য আলমে বরযখে দেহ রূহের অধীন। এই হিসাবে ইহার সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা দেহের জন্য বিবেচিত হইতে পারে। অন্যথায় মানব দেহ তো সামান্য জায়গাতেই সংকুলান হইতে পারে।

কবর মৃতব্যক্তিকে চাপিয়া ধরা

মৃতব্যক্তির কবর সংকীর্ণ হওয়া সত্য। কবরের চাপে মৃতব্যক্তির পাঁজরের এক দিকের হাড় অপর দিকের হাড়ের ভিতর ঢুকিয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। বিবেক ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। তবে এতটুকু কথা যে, যদি কেহ কবর খুঁদিয়া দেখে তাহা হইলে সে মৃতব্যক্তির পাঁজরের হাড়গুলি বহালই দেখিতে পাইবে। এক দিকের হাড় অপর দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে, এমন দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। তিনি স্বীয় কুদরতের দ্বারা এইগুলি রূহানীভাবে সংঘটিত করান। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা এইসব অবস্থা অনুভব করা যায় না।

কবরের ফিরিশতা, জাহান্নামের অগ্নি ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ দেখা না যাওয়ার কারণ

কবরের অগ্নি এবং তরুলতা দুনিয়ার অগ্নি এবং দুনিয়ার শস্য তরুলতার ন্যায় নহে, যাহাতে কবরের অগ্নি ও তরুলতা দেখিয়া দুনিয়ার অগ্নি ও তরুলতা স্মরণ হইতে পারে। জগতবাসী কবরের অগ্নি ও তরুলতার কথা অনুধাবন করিতে সক্ষম নয়। ইহা মানুষের অনুভূতির বাহিরে রাখা হইয়াছে, যাহাতে গায়েবের প্রতি ঈমানের হেকমত অবশিষ্ট থাকে। যেহেতু কবরে সংঘটিত বিষয়াদি মানুষের অনুভূতির বাহিরে সেহেতু ইহা সম্ভব যে, দুইজন ব্যক্তিকে যদি পাশাপাশি কবর দেওয়া হয়। তাহাদের আমল পৃথক পৃথক হওয়ার ফল স্বরূপ– একজন জাহান্নামের গর্তে দগ্ধ হইতে থাকে। আর তাহার পার্শ্বে শায়িত ব্যক্তির গায়ে তাহার উপর প্রজ্জলিত অগ্নির তাপও লাগে না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি জান্নাতের বাগিচায় বিচরণ করে। অথচ তাহারই পার্শ্বে শায়িত জাহান্নামী ব্যক্তির গায়ে তাহার সীমাহীন সুখের স্পর্শও লাগে না। ইহা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের প্রকাশ। আল্লাহ পাক এই সবকিছু করিতে সম্পূর্ণরূপে শক্তির অধিকারী। কেননা আল্লাহ পাক মানুষকে এমন এমন বিস্ময়কর কার্য শিক্ষা দিয়াছেন যে, সে ময়দানে একটি জিনিস রাখিয়া কাহারও সামনে উহা দৃশ্যমান করিয়া তুলিতে পারে আবার কাহার চক্ষু বন্ধ করিয়া দিতে পারে, যাহাতে সে তাহা না দেখিতে পায়। যখন মানুষ এতটুকু করিতে পারে তখন এমন কিছু করা আল্লাহর জন্য কিভাবে কঠিন হইতে পারে? অথচ আল্লাহ পাক সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সর্বশক্তিমান।

যেহেতু চতুষ্পদ জন্তু এবং অন্যান্য প্রাণী গায়েবের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে আদিষ্ট নয়– সেহেতু তাহারা মৃতব্যক্তির আহবান, আবেদন প্রভৃতি শুনিতে পায় এবং অনুধাবন করিতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুনিয়ার বিভিন্ন অবস্থা ও দৃশ্যমান বিষয়ের সাথে আলমে বরযখের তুলনা করা নিছক মুর্খতা ও পথভ্রষ্টতা এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাককে এইসব কার্য সম্পাদনে অক্ষম ধারণা করা।

ইহা বড় ধরনের মুর্খতা, পথভ্রষ্টতা ও জুলুম। কেননা আল্লাহ পাক

সর্বশক্তিমান, যাহার জন্য যে বিষয় সহজ করিতে ইচ্ছা করেন– সহজ করিয়া দেন এবং অন্যান্যদের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখেন।

পক্ষান্তরে তিনি যখন কাহারও জন্য কোন বিষয় সংকীর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন– সংকীর্ণ করিয়া দেন। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা খুব প্রশস্ত, সুগন্ধিযুক্ত, বড়, নূরাণী এবং উজ্জ্বল হয়। মানুষ ইহা দেখিতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন জিনিস সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহা প্রশস্ত দেখাইতে পারেন।

নিমজ্জিত, অগ্নিদগ্ধ, শূলীতে ঝুলন্ত মৃতব্যক্তিদের কবরের আযাব ও সওয়াব লাভ কিভাবে হইতে পারে?

শূলীতে ঝুলন্ত ও পানিতে নিমজ্জিত প্রভৃতি মৃতব্যক্তিদের রূহ পুনরায় তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নহে। যদিও আমরা তাহা অনুধাবন করিতে অক্ষম। কেননা সে রূহ অন্য এক ধরনের। অচৈতন্য ব্যক্তি জীবিত হয়। তাহার রূহ তাহার সাথেই থাকে। যদিও বাহ্যিক ভাবে তাহাকে মৃত বলিয়া মনে হয় এবং আমরা তাহাদের জীবিত থাকাটি অনুধাবন করিতে অক্ষম। যে ব্যক্তির দেহ টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয় আর তাহার দেহের টুকরাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার দেহের বিক্ষিপ্ত টুকরাগুলি একত্রিত করিয়া ইহাতে রূহ প্রবিষ্ট করা এবং ইহার মধ্যে সুখ–দুঃখ, স্বাদ–বিস্বাদের অনুভূতি সৃষ্টি করা আল্লাহ পাকের জন্য কোন মুশকিল ব্যাপার নয়। যদিও সে টুকরাগুলি তাহার বিদগ্ধ দেহের ছাই আকারে পাওয়া যায়, অথবা মৎস্যের উদরে থাকে অথবা শূলীতে ঝুলন্ত থাকে সর্বাবস্থায় তিনি ইহার ভিতর রূহ দিতে সক্ষম।

আলমে বরযখের পর হাশর নামক আরও এক আলম কায়েম হওয়ার কারণ

মানুষের মৃত্যুর সময় আলমে বরযখেই তাহার সুখ শান্তি অথবা শাস্তি শুরু হয়। আলমে বরযখে যাহারা দোযখী বলিয়া সাব্যস্ত হয় তাহারা দোযখে প্রবেশ করে আর যাহারা বেহেশতী বলিয়া সাব্যস্ত হয়– তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করে।

অতঃপর আরও একটি মহাদিবসের আবির্ভাব হইবে। আর ইহার আবির্ভাব আল্লাহ পাকের হেকমতের চাহিদা। কেননা আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ পায়। অতঃপর তিনি সকলকে ধ্বংস করিবেন, যাহাতে তাহার পরাক্রমশালিতার পরিচয় হয়।

অতঃপর অন্য এক দিন তিনি সকলকে পরিপূর্ণ জীবন দান করিয়া এক ময়দানে সমবেত করিবেন, যাহাতে তাহার শক্তির পরিচয় হয়। অতঃপর ঐ দিবসেই বেহেশত ও দোযখে তাহাদের স্থান হইবে। সকলে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে।

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া হইতে ফিরিয়া যায়। ইহার মাধ্যমে তাহার প্রথম পুনঃজীবন লাভ হয়। আল্লাহ পাক মানুষের জন্য দুইটি পুনঃজীবন নির্ধারণ করিয়াছেন। যেমন বরযখের জীবন এবং হাশরের ময়দানের জীবন। উভয় জীবনে বনী আদমকে পুরস্কৃত করা হয় বা শাস্তি প্রদান করা হয়।

প্রথম পুনঃজীবনে দেহ হইতে রূহ পৃথক থাকিবে। অর্থাৎ রূহের সাথে দেহ থাকিবে না এবং তাহাকে বিনিময় প্রদানের প্রথম ঘরে অর্থাৎ বরযখে পাঠানো হইবে। দ্বিতীয় পুনঃজীবনে তাহার রূহের সাথে দেহ সংযুক্ত করা হইবে। তাহাকে কবর হইতে উঠাইয়া বেহেশত অথবা দোযখের দিকে পাঠানো হইবে। আল্লাহ পাক এই উভয় জীবনের কথা কুরআন পাকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর উভয়কে কিয়ামত বলা হইয়াছে। একটি বড় কিয়ামত আর অপরটি ছোট কিয়ামত। সুরায়ে মুমিন ও অন্যান্য সুরাতে ইহার বর্ণনা আসিয়াছে–

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا وَّ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا اٰلَ فِرْعَوْنَ
اَشَدَّ الْعَذَابِ *

"সকাল–সন্ধ্যা তাহাদিগকে জাহান্নামের উপর পেশ করা হইবে এবং কিয়ামত কায়েম হওয়ার দিন আহলে ফিরাউনকে ভীষণ আযাবে প্রবিষ্ট করা হইবে।"

কবরের প্রশ্ন ও জওয়াব সীমাবদ্ধ না সীমাহীন?

প্রশ্নঃ যদি কবরের প্রশ্ন যেমন "তোমার প্রভু কে?"– প্রভৃতি যদি নির্ধারিত হয়– তাহা হইলে ইহার জওয়াব খুব ভাল করিয়া মুখস্থ করিয়া লইলেই তো পাশ করা যাইবে। অথবা কবরের প্রশ্ন কি অনির্ধারিত ও অসীম?

জওয়াবঃ "তোমার প্রভু কে" ইহার জওয়াব মুখস্থ করিয়া লইলেই জওয়াব দেওয়া যাইবে না। বরং ইহার জওয়াব হইবে ঈমানী অবস্থার মাধ্যমে কবরের পরীক্ষা দুনিয়ার পরীক্ষার ন্যায় নহে। দুনিয়ার পরীক্ষায় তো মানুষ ধোঁকাবাজি ও চালাকি প্রভৃতির মাধ্যমে; পাশ করিয়া যাইতে পারে। কবরের পরীক্ষাতে তাহা সম্ভব হইবে না; বরং যাহার অন্তর যে রঙ্গে রঞ্জিত আছে কবরে উহারই প্রকাশ হইবে। অন্তরের অবস্থা মোতাবেক কবরে সুখ–শান্তি বা শাস্তির ব্যবস্থা হইবে।

কবরে ফিরিশতাদের প্রশ্ন কোন্ ভাষায় হইবে?

আরবী, ফারসী, ইংরেজী, উর্দূ, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আল্লাহ পাক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফিরিশতা কি এইসব ভাষার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকিতে পারে? বরং তাহারা সব ভাষায়ই কথা বলিতে পারে।

কবরের সাথে রূহের সম্পর্ক হওয়া অসম্ভমনে করার মতামত ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করা

কবরের সাথেও রূহের সম্পর্ক হইয়া থাকে। বিবেকের দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব নয়। যেহেতু বিবেক ইহা অনুধাবন করিতে পারে না তাই আল্লাহ পাকের কুদরতী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা ইহার উদাহরণ দেখিতে পাই। তাহা হইল; বস্তুসমূহের হাকিকত বা মূল তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক বিভিন্ন পন্থা রাখিয়াছেন। যেমন আমরা দেখি যে, কতক বস্তুর হাকিকত শুধু মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই জানা যায়। কতক বস্তু এমন রহিয়াছে যাহার হাকিকত চোখে দেখার দ্বারা বুঝা যায়। আর কতক বস্তুর হাকিকত শুধু কর্ণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। কতক জিনিস এমন রহিয়াছে যাহার হাকিকত শক্তির কেন্দ্র অর্থাৎ অন্তরের দ্বারা অনুধাবন করা যায়।

মোটকথা বস্তুর হাকিকত সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক বিভিন্ন পন্থা ও মাধ্যম রাখিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ; মিশ্রীর একটি টুকরা যদি কানের মধ্যে রাখা হয় তাহা হইলে সে উহার মজা ও স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং ইহার রং কি তাহাও বলিতে সক্ষম হইবে না। এমনকি যদি ইহা চোখের সামনে রাখা হয় তবুও ইহার স্বাদ সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারিবে না। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, বস্তুসমূহের হাকিকত অবগত হওয়ার জন্য বিভিন্ন শক্তি ও মাধ্যম রহিয়াছে।

যদি কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিতে চাও; আর তাহা চোখের সামনে রাখিয়া দাও। তখন ইহার স্বাদ অনুভব করিতে পার নাই বলিয়া কি বলা যাইবে যে, ইহার স্বাদই নাই। অথবা যদি কোন জিনিসের আওয়াজ হইতে থাকে আর তুমি কান বন্ধ করিয়া জিহবা দ্বারা আওয়াজ শুনিতে চাও তাহা হইলে ইহা কখনও সম্ভব হইবে না। বর্তমানে আধুনিক দর্শন স্বভাবী লোকেরা এই ব্যাপারে শক্ত ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অনেক বাস্তবকেও অস্বীকার করিয়া বসে।

দৈনন্দিন কাজকর্মের দিকে চাহিয়া দেখ; এইসব কার্য একজন সম্পাদন করে না; বরং বিভিন্ন কার্য ও খেদমত বিভিন্ন জনের দায়িত্বে রহিয়াছে। ভিস্তির দায়িত্ব পানি আনয়ন করা। ধোপার দায়িত্ব কাপড় ধৌত করা– প্রভৃতি।

মোটকথা; মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন পরিশ্রম বিভিন্ন জনের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছে। সুতরাং একটি মৌলিক বিধান সর্বদা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, বিভিন্ন শক্তির কাজ ভিন্ন ভিন্ন। আর মানুষ বিভিন্ন শক্তি লইয়া দুনিয়াতে আগমন করিয়াছে। আর মানবজীবনের বিভিন্ন খেদমত পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন শক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত।

স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী আধুনিক দার্শনিকরা প্রত্যেক বিষয় স্বীয় বিবেকের আলোকে যাচাই করিতে চায়। তাহাদের এই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ রূপে ভুল। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ইতিহাসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা ব্যতীত বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মের প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কিভাবে অর্জিত হইতে পারে? বিবেক দ্বারা অনুধাবনযোগ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিবেক ফয়সালা দিতে পারে।

সুতরাং মানুষ যখন একই জিনিসকে বিভিন্ন বিষয়ের পরিপূর্ণতার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে তখন সে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধোঁকায় পতিত হইয়া বস্তুসমূহের হাকিকত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে বঞ্চিত থাকে।

অতএব দেহ হইতে রূহ অপসারিত হওয়া এবং দেহের সাথে রূহ সম্পর্কিত হওয়ার মীমাংসা বিবেক করিতে পারে না। যদি করিতে পারিত তাহা হইলে দার্শনিক ও অন্যান্য পণ্ডিতরা পথভ্রষ্ট হইত না। অনুরূপভাবে সত্য হওয়ার পরও দুনিয়ার চক্ষু ইহা অনুধাবন করিতে অক্ষম। বরং ইহার জন্য আধ্যাত্মিক চক্ষুর প্রয়োজন। যদি নিছক বিবেক ইহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করে– তাহা হইলে তাহাকে বলা হইবে যে, তুমি রূহ সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিবেক পরিচালনা কর যে, রূহের অস্তিত্ব আছে কি নাই। তখন এই ক্ষেত্রে হাজার হাজার মতপার্থক্য দেখিতে পাইবে। এমনকি এই যুগে হাজার হাজার দার্শনিক এমনও রহিয়াছে যাহারা ইহা অস্বীকার করে।

এখন প্রশ্ন হইল, যদি নিছক বিবেকই ইহার মীমাংসা করিতে পারিত তাহা হইলে এই সম্পর্কে এত মতপার্থক্যের কারণ কি? উদাহরণ স্বরূপ, চক্ষুর কার্য হইল দেখা। তাহা হইলে কখনও মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না যে, যায়েদের চক্ষু একটি বস্তু দেখিয়াছে আর আমর সেখানে থাকিয়া তাহা দেখিতে পাইবে না। দেখিলে উভয়েই দেখিবে, অন্যথায় নয়। সুতরাং যদি নিছক বিবেকই সব কিছুর মীমাংসা করিতে পারে তাহা হইলে মতপার্থক্য হইবে কেন?

সুতরাং বিবেক যখন রূহের অস্তিত্ব সম্পর্কে অকাট্য কোন ফয়সালা দিতে অক্ষম। তখন সে রূহের বিভিন্ন অবস্থা ও ইহার সম্পর্ক সম্বন্ধে কি বলিতে পারিবে?

রূহের অস্তিত্ব ও ইহার সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা একমাত্র নবুয়তের উৎস হইতে পাওয়া গিয়াছে। নিছক বিবেক দ্বারা ইহার সত্যিকার ব্যাখ্যার দাবী কেহ করিতে পারে না। এই অভিমতের উপর আপত্তি উথাপন করিয়া যদি বল যে, আমরা তো দেখিয়াছি যে, কোন কোন দার্শনিক এই সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন। ইহার জবাবে জানিয়া রাখ যে, তাহারা কোন না কোন নবীর ইলম হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সামান্য কিছু লিখিতে পারিয়াছেন।

সুতরাং "কবরের সাথে রূহের সম্পর্ক হয়" এই বিষয়টির জ্ঞান শুধু অন্তর্দৃষ্টিবিশিষ্ট হইতেই অর্জিত হইতে পারে। কবরের কাছে গিয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরি" বলিয়া সালাম পেশ করিলে জবাব পাওয়া যায়। কবরের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার মত আধ্যাত্মিক শক্তি যাহাদের রহিয়াছে– তাহারা ইহার জবাব শুনিতে পান এবং কবরের এই সকল সম্পর্ক দেখিতে পান।

বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। যেমন এক স্থানে লবণের একটি জমাট টুকরা এবং মিশ্রীর একটি টুকরা রাখিয়া দিলে নিছক বিবেক ইহাদের সম্পর্কে কি ফয়সালা দিবে? অর্থাৎ বিবেক উভয়কে একই জিনিস মনে করিবে। তবে যদি জিহবাতে লাগাইয়া স্বাদ গ্রহণ করে তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে সক্ষম হইবে যে, মিশ্রী ও লবণ কখনও এক নয়; বরং পৃথক পৃথক দুইটি বস্তু। কিন্তু যদি কাহারও জিহবাতে অনুভূতিশক্তিই না থাকে– তাহা হইলে সে মিষ্টি ও লবণাক্ততার মধ্যে কি ভাবে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইবে? সূর্য উদিত হইয়া সমস্ত দুনিয়া আলোকিত করার পরও যদি কোন অন্ধ তাহা অস্বীকার করে– তাহা হইলে কিই বা আসে যায়। এক বিবেকহীন ব্যক্তির গবেষণার ফলে কোন ফায়দা অর্জিত হয় না বলিয়া গবেষণা করা বাতিল হইতে পারে না। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি না থাকে– তাহা হইলে সে কবরের সাথে রূহের সম্পর্ক কি ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে? সে দেখে না বলিয়া তাহার অস্বীকার কখনও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কেননা নিছক বিবেক ও বুদ্ধি এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে কখনও অবগত হইতে পারে না। আল্লাহ পাক মানুষকে অনেক ধরনের শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যদি মাত্র একটি শক্তির মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান হইত– তাহা হইলে মানুষকে বিভিন্ন প্রকারের এতগুলি শক্তি প্রদানের কি প্রয়োজন ছিল? যেমন মানুষকে প্রদত্ত কোন প্রকার শক্তির সম্পর্ক চক্ষুর সাথে আবার এক প্রকার শক্তির সম্পর্ক হইল কর্ণের সাথে অনুরূপভাবে জিহবার সাথে ও নাকের সাথে রহিয়াছে। পৃথক পৃথক শক্তির সম্পর্ক একইভাবে মানুষের অনুভূতি ক্ষমতাও এক প্রকারের নয় বরং তাহা বিভিন্ন প্রকারের সুতরাং কবরের সাথে রূহের সম্পর্ক অনুভব করার জন্য প্রয়োজন রহিয়াছে আধ্যাত্মিক শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির। আধ্যাত্মিক শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিহীন কোন ব্যক্তি যদি

কবরের সাথে রূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলে যে ইহা বাস্তব নহে– তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সে ভুল বলিতেছে।

লক্ষাধিক আম্বিয়া, লক্ষ কোটি ওলী ও নেককার বান্দা দুনিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছেন। মুজাহিদা করনেওয়ালা অগণিত লোক দুনিয়াতে বসবাস করিয়াছেন। তাহারা সকলেই এই বিষয়টি জীবন্ত সাক্ষী।

সারকথা; কবরের সাথে রূহের সম্পর্কের অবস্থা ও পদ্ধতি গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য। আমরা ইহা সম্পর্কে অবগত হইতে পারি আর না পারি কিন্তু মূল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বাস্তব। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

মোটকথা; অন্তর্দৃষ্টিমূলক ও আধ্যাত্মিক দলীল এইসব বিষয়ের ফয়সালা করে। অথচ বিবেক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। যেমন কর্ণ যদি কোন বস্তু দেখিতে না পারে তাহা হইলে ইহা কর্ণের দুর্বলতা নয়। কেননা দেখা অন্য অঙ্গের কাজ। কর্ণের কাজ নয়।

ফলকথা; কবরের সাথে রূহের সম্পর্ক অবশ্যই হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে রূহের সম্পর্ক আসমানের সাথেও হয়। সেখানে তাহার জন্য একটি স্থানও নির্ধারিত থাকে। ইহা একটি সর্বসম্মত অভিমত। হিন্দুদের গ্রন্থেও ইহার সাক্ষ্য রহিয়াছে। পথভ্রষ্ট এক ফেরকার অভিমত হইল যে, রূহ অবশিষ্ট থাকে না। এই পথভ্রষ্ট ফেরকা ব্যতীত অন্য সকলেই উপরোল্লেখিত অভিমত সম্পর্কে একমত।

অনুরূপভাবে মৃত্যুর পর দেহের বিভিন্ন অংশের সাথে নিঃসন্দেহে রূহের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। নেককারদের রূহ ইল্লীইনে (অর্থাৎ বেহেশতের উচ্চ শ্রেণীতের) থাকে। আর বদকারদের রূহ সিজজীনে (অর্থাৎ জাহান্নামের নিম্নশ্রেণীতে) থাকে। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের সম্পর্ক স্ব স্ব দেহের প্রতিটি অণুর সাথে থাকে। দেহ কবরে দাফন করা হউক বা পুড়াইয়া দেওয়া হউক বা পানিতে নিমজ্জিত হউক।

মোটকথা; দেহ যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন ইহার প্রত্যেকটি অণু পরমাণুর সাথে রূহের সম্পর্ক অবশ্যই থাকে। যদিও এই সম্পর্ক সাধারণ বিবেকের আওতা বহির্ভূত। বিজলীর তার ইহার বাস্তব উদাহরণের জন্য যথেষ্ট।

বিজলীর তারের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, কোথা হইতে কোথায় পর্যন্ত ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে? রূহের সম্পর্কও অনুরূপ। ইল্লীইন ও সিজ্জীনে ইহার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দেহের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে এই সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু জাগতিক দেহের চক্ষু ইহা অনুভব করিতে পারে না। কেননা আলেমুল গায়েবের (আল্লাহ পাকের) রহস্য দুনিয়াদারের চক্ষু কিভাবে দেখিতে পারে এবং দেখিতে না পারাই সঙ্গত। কেননা যদি দুনিয়াদারের চক্ষু ইহা দেখিতে পারে তাহা হইলে গায়েবের প্রতি ঈমান পাওয়া যাইবে না আর আম্বিয়াগণের শিক্ষাও গায়েবের প্রতি ঈমান রাখার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অনুভূত না হওয়ার কারণে এই সত্য বিষয়টি অস্বীকার করা পরিষ্কারভাবে বিবেকের বদ হজমীর (অযোগ্যতার) পরিচায়ক। কবর সংকীর্ণ হওয়া বা কবর প্রশস্ত হওয়া উভয় বিষয়টিই অদৃশ্য জগতের রহস্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর জাগতিক চক্ষু ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না এবং বিবেক ইহা অনুধাবন করিতে পারে না। তবে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোক ও আল্লাহর ওলিগণ স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে এইসব কিছু দেখিয়া থাকেন। তাহারা অনেক সময় কাশফের মাধ্যমে কবরের মৃত ব্যক্তিদের শাস্তি ও সুখশান্তির অবস্থা দেখিতে পান।

পুলসিরাতের হাকিকত

পরকালে প্রত্যেক নেককার ও বদকারকে আল্লাহ পাকের সম্মুখে আনিয়া দেখানো হইবে যে, সে দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার রাস্তা অবলম্বন করিয়াছিল না ধ্বংস ও জাহান্নামের রাস্তা অবলম্বন করিয়াছিল? শান্তি ও নিরাপত্তার রাস্তা হইল সিরাতে মুস্তাকীম বা সোজা সরল রাস্তা। কিন্তু এই রাস্তা খুব সুক্ষ্ম। এই রাস্তা হইতে সামান্য এইদিক সেইদিক হওয়া প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামে পতিত হওয়া। কিয়ামতের দিবসে এই রাস্তা পুলসিরাতের আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হইবে। আর যাহারা দুনিয়াতে সীরাতে মুস্তাকীমে চলিতে পারে নাই– তাহারা কিয়ামতের দিনে পুলসিরাত নামক রাস্তা দিয়াও চলিতে পারিবে না। কেননা কিয়ামতের দিবসের পুলসিরাত প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার রূহানী রাস্তারই একটি নমুনা। যেমন এখনও আমরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাই যে, আমাদের চলার রাস্তার ডান বা বাম পার্শ্বে প্রকৃতপক্ষে রহিয়াছে জাহান্নাম। যদি আমরা রাস্তা

ছাড়িয়া ডান দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি তবুও রহিয়াছে জাহান্নাম। আর যদি বাম দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি তবুও রহিয়াছে জাহান্নাম। আর যদি রাস্তার উপর দিয়া সোজা চলি তাহা হইলে রহিয়াছে জাহান্নাম হইতে বাঁচার উপায়। আর ইহাই আখেরাতে পুলসিরাতের আকৃতিতে প্রকাশ পাইবে। তখন আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করিতে পারিব যে, পুলসিরাত প্রকৃতপক্ষে পুলের আকৃতিতে দোযখের উপর রাখা হইয়াছে। আর ইহার ডানে বামেও রহিয়াছে দোযখ। তখন আমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইবে– ইহার উপর দিয়া চলিবার জন্য।

সুতরাং যদি দুনিয়াতে আমরা সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলি। ইহার ডানে বামে না চলি– তাহা হইলে কিয়ামতের দিনে পুলসিরাতের উপর দিয়া চলিতে কোন ভয় হইবে না। জাহান্নামের তাপও আমাদের গায়ে লাগিবে না। এমনকি অন্তরেও কোন রকম অস্থিরতা ও ভয় পয়দা হইবে না। বরং ঈমানের আলোর শক্তিতে উজ্জ্বল হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় ইহা পার হইয়া যাইব। কেননা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে ইহার উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

হযরত ইবনে আরবীর ভাষায় পুলসিরাতের দর্শনঃ

পরকালের সিরাত (রাস্তা)–এর বিশেষণ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহা চুল অপেক্ষা সরু এবং তলোয়ার অপেক্ষা অধিক ধার হইবে। জাগতিক জীবনে ইলমে শরীয়তেরও একই অবস্থা। মাসআলার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয় ও মকবুল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা নির্ধারণ করা মুশকিল। অনুরূপভাবে মুজতাহিদগণের ইজতিহাদ প্রসূত কোন মাসআলা সঠিক তাহা নির্ধারণ করাও মুশকিল। সুতরাং জাগতিক জীবনের শরয়ী মাসআলাসমূহও তলোয়ার অপেক্ষা অধিক ধার আর চুল অপেক্ষা অধিক সরু হওয়ার পর্যায়ে। আর এখানে শরীয়তই সীরাতে মুস্তাকীম বা সরল–সোজা পথ। এই জন্যই বান্দা নামাযের প্রত্যেক রাকাতে বলে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ *

" হে আল্লাহ! আমাদিগকে সরল–সোজা পথ প্রদর্শন করুন।"

সুতরাং ইহা তলোয়ার অপেক্ষা অধিক ধার আর চুল অপেক্ষা অধিক সরু রাস্তা। ইহার এই অবস্থার প্রকাশ দুনিয়ার তুলনায় পরকালে অধিক অনুভূত

হইবে। কিন্তু যাহারা বুঝিয়া শুনিয়া আল্লাহর দিকে অন্যান্যদিগকে আহবান করিয়াছে, তাহাদের জন্য ইহার প্রকাশ ভিন্নরূপে হইবে। যেমন রাসূলগণ এবং তাহাদের অনুসারীগণ। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে নবীগণের মর্যাদার সাথে মিলাইয়া দিবেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিনে পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের নূরের অনুপাতে তাহাদের সামনে উহা প্রকাশ পাইবে।" সুতরাং একদল লোকের জন্য ইহা খুব সরু হইয়া প্রকাশ পাইবে এবং অন্য দলের জন্য ইহা খুব প্রশস্ত হইয়া প্রকাশ পাইবে। কুরআনে পাকেও হাদীছের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে–

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ *

"মুমিনদের নূর তাহাদের সামনে ও ডানদিকে দৌড়াইতে থাকিবে।" সেখানে পুলসিরাত ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা থাকিবে না। আল্লাহ পাকের উল্লিখিত বাণীতে আসিয়াছে যে, তাহাদের নূর ডান পার্শ্ব দিয়া দৌড়াইতে থাকিবে। ইহা এই জন্য যে, পরকালে মুমিনদের জন্য বাম পার্শ্ব থাকিবে না। যেমন দোযখীদের জন্য ডান পার্শ্ব থাকিবে না। ইহা তো পরকালীন রাস্তার কিছু অবস্থা। তথায় বনী আদমের আমল চিমটা, আংটা ও কাঁটার প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করিবে। আর এইসব জিনিস বনী আদমকে পুলসিরাতের উপর আটকাইয়া রাখিবে। সুতরাং তাহাদের জন্য কেহ সুপারিশ করা এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পৌঁছা পর্যন্ত তাহারা তথায় আটকাইয়া থাকিবে। বেহেশতেও যাইতে পারিবে না এবং দোযখেও যাইতে পারিবে না। যাহারা দুনিয়াতে অন্যের অন্যায় ক্ষমা চোখে দেখিয়াছে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন। যাহারা দুনিয়াতে অভাবীর প্রতি সদয় হইয়াছে আল্লাহ পাক এখানে তাহাদের প্রতি সদয় হইবেন। যাহারা দুনিয়াতে মাফ করিয়াছে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে মাফ করিবেন। দুনিয়াতে যাহারা দ্বন্দ্ব করিয়া স্বীয় হক আদায় করিবে আল্লাহ পাক সেখানে দ্বন্দ্ব করিয়া স্বীয় হক আদায় করিবেন। যাহারা দুনিয়াতে অন্যান্যদেরকে কষ্ট প্রদান করে আল্লাহ পাক এখানে তাহাদের কষ্ট প্রদান করিবেন। এই সবকিছু তোমাদের আমল। সুতরাং উত্তম চরিত্র অবলম্বন কর। কেননা আজ তোমরা অন্যান্যদের প্রতি যেমন আচরণ করিবে আল্লাহ পাকও তোমাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করিবেন।

হযরত ইমাম গাযযালীর কলমে সিরাতে মুস্তাকীমের হাকিকতঃ

ইমাম মুহাম্মদ গাযযালী (রহঃ) বলেন, মানুষ যতটুকু সম্ভব ফিরিশতাদের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখিবে– ইহাই মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণতা। তন্মধ্যে একটি হইল– পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি বিশেষণের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

পরস্পর বিপরীতমুখী গুণাবলীর প্রকাশ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু মানুষ এইসব গুণাবলী হইতে পৃথকও হইতে পারে না। এই জন্য মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে যেন এমন পন্থা অবলম্বন করে যাহা এইসব গুণাবলী হইতে পৃথক থাকার সদৃশ হয়। যেন প্রকৃত পক্ষে পৃথক না হওয়া হয়। অর্থাৎ এইসব গুণাবলীর ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। যেমন মিশ্রিত পানি– গরমও হয় না আবার শীতলও হয় না। লাকড়ীর রং– শুভ্রও হয় না আবার কৃষ্ণও হয় না। যেমন কৃপণতা এবং অপব্যয় করা মানুষের মধ্যে দুইটি পরস্পর বিপরীত বিশেষণ। এই দুইটি বিশেষণের মধ্যপন্থা হইল– বদান্যতা। বদান্যতার মধ্যে কৃপণতাও নাই আবার অপব্যয়ও অনুপস্থিত।

সীরাতে মুস্তাকীম (সরল পথ) হইল ঐ প্রকৃত মধ্যপন্থা যাহা চুল অপেক্ষাও অধিক সরু। যেই ব্যক্তি এই দুইটি বিশেষণের প্রান্তসীমা হইতে চূড়ান্তভাবে দূরে অবস্থান করিবে সে অবশ্যই উভয় প্রান্ত সীমার মধ্যস্থলে অবস্থান করিবে। উদাহরণ স্বরূপ– লোহার একটি গোলাকৃতি চাকা খুব লাল করিয়া যমীনের উপর রাখা হইল। অতঃপর ইহার ঠিক মধ্যভাগে একটি পিপীলিকা ফেলা হইল। উক্ত পিপীলিকা চাকার উত্তাপে দূরে সরিয়া যাইতে থাকিবে। চারিদিকের বিচারে যে স্থানটি সবচাইতে দূরে হইবে ইহা সেখানে গিয়া অবস্থান করিবে। চারিদিক হইতে যেহেতু অগ্নির উত্তাপ আসিতেছে তাই চারিদিকের বিচারে সবচাইতে দূরের স্থান যাহা পাইবে– তাহা হইল; চাকার ঠিক মধ্যভাগ বা কেন্দ্রবিন্দু। কেননা এই কেন্দ্র বিন্দুই চারিদিকের তুলনায় সবচাইতে দূরবর্তী স্থান। কেন্দ্র বিন্দুটি এত সূক্ষ্ম যে ইহার সামান্যতম প্রশস্ততা নাই। সুতরাং সীরাতে মুস্তাকীম অনুরূপ। ইহা উভয় প্রান্ত সীমার ঠিক মধ্যভাবে অবস্থিত। ইহার সামান্যতম প্রশস্ততাও নাই। এইজন্য ইহা চুল অপেক্ষাও অধিক

সরু। অতঃপর আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনে সিরাতে মুস্তাকীমকে আকৃতি দান করিবেন।

যাহারা দুনিয়াতে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলিয়াছে অর্থাৎ পরস্পর বিপরীতমুখী বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং কোন পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই সে পরকালের রাস্তার (পুলসিরাতের) উপর দিয়া সোজা সোজা চলিয়া যাইবে।

হযরত মোল্লা জালালুদ্দীন দাওয়ানী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, ইসলামী শরীয়ত পুলসিরাতের আকৃতিতে দোযখের উপর প্রকাশ পাইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সোজা চলিয়াছে এবং বক্রতা অনুসরণ করে নাই সে তথায় পুলসিরাতের উপর দিয়া অনায়াসে চলিতে পারিবে। আর যে দুনিয়াতে বক্র রহিয়াছে, সোজা পথ অনুসরণ করে নাই– সেখানে চলাও তাহার জন্য সহজ হইবে না। বরং কঠিন হইয়া পড়িবে।

কিয়ামতের হাকিকত

কিয়ামতের হাকিকত সম্পর্কে এখানে যাহা কিছু লিখা হইবে– তাহা মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী (রহঃ)-এর লিখা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

তিনি লিখিয়াছেন– অনেক জিনিস এমন রহিয়াছে যাহা বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক বস্তু দ্বারা গঠিত। যেমন শস্যকনা। ইহাতে মানুষের জন্য খাদ্যকনা এবং জন্তুর জন্য ভুষি রহিয়াছে। এই প্রকারের জিনিস শেষ পর্যন্ত পৃথক পৃথক করিয়া স্ব স্ব স্থানে পৌছাইয়া দিতে হয়। পৃথককৃত প্রত্যেকটি অংশকে ইহাদের উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যেমন শস্যকনা থেকে ভুষি পৃথক করিয়া ইহা রাখিবার স্থানে একত্রিত করিয়া রাখা হয়। আর খাদ্যকনা পৃথক করিয়া গোলা, কলসী প্রভৃতি স্থানে জমা করিয়া রাখা হয়। অতঃপর প্রয়োজন মোতাবেক পশুকে ভুষি ভক্ষণ করানো হয়। আর প্রয়োজন মোতাবেক মানুষ খাদ্যকনা ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতঃপর মানুষ নিজের আহারের জন্য রক্ষিত খাদ্য কনাও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে। ইহা হইতে ভাল ভাল খাদ্য কনাগুলি বাছিয়া বাছিয়া নিজের জন্য রাখিয়া দেয়। আর অবশিষ্ট খাদ্যকনা

খাদেম, সেবক, চাকর-চাকরাণী এবং অন্যান্য জানোয়ারকে ভক্ষণ করায়। কিন্তু যদি খুব চিন্তার সাথে নিখিলবিশ্বের প্রতি লক্ষ্য করা হয়– তাহা হইলে ইহাকেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট অংশের মাধ্যমে গঠিত পাওয়া যাইবে। যেমন ইহার প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি শ্রেণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। যথা–

কোন কোন বস্তু এক কাজের আবার কোন কোন বস্তু অপর কাজের। কতগুলির বৈশিষ্ট্য এক রকম আবার অপর কতগুলির বৈশিষ্ট্য অন্যরকম। যমীনে এক প্রকার সৌন্দর্য্য আবার পানিতে অপর প্রকার উপকারিতা মুমিন এক কাজের জন্য আর কাফের অন্য কাজের জন্য। ওলামাদের কাজ এক ধরনের। ফকীরদের কাজ অন্য ধরনের। মেধাবী এবং স্থূলবুদ্ধির মধ্যে রহিয়াছে বিরাট পার্থক্য। দানশীল ও কৃপণের মধ্যে রহিয়াছে প্রভেদ। বীরপুরুষ ওকাপুরুষের মধ্যে রহিয়াছে অসমতা। পুরুষ ও নারীর মধ্যে আছে অনেক পার্থক্য।

মোটকথা; যে কোন জিনিসের প্রতি লক্ষ্য কর, প্রত্যেকের রং ও গন্ধ পৃথক পৃথক। কবি বলেনঃ

هر گلے را رنگ و بوے دیگراست

"প্রতিটি ফুলের রং ও গন্ধ পৃথক পৃথক।"

সুতরাং বিশ্বনিখিলের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা আসা চাই যে, একদিন ইহার সবকিছু ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া পৃথক পৃথক হইয়া পড়িবে। এমনকি নেককারদিগকে তাহাদের গন্তব্যস্থলে আর বদকারদেরকে তাহাদের জন্য নির্ধারিত জেলখানায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহারা স্ব স্ব স্থানে পৌঁছিয়া যাওয়ার নাম কিয়ামতের দিনের সওয়াব ও শাস্তি।

ইহাকে অন্য একটি উপমার সাহায্যেও বোঝা যাইতে পারে। যেমন বিশ্বনিখিলকে কোন মানুষ বা কোন জানোয়ারের দেহের সাথে তুলনা কর। তাহার দেহে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ পৃথক পৃথক কাজের জন্য নির্ধারিত। অনুরূপভাবে বিশ্বনিখিলের মধ্যে যমীন, আসমান, প্রভৃতি অংশ পৃথক পৃথক কাজের জন্য নির্ধারিত। যেমন প্রাণীর দেহ। ইহা অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা পানি

এই চার মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত। আর ইহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট ও ধর্ম পৃথক পৃথক। সুতরাং প্রাণী-দেহে ইহাদের প্রভাবও পৃথক পৃথক। যদি দেহের কোন মৌলিক উপাদানের আধিক্যতার কারণে ইহার স্বাভাবিক স্বভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহা হইলে ইহার নাম অসুস্থতা ও রোগ। আর যদি ইহার কারণে দেহ হইতে রূহ পৃথক হইয়া পড়ে তাহা হইলে ইহার নাম হয় মৃত্যু।

অনুরূপভাবে এই নশ্বর বিশ্বের নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের ও ভূমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদার পৃথক পৃথক প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং এই নশ্বর বিশ্বের কোন মৌলিক অংশের বা চাহিদার আধিক্যের কারণে যদি ইহার স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন দেখা দেয় এবং কোন নতুন অবস্থার প্রকাশ হয় তাহা হইলে ইহা হয় কিয়ামতের নিদর্শন।

এই সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ শুনুন; বাবুর্চি খাদ্য পাক করে, দর্জি কাপড় সেলাই করে। তাহাদের কার্য শেষ হওয়ার পর তাহাদিগকে মুজুরী দেওয়া হয় কারণ মুজুরী তাহাদের কার্যের বিনিময়ে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যদি তাহাদের কার্য মালিকের চাহিদা মোতাবেক হয় তাহা হইলে মালিক তাহাদিগকে মুজুরী প্রদান করে। অন্যথায় খাদ্যদ্রব্য এবং কাপড় নষ্ট করার কারণে তাহাদের থেকে জরিমানা চাহিয়া থাকে। যেহেতু এইসব কার্য অল্প সময়ে সম্পন্ন হয় তাই ইহাদের মুজুরী প্রদান করিতেও বিলম্ব হয় না। যদি কার্যটি এমন হয় যে, ইহা এক ব্যক্তি করিতে অক্ষম হয় এবং এক দিনে করা যায় না; বরং অনেক লোক একত্র হইয়া অনেক দিনে করিতে হয়। এই ধরনের কার্যে মুজুরী উশুল করিতেও বিলম্ব হয়। বিশেষ করিয়া কার্যটি যদি ঠিক হিসাবে দেওয়া হয়। কার্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মুজুরী প্রদান করা উচিত। এই ক্ষেত্রে বিলম্ব করা ঠিক নয়। কিন্তু কাহাকেও পুরুস্কার বা শাস্তি প্রদান করার বিষয়টি পৃথক। কাহারও দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করাইলে মালিকের দায়িত্বে মুজুরী প্রদান অপরিহার্য। কিন্তু কাহাকেও পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে তাহার দায়িত্বে ইহা অপরিহার্য নয়। আর এই ক্ষেত্রে বিলম্ব করিলেও সীমা লংঘন বা জুলুমের কোন সম্ভাবনা নাই।

অথচ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, অন্যের অধিকার পরিশোধ করাতে বিলম্ব করা খারাপ। পক্ষান্তরে অন্যের থেকে নিজের অধিকার আদায় করাতে বিলম্ব

করা উত্তম। অনুরূপভাবে স্বীয় অধিকার অনাদায়ের কারণে অন্যকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করাও খারাপ হইতে পারে না। অধিকন্তু পুরস্কার প্রদান এমন একটি বিষয় নয় যে, ইহা প্রদানে বিলম্ব করা খারাপ বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে বান্দার হক পরিশোধ করাতে বিলম্ব করা খারাপ।

বান্দার আমলের প্রতিদানের বিষয়টিও অনুরূপ। দুনিয়াতে এই প্রতিদানের যতটুকু উশুল হইতে পারে উহা পরিশোধ করার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হইতে অবশ্যই জলদি করা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও পরকালের বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের জন্য শুধু বিচারক ও নির্দেশদাতাই নহেন বরং পিতা-মাতা অপেক্ষাও অধিক মেহেরবান ও দয়ালু। তাই তিনি তাহাদের প্রতিদান জমা রাখিয়া দেন। প্রয়োজনের সময় প্রদান করার জন্য। কেননা এইগুলি বান্দার চরম পর্যায়ের প্রয়োজনের সময় প্রদান করাই তাহাদের প্রতি প্রকৃত মেহেরবানী ও মমতা প্রদর্শনী করা। কেননা প্রয়োজনের পূর্বে প্রদান করিলে প্রয়োজন আসার পূর্বেই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং প্রয়োজনের পূর্বে প্রদান না করিয়া পূর্ণ প্রয়োজনের সময় প্রদান করাই উত্তম। আর মানুষের প্রকৃত ও সর্বাধিক প্রয়োজন হইল; যখন দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। যখন তাহার মুক্তির জন্য কোন উসিলা ও মাধ্যম অবশিষ্ট না থাকিবে। উহাকে আমরা কিয়ামত বলি। তখন কোন উসিলা বা কোন মাধ্যম থাকিবে না। কোন মাল সম্পদও থাকিবে না। শুধু আল্লাহ পাকের রহমত এবং বাহ্যিকভাবে নিজেদের অধিকার অর্থাৎ নেক আমলের সওয়াব অবশিষ্ট থাকিবে।

এই সম্পর্কে আরও একটি উপমা শুনুন; দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের একটি নীতি রহিয়াছে যে, যদি তাহার রাজত্বের কোন শহর বা এলাকার লোক রাষ্ট্রদ্রোহী হইয়া পড়ে। অতঃপর তাহারা বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করিয়া আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে না। এমতাবস্থায় রাজা বাদশাহ তাহাদিগকে শক্ত শাস্তি প্রদান করে। প্রয়োজনে তাহাদিগকে হত্যা করে অথবা যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখে। শহর বা এলাকাকে পুড়িয়া মাটির সাথে মিশাইয়া দেয় এবং ইহার ইমারতসমূহ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া মিছমার করিয়া দেওয়া হয়। কারণ রাষ্ট্রদ্রোহিতা মারাত্মক অপরাধ। আর ইহার উপযুক্ত শাস্তি হইল যে,

তাহাদিগকে এমন শাস্তি প্রদান করা, যাহা অপেক্ষা বড় শাস্তি আর কোনটা হইতে পারে না। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে সকল মানুষ আল্লাহর প্রজা। আর আসমান জমীন তাহাদের থাকার জায়গা। কারণ এইগুলি তাহাদের জন্যই প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের অবস্থা এমন যে, সমস্ত দুনিয়াতে দিন দিন তাহাদের অহংকার দম্ভ ও ফাসাদ বাড়িয়া চলিয়াছে। যদিও সঠিক রাস্তায় কখনও আসে তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য। এক চেরাগ হইতে অন্য চেরাগে আলো নেওয়ার সময় চেরাগের আগুন যতক্ষণের জন্য ফুলিয়া উঠে ততক্ষণের ন্যায়।

এইজন্য দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলা যায় যে, এক দিন না একদিন তাহাদের অহংকার ও দম্ভ বিশ্ব ছাইয়া যাইবে। আর হইবেই না কেন? বিরোধিতার ভিত্তি তো প্রবৃত্তির অনুসরণ আর ইহা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। পক্ষান্তরে আনুগত্যের ভিত্তি হইলে প্রভৃত্তির বিরোধিতা করা। আর ইহা মানুষের সাময়িক বৈশিষ্ট্য।

এই কারণেই আনুগত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ ও পয়গম্বর প্রেরণ করা হইয়াছে। সওয়াব ও আযাবের কথা শুনানো হইয়াছে। অথচ মানবের অহংকার দম্ভ ও ফাসাদ বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের কিছুই করা হয় নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এমন এক সময় আসিবে যখন সমস্ত দুনিয়ার মানুষ খোদাদ্রোহী হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ পাকের পরাক্রমশালিতার চাহিদা হইবে এই দুনিয়াকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া চুরমার করিয়া দেওয়া আর সকল মানুষকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের কর্মানুযায়ী তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা বা পুরস্কার দেওয়া।

মোকাফাতে আমলের হাকীকত অর্থাৎ নেক কাজের বিনিময়ে সওয়াব আর বদ কাজের বিনিময়ে আযাব পাওয়ার কারণ

মানুষের জন্য দুইটি আকর্ষণকারী রহিয়াছে। এক আকর্ষণকারী মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় আকর্ষণকারী মন্দ, যাহা গোনাহের কার্যের দিকে আকর্ষণ করে। যেমন অনেক সময় মানুষের অবস্থা এমন দেখা যায় যে, তাহার অন্তরে বদ কার্যের ধারণা[illegible] বদ

কার্যের দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়ে যে যেন তাহাকে বদ কার্যের দিকে আকর্ষণ করা হইতেছে। অতঃপর যখন তাহার অন্তরে নেক কার্যের ধারণার সৃষ্টি হয় আর সে নেক কার্যের দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়ে যেন তাহাকে নেক কার্যের দিকে আকর্ষণ করা হইতেছে। অনেক সময় এক ব্যক্তি বদ কার্য করিয়া পরে নেক কার্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তখন সে এই ভাবিয়া বড়ই লজ্জিত হয় যে, আমি কেন এই কাজ করিলাম। কখনও এমন হয় যে, এক ব্যক্তি কাহাকেও গালি দিয়াছে। অতঃপর স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয় আর মনে মনে বলে যে, এই কাজটি আমি অনর্থক করিয়াছি। সুতরাং তাহার সাথে কোন কল্যাণকর ও মঙ্গলময় কার্য করা উচিত অথবা তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

দেখ; একজন মানুষের মধ্যে উল্লিখিত উভয় প্রকার শক্তি পাওয়া যায়। ইসলামী শরীয়ত নেক কার্যের শক্তিকে ফিরিশতা আর বদ কার্যের শক্তিকে শয়তান বলিয়া নাম রাখিয়াছে। সুতরাং যে মানুষের অন্তরে নেক কার্যের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে– উহার নাম ফিরিশতা রাখা হইয়াছে। আর যে মানুষের অন্তরে বদ কার্যের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকরে উহার নাম শয়তান এবং ইবলিস রাখা হইয়াছে।

উল্লিখিত উভয় শক্তি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই দুই অবস্থা তোমরা অস্বীকার করিতে পারিবে না। আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে পরস্পর বিপরীত এই দুইটি শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ স্বীয় নেক আমলের প্রতিদান পাওয়ার অধিকারী হইতে পারে। কেননা যদি মানুষ স্বভাবগতভাবে সর্বদা নেক কাজ করার জন্য বাধ্য হইত আর স্বভাব গতভাবেই বদ কাজ করা হইতে বিরত থাকিত– তাহা হইলে সে স্বীয় নেক কাজের সামান্যতম সওয়াবও পাইত না। কেননা নেককাজ করা তাহার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হইত। কিন্তু তাহার বর্তমান অবস্থায় তাহার স্বভাব দুইটি আকর্ষণকারী শক্তির মুখে রহিয়াছে। যদি সে নেক কার্যের প্রতি অনুগত হয়– তাহা হইলে সে স্বীয় আমলের সওয়াব লাভ করিবে। আর যদি গোনাহের কার্যের প্রতি আকর্ষণী শক্তির অনুগত হয়– তাহা হইলে তাহার আমলের গোনাহের বোঝা কাঁধে চাপে। মোটকথা; যে যে শক্তির অনুগত হয়– তদানুযায়ী বিনিময় লাভ করে।

২। মানুষের আমলী ও বিশ্বাসগত দিকের ত্রুটিই তাহার আযাবের মূল

কারণ। আর আল্লাহ পাকের ক্রোধের মাধ্যমে ইহাই অগ্নির আকৃতি লাভ করিয়া থাকে। যেমন পাথরে খুব শক্ত আঘাত লাগার ফলে অগ্নি বাহির হইয়া আসে। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের ক্রোধের আঘাতের ফলে মানুষের বদ আমল ও বদ বিশ্বাস হইতে অগ্নি শিখা বাহির হইয়া আশে আর এই অগ্নিই বদ আমলীও বদ বিশ্বাসী ব্যক্তিকে খাইয়া ফেলে। যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, বিদ্যুতের অগ্নির সাথে যখন স্বয়ং ইনসানের ভিতরের অগ্নি একত্রিত হয় তখন ইহা ইনসানকে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলে। অনুরূপভাবে বদ আমল ও বদ বিশ্বাসের অগ্নির দ্বারা আল্লাহ পাকের ক্রোধের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং যাহারা এই ধারায় জীবন যাপন করে যে, খোদার প্রকৃত পরিচয় না পাওয়ার কারণে তাহাদের বিশ্বাস দুরস্ত হয় না এবং তাহারা বদ আমল হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে না। বরং তাহারা এক মিথ্যা খেয়ালের বসে পড়িয়া বেপরোয়াভাবে গোনাহ করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের জানা নাই যে, প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মানুষের ভিতর জাহান্নামের অগ্নির লেলিহান শিখা এবং মুক্তির ঝরণা রহিয়াছে। জাহান্নামের অগ্নি শিখা মিটিয়া যাওয়ার পর মুক্তির ঝরণা জোশ মারিতে থাকে। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে ইসলামে প্রবেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হইতে পারে না এবং যিনি আসমানী ইলম লইয়া দুনিয়াতে আসিয়াছেন তাহার ইলম হইতে ফায়দা লাভ করিতে পারে না।

৩। মানুষের পরকালীন সওয়াব ও শাস্তি লাভ মানবের শ্রেণীগত আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের চাহিদা। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেমনঃ

গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যখন ঘাষ খাইতে থাকে আর হিংস্র প্রাণী যখন মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে তখন ইহাদের স্বভাব স্বাভাবিক থাকে। আর যখন গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ঘাষের পরিবর্তে মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিয়া যায় এবং হিংস্র প্রাণী মাংসের পরিবর্তে ঘাষ খাইতে লাগিয়া যায়– তখণ ইহাদের স্বাভাবিক স্বভাবে পরিবর্তন আসে। মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ। যখন মানুষ এমন আমল করে যে, তাহার অন্তরে নম্রতা, বিনয় ও ইবাদতের প্রভাব পড়ে তখন তাহার মধ্যে পবিত্রতা, উদারতা এবং ইনসাফের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ফলে

তাহার ফিরিশতাসুলভ ও রূহানী স্বভাব বহাল থাকে। আর যখন এমন আমল করে যে, তাহার অন্তরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের বিপরীত প্রভাব পড়ে তখন তাহার ফিরিশতাসুলভ স্বভাব পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। আর যখন সে এই ধরাধাম হইতে স্থানান্তরিত হয় তখন তাহার সাথে তাহার মধ্যে বিদ্যমান অবস্থা মোতাবেক আচরণ করা হয়।

বেহেশত ও দোযখের হাকীকতঃ প্রতিটি বস্তু মজা ও কষ্ট উভয়ের দ্বারা গঠিত। মজার সাথে আরামের সম্পর্ক আর কষ্টের সাথে পেরেশানীর সম্পর্ক। আরাম ও পেরেশানীর বিভক্তি নেকী বদীর বিভক্তির অন্তর্ভুক্ত। কেননা নেক কার্যে রহিয়াছে মজা আর বদ কার্যে রহিয়াছে কষ্ট ও পেরেশানী। আরাম ও পেরেশানী এক স্থানে একত্রিত হইতে পারে না।

সুতরাং ইহাদের মূল অর্থাৎ নেককার্য ও বদকার্যের জন্যও পৃথক পৃথক দুইটি স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাহাকে বেহেশত এবং দোযখ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অধিকন্তু সর্ব প্রকার জাগতিক মজা বেহেশতে অর্জিত হইবে। চাই সে মজা নারী থেকেই অর্জিত হইক না কেন? বরং বেহেশতের মজা দুনিয়ার মজা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক হইলেও বিস্মিত হওয়ার কথা নয়। অনুরূপভাবে দোযখের মধ্যেও জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার কষ্ট মওজুদ রহিয়াছে। জাগতিক জীবনে যতগুলি কষ্ট রহিয়াছে দোযখের কষ্টের সংখ্যা তদাপেক্ষা অধিক হওয়া কোন আশ্চার্য ব্যাপার নয়।

অধিকন্তু পরকালের মজা ও কষ্ট জাগতিক জীবনের মজা ও কষ্টের সম প্রকারের হইলেও পরকালীন মজা ও কষ্টের সাথে জাগতিক জীবনের মজা ও কষ্টের তুলনা হয় না। কেননা এখানের মজাও বিশুদ্ধ মজা নয় আবার এখানের কষ্টও বিশুদ্ধ কষ্ট নয়। এই বর্ণনার মাধ্যমে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, পরকালের মজা এবং কষ্ট সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। অতএব যে স্থানকে বেহেশত আর যে স্থানকে দোযখ বলা হয় তাহা মওজুদ হওয়া সম্পূর্ণ বাস্তব।

দোযখ ও বেহেশত কোথায়?

বেহেশত ও দোযখ থাকিলে কোন স্থানে আছে? এইরূপ প্রশ্নের প্রতি কর্ণপাত করিতেই হইবে– ইহা বিবেক সম্মত নয়। কেননা কোন জিনিসের

অস্তিত্ব থাকার দাবী করিলে ইহার অস্তিত্ব কোথায় আছে– তাহা জ্ঞাত হওয়া অপরিহার্য নয়। হাজার হাজার স্থান ও বস্তু রহিয়াছে যাহাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নাই। সুতরাং বেহেশত ও দোযখ যদি আসমানে বা দুনিয়াতে থাকে আর আসমান বা দুনিয়ার কোন্ স্থানে আছে– আমাদের তাহা জানা না থাকা অসম্ভব হইতে পারে কি? বরং আমাদের জ্ঞানের বাহিরেও থাকিতে পারে। যদি আসমান বা দুনিয়াতে না থাকিয়া ইহাদের বাহিরে থাকে– তাহা হইলেও বাধা কোথায়? উভয়টা সম্ভব। কিন্তু কুরআন হাদীছের আলোকে প্রমাণ হয় যে, বেহেশত দোযখ উভয়টা আসমান ও যমীনের বাহিরে রহিয়াছে।

বেহেশতের নিয়ামত কি দুনিয়াবী নিয়ামতের ন্যায় হইবে?

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, বেহেশতের নিয়ামত কি দুনিয়াবী নিয়ামতের ন্যায় হইবে? কুরআনে পাকে এই প্রশ্নের জবাব এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে–

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

"কোন ব্যক্তি জানে না যে, তাহার জন্য কি কি নিয়ামত গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।"

এইসব,নিয়ামত সম্পর্কে হাদীছে বর্ণনা আসিয়াছে যে–

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

"আমি নেক বান্দাদের জন্য পরকালে এমন নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখিতে পায় নাই। কোন কর্ণ ইহা সম্পর্কে শুনে নাই এবং কোন অন্তরেও ইহার ধারণা আসে নাই।"

দুনিয়াতে যত প্রকারের নিয়ামত রহিয়াছে– তাহা আমাদের অজানা নয়। দুধ,ডালিম, আঙ্গুর প্রভৃতি আমরা ভালভাবে চিনি এবং সর্বদা এইসব জিনিস খাইয়া থাকি। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রকৃত পক্ষে অন্য প্রকারের জিনিস। শুধু দুনিয়ার নিয়ামতের সাথে উহাদের নামের মিল রহিয়াছে। সুতরাং যাহারা মনে করে যে, বেহেশত হইল– দুনিয়ার নিয়ামতের সমষ্টি। তাহারা কুরআনের এক হরফও বুঝে নাই। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন– বেহেশত এবং ইহার নিয়ামতসমূহ এমন জিনিস যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কান যাহার সম্পর্কে শুনে নাই এবং কোন অন্তর যাহা অনুভব করিতে পারে নাই। অথচ দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ আমরা চোখে দেখি, ইহাদের সম্পর্কে কর্ণে শুনি এবং অন্তর দ্বারা অনুভব করি। সুতরাং আল্লাহ পাক এবং তদীয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতের নিয়ামতসমূহকে স্বতন্ত্র নিয়ামত বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন।

যদি আমরা মনে করি যে, বেহেশতের দুধও দুনিয়ার দুধের ন্যায় হইবে। দুনিয়ার দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের ন্যায় তথায় ও পালের পাল দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ রহিয়াছে। অনুরূপভাবে বৃক্ষের মধ্যে মৌমাছির চাক রহিয়াছে। ফিরিশতাগণ গাভী ও মহিশ হইতে দুধ দোহন করিয়া আর মৌচাক হইতে মধু আহরণ করিয়া নহরে ঢালিয়া দিবে। এইভাবে দুধ ও মধুর নহর জারী হইবে। এই ধারণার সাথে কুরআনী শিক্ষার কোন সামঞ্জস্যতা রহিয়াছে কি? কেননা কুরআন তো শিক্ষা দিতেছে যে বেহেশতের নিয়ামতসমূহ কেহ কোন দিন দেখে নাই।

কিয়ামতের দিন হাত পা কথা বলিবে– ইহার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করার জবাব

বর্তমানে গ্রামোফোন, আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহার আবিষ্কার এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য যথেষ্ট।

বিশেষ কথা– এই পর্যন্ত লিখার পর বিভিন্ন বিষয়ের উপর কতগুলি লিখার কথা স্মরণ হইল, যাহা পূর্ব হইতে আমার কাছে রক্ষিত ছিল। এইসব লিখার মধ্যে কোন কোন বিষয়ের উপর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বিদ্যমান আছে। এইগুলিকে "সংযোজন' নামক শিরোনামায় মূল গ্রন্থের অংশ বানাইয়া দেওয়া ভাল মনে করিলাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সংযোজন

॥ এক ॥

দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য সূর্য বৎসর সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে কি?

বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতে থাকিবে দুনিয়ার বিভিন্ন বস্তুর মূলতত্ত্ব ততই মানুষের সামনে খুলিয়া আসিতে থাকিবে। আর ইসলামী মূলনীতিসমূহের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে ততই সাহায্য হইতে থাকিবে। সূর্য বৎসরের মধ্যে মাস-বৎসর প্রভৃতি নির্ধারিত রহিয়াছে। এই নির্ধারণে বাহ্যিকভাবে এত সৌন্দর্য রহিয়াছে যে, ইহাকে বস্তু জগতের বিভিন্ন জিনিসের জন্য উপকারী বলিয়া দলীল প্রমাণ ব্যতীতই গ্রহণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু ভূমণ্ডল স্বীয় কেন্দ্রের চারিদিকে তিনশত পয়ষট্টি দিন কয়েক ঘন্টা ও কয়েক মিনিটে একবার ঘুরিয়া আসে। তাই এই সময়কে বার ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। আর বার ভাগের প্রত্যেক ভাগকে মাস নামকরণ করা হইয়াছে। অতঃপর অবশিষ্ট ঘন্টাসমূহকে প্রতি চার বৎসরে আর মিনিটসমূহ প্রতি চার শত বৎসরে অতিরিক্ত বৎসর বানাইয়া লওয়া হইয়াছে। যেমন, প্রতি চার বৎসর পর ফেব্রুয়ারী মাসকে লিপইয়ার বানাইয়া লওয়া হয়। এই জন্যই যে দেশে, যে মৌসুম যে মাসের জন্য নির্ধারিত ইহাতে কোন পার্থক্য হয় না। মাসের নাম বলিলেই বুঝা যায় যে, এই সময়টা গ্রীষ্মকাল না শীতকাল, কি বসন্ত কালের আগমন হইতেছে, না অন্য কোন ঋতু আগমন হইতেছে?

কিন্তু চন্দ্রমাস তদ্রূপ নয়। চন্দ্রমাসের সাথে কোন মৌসুম নির্ধারিত নয়। এমনকি বাৎসরিক সময়ের ধারাবাহিক কোন বিভক্তি নাই। (উদাহরণ স্বরূপ সূর্য বৎসরেই এই রূপ বিভক্তি রহিয়াছে যে, জানুয়ারীর অমুক তারিকে অমুক ঘন্টা অমুক মিনিটে সূর্য উদিত হয়। আর প্রতি বৎসরই নির্ধারিত দিনে একই সময়ে উদিত হইতে থাকে। কিন্তু চন্দ্র মাসে এমন বিভক্তি নাই।)

কেননা, উদাহরণ স্বরূপ- এই বৎসর সফর মাসে গ্রীষ্মকালের সূচনা হইয়াছে। কিন্তু সামনে নবম সালে গিয়া এই মাসেই কনকনে শীত পড়িতে থাকিবে। কেননা এই বৎসর সফর মাস এপ্রিল মাসের সাথে অতিক্রম করিলেও নয় বৎসর পর জানুয়ারী মাসের সাথে অতিক্রম করিবে।

ইহার কারণ এই যে, চন্দ্র ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ২৮ সেকেণ্ডে একবার পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং চন্দ্র সূর্যের বরাবর হওয়ার ২৯ দিন বার ঘন্টা ২৮ সেকেণ্ড পর পুনরায় আবার সূর্যের বরাবর হয়। এইজন্য কখনও কখনও নতুন চাঁদ ২৯ দিন পর দেখা যায়। আবার কখনও কখনও ত্রিশ দিন পর দেখা যায়। ইহাকে চন্দ্রমাস বলা হয়। তাই চন্দ্রমাস কখনও ত্রিশ দিনে আবার কখনও উনত্রিশ দিনে হইয়া থাকে। এই হিসাবে তিনশত পঁচান্ন দিনে চন্দ্র বৎসর হয়। সুতরাং চন্দ্র বৎসর সূর্য বৎসর হইতে প্রায় দশ দিন কম হয়।

তাই হিন্দুস্তানের লোকেরা প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ বৎসর এক মাস বাড়াইয়া দিয়া চন্দ্র বৎসরকে সূর্য বৎসরের সমান করিয়া লয়। চন্দ্র-বৎসরে তাহারা এই পরিবর্তন করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র-বৎসরে মাস কমবেশী হইতে পারে না। সুতরাং প্রতি চন্দ্র-বৎসর সূর্য-বৎসর অপেক্ষা সর্বদা দশ এগার দিন কম হইতে থাকে। এই জন্য সূর্য বৎসরের মাসের সাথে ইহার মাসের পার্থক্য হইতে থাকে। আবার একই মৌসুম ইহার বিভিন্ন মাসে আসিয়া থাকে। সূর্য-বৎসরের ন্যায় নির্ধারিত মাসের সাথে মৌসুম নির্ধারিত থাকে না।

এখন খুব চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, চন্দ্র মাসের এই বাহ্যিক অসম্পূর্ণতা প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ত্রুটিযুক্ত করিয়াছে কিনা? বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, মৌসুম পরিবর্তনের দিকে সূর্য বৎসর অনুযায়ী খেয়াল রাখিলে নির্ধারিত সময়ে শস্য বপন করা, ফসল কাটা, ব্যবসা বানিজ্যে গমনাগমন করার ক্ষেত্রে খুব সহযোগিতা হয়। ইহা যেন মানুষের সামনে একটি নিশ্চিত বিষয়। কিন্তু শস্য বপন করা এবং ফসল কাটার জন্য মাসের হিসাব রাখা কোন জরুরী শর্ত নয়। বরং মৌসুমের পরিবর্তনের সাথে ইহাদের সম্পর্ক। প্রকৃত সম্পর্ক কোন মাসের সাথে নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- হিন্দুস্তানে কৃষকরা সাধারণতঃ জুলাই মাসে বীজ বপন করে। তবে জুলাই মাসের আগমনই বীজ বপন করার জন্য যথেষ্ট হইতে পারে না। বরং বীজ বপন করার জন্য বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া অপরিহার্য। এই জন্য বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর পরই কৃষকের হাল চালানের কাজ শুরু হইয়া যায়। আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে জুলাই, আগষ্ট, মে, জুন সবই সমান। অনুরূপভাবে বৃষ্টির দিন শেষ হইয়া যখন মৌসুম পরিবর্তিত হইয়া যায়।

জ্ঞানী মুর্খ সকলেই শীতের আগমন অনুভব করিতে থাকে। লোকজন শীত-বস্ত্রের আয়োজনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কৃষকরা শস্যের বীজ বপন কার্জে লিপ্ত হয়। তখন এই সময়কে ইংরেজী কি মাস বলা হয় বা ইরানী কি মাস বলা হয়- তাহা জানার কোন প্রয়োজন মনে করে না।

সারকথা; সূর্য বৎসরে যে সৌন্দর্য আছে বলিয়া বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়- দুনিয়াবী কাজ কারবার উহার উপর সীমা বদ্ধ নয়। বরং মৌসূমের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু ইহার যতটুকু প্রয়োজনই আছে বলিয়া মনে হয় তাহাও আবার শুধু ভারতবর্ষেই অনুভূত হয়। এখানকার মৌসূম তো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিক্রান্ত করে। কিন্তু এমনও অনেক দেশ রহিয়াছে যে বৃষ্টির সময় নির্ধারিত নহে। কোন কোন স্থানে তো আদৌ বৃষ্টি হয় না। আবার কোন কোন দেশ এমনও রহিয়াছে যাহার কোন দিন এমন নাই যে, সে দিনে বৃষ্টি হয় না।

সুতরাং ইহা থেকে বুঝা যায় যে, সময় গণনার জন্য সূর্য বৎসর যতটুকু প্রয়োজনীয় মানব-জিন্দেগীর অপরিহার্য কর্মগুলির জন্য ইহা ততটুকু প্রয়োজনীয় নয়। যদি সূর্য বৎসরের কোন কোন দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া ইহার কিছু উপকারিতা মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খুব মুশকিলে পতিত হইতে হয়। তাহা হইল- দুনিয়াতে উন্নত-অনুন্নত, সভ্য-অসভ্য কোন জাতির জন্য বা জ্ঞানী মুর্খ এবং পুরুষ বা নারী কাহার জন্য এমন মাধ্যম রহিয়াছে যাহার দ্বারা সূর্য বৎসরের বিশুদ্ধ হিসাব করিতে পারা যায়? যদি কোন কথায় কোন মাসের হিসাবের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধিয়া যায় তাহা হইলে ইহার সমাধানের জন্য এমন কোন কুদরতী যন্ত্র রহিয়াছে যাহার মাধ্যমে হিসাবটি দুরস্ত করা যায়?

বর্ণিত বক্তব্যের সারকথা হইল; যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্জিকা, ক্যালেণ্ডারের ন্যায় কোন কৃত্রিম মাদ্যম না মিলে অথবা প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে কতক গণকঠাকুর ও জ্যোতিষ না থাকে- ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য বৎসর বিশুদ্ধভাবে চালু করার জন্য সর্বসাধারণের কাছে কোন কুদরতী মাধ্যম নাই। অধিকন্তু পঞ্জিকা-ক্যালেণ্ডারও গণকঠাকুর ও জ্যোতিষের গণনার উপর ভিত্তি করিয়াই রচনা করা হইয়া থাকে। যেহেতু ভারতবর্ষে মোটামুটি মৌসূম তিনটি শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। আর এই তিন মৌসূমের প্রয়োজনেই ভারতবর্ষের ওলামাগণ সূর্য

বৎসরের প্রচলন করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহার হিসাবের ভিত্তি হিসাবে চন্দ্রকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাহারা চন্দ্রমাসের দিবস সংখ্যার কমের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর এক এক মাস বাড়াইয়া দিতেন।

ইসলাম সাবজনীন ধর্ম। প্রতি তিন বৎসর পর এক এক মাস করিয়া বৃদ্ধি করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বর্তমান যুগের ভৌগোলিক জ্ঞান ইসলামের এই নিষেধাজ্ঞার যুক্তিপূর্ণ কারণ কত চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াদিয়াছে। অধিকন্তু প্রত্যেক মুসলমান সে জ্ঞানী হউক বা মুর্খ হউক, ভারতের শস্যশ্যমল ভূমিতেই অবস্থান করুক বা আরবের মরুভূমিতে অবস্থান করুক বা আফ্রিকার ঘন জঙ্গলেই বসবাস করুক অর্থাৎ যে কোন স্থানেই থাকুক আর যে কোন পর্যায়ের লোক হউক- নতুন চন্দ্র দেখিয়া অতিসহজে দিন-তারিখ হিসাব করিয়া লইতে পারে। ইহা এমন একটি সহজ পন্থা যে, দিন তারিখ হিসাব করার জন্য কোন পণ্ডিতের কাছে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন পড়ে না। আবার কোন পঞ্জিকার পৃষ্ঠাও উল্টানর দরকার হয় না; বরং পঞ্জিকাতে চন্দ্রমাসের যে হিসাব লিখা হয় চন্দ্র দেখিয়া অনেক ক্ষেত্রে পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ হিসাবের প্রতি হাসি আসে। (কেননা অনেক সময় পঞ্জিকায় লিখা হয় যে, অমুক দিন চাঁদের দশ তারিখ অথচ বাস্তবে সে দিন চন্দ্রের নবম দিন।)

এখন লক্ষ্য করা উচিত যে, জীবনের জন্য কি কি বিষয় অপরিহার্য। আর এইসব অপরিহার্য বিষয়সমূহের কোন কোনটির জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তের প্রয়োজন। শস্য বপন, শস্য কাটা, ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরির জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইহা ছাড়া ইবাদত মানুষের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ ইবাদতকে মানব-জীবনের প্রথম শ্রেণীর অপরিহার্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। প্রত্যেক ধর্মের ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দৈনন্দিন ইবাদত ও রহিয়াছে আর কোন কোন ইবাদত বার্ষিক। ইসলামে বার্ষিক ইবাদতের মধ্যে এমন দুইটি ইবাদত রহিয়াছে যাহা ইসলামের মূল স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রোযা ও হজ্জ। রোযার জন্য মাস নির্ধারিত, আর হজ্জের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা, দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্মেই কোন না কোনভাবে ইবাদতের জন্য ওয়াক্ত ও পন্থা নির্ধারিত রহিয়াছে।

এখন চিন্তা করিয়া দেখার বিষয় হইল এই যে, যদি রোযার জন্য সূর্য বৎসর হিসাবে শীত কালীন ছোট দিন নির্ধারিত করা হয়, যেমন ডিসেম্বর বা জানুয়ারী। অথবা যদি এমন মাস নির্ধারিত করা হয় যাহা রাত্র দিন সমান সমান, যেমন মার্চ ও সেপ্টেম্বর– তাহা হইলে ইসলামী এই নীতির প্রতি আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে, দেখ; মুসলমান কত সুবিধাজনক দিন বাছিয়া লইয়াছে। আর যদি রোযার জন্য সর্বদাই এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্যন্ত সময়ের যে কোন ত্রিশটি দিন বাছিয়া লওয়া হয়– তাহা হইলে এইসব দিনে রোযা রাখা খুব কষ্টকর হইবে। কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া হয়তবা কোন কোন লোকের মনে এই চিন্তা উঁকি দিয়া উঠিবে যে, দ্বীনের উপর চলা তো খুব কষ্টদায়ক ব্যাপার। রোযার জন্য সর্বদা এমন দিন নির্ধারণ করা হইয়াছে যেদিনে আকাশ অগ্নি দগ্ধ হইতে থাকে। যমীন উত্তপ্ত হইয়া পড়ে।

সারকথা, সূর্য বৎসর অনুসরণ করিলে হজ্জের দিন এবং রোযার মাস নির্ধারণ কোন অবস্থায়ই আপত্তিমুক্ত হইতে পারে না। এই পর্যন্ত চন্দ্র বৎসরের প্রাধান্যের যে সকল কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা পুরানো চিন্তাধারার ফসল। কিন্তু আধুনিক ভৌগোলিক জ্ঞান এই বিষয়ের উপর কি আলোকপাত করিয়াছে তাহাও বর্ণনা করার ইচ্ছা রাখি।

ভৌগোলিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা খুব ভালভাবেই জানে যে, পৃথিবী বিষুব রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর অর্ধাংশ বিষুব রেখার দক্ষিণে আর অর্ধাংশ বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত। আর সূর্য ছয় মাস বিষুব রেখার দক্ষিণে আর অবশিষ্ট ছয় মাস উত্তরে কিরণ দিয়া থাকে। এই জন্য একই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধের ও উত্তর গোলার্ধের মৌসুম বিপরীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে সময়ে উত্তর গোলার্ধে প্রচণ্ড গরম ঠিক একই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে প্রচণ্ড শীত। যেমন জুন মাসে ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকায় প্রচণ্ড গরম পড়ে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি এলাকায় প্রচণ্ড শীত পড়ে। যদি চন্দ্র বৎসরের মাধ্যমে রোযার মাস নির্ধারণ করা হইত তাহা হইলে অর্ধ পৃথিবীর লোক সর্বদা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রোযা রাখিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিত। পক্ষান্তরে অপর অর্ধাংশের লোক আরাম আয়েসের মধ্যে রোযার দিনগুলি অতিবাহিত করিত। কেননা মৌসূমের পরিবর্তনের ফলে রাত্র দিনের সময়ে পরিবর্তন আসে।

গরমের দিনে দিন বড় হয় আর রাত্র ছোট হয়। পক্ষান্তরে শীতের দিনে দিন ছোট হয় আর রাত্র বড় হয়। দুনিয়ার যেসব এলাকায় মানুষ বসবাস করে সেসব এলাকাতে বার হইতে বিশ ঘন্টা পর্যন্ত রাত্র থাকে। সুতরাং যদি জুন মাসকে রোযার মাস হিসাবে নির্ধারণ করা হইত তাহা হইলে উত্তর গোলার্ধের লোকেরা প্রচণ্ড গরমের ও তৃষ্ণার অসহ্যকর কষ্ট ভোগ করার সাথে সাথে সারা জীবন বিশ ঘন্টা করিয়া রোযা রাখিতে হইত। পক্ষান্তরে দক্ষিণ গোলার্ধের লোকেরা শীতের আরাম ভোগ করার সাথে সাথে মাত্র আট ঘন্টা করিয়া রোযা রাখিবার সুযোগ পাইত। আর তখন ইহা প্রমাণিত হইত যে, এই বিধান প্রবর্তক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অবস্থা এবং বিভিন্ন মৌসূমের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল নহেন। অথচ এই বিধানের প্রবর্তন আল্লাহ পাক স্বয়ং। আর যে ধর্মে এই বিধান চালু করা হইয়াছে– ইহা এক বিশেষ স্থানের ধর্ম। ইহা সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক ধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রমাসে এই ধরনের কোন আপত্তি উথাপিত হয় না। কোন চন্দ–মাস সূর্য বৎসরের যে মাসের সাথে মিলিত হয়। পরবর্তী বৎসর তাহা সূর্য–মাসের ঐ দিনগুলির সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তাহা সূর্য–মাসের বার মাসে ঘুরিতে থাকে। ছত্রিশ বৎসর পর আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে। যদি কোন ইবাদত কখনও গ্রীষ্মকালে হইয়া থাকে, কয়েক বৎসর পর তাহা শরৎকালে হয়। আর কয়েক বৎসর পর শীত কালে হয় আর কয়েক বৎসর পর বসন্তকালে হইয়া থাকে। প্রতি ছত্রিশ বৎসরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আসে। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোলার্ধে রমযান মাস সূর্য বৎসরের প্রতি মাসে অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য এক ইনসাফী ব্যবস্থা কায়েম করিয়া দিয়াছেন।

ইহা হইতে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে, ইসলাম যে সত্তার কাছে সত্য ধর্ম তিনি পবিত্র। তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি একমাত্র মালিক। সর্বকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি বিশ্ব নিখিলের সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। এই ধরনের বিধান একমাত্র এই প্রজ্ঞাময় মহা জ্ঞানীর আসমানী সাহায্যের মাধ্যমেই কায়েম হইতে পারে। তিনি এই ভূমির সৃষ্টিকর্তা। অন্যথায় যে সময় দুনিয়াতে ইসলামের উদয় ঘটিয়াছিল তখন মানুষের দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে জানা ছিল না। অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কেও তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তখন উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধে মৌসূমের পরিবর্তনের কথাও তাহারা জানিত না। অনুরূপভাবে হজ্জের দিনগুলিতেও একই মৌসূমের সাথে সীমাবদ্ধ নহে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক

মৌসূমে হজ্জের মাসের আগমন হয় বলিয়া হজ্জব্রত পালনকারীরা প্রতি মৌসূমে সফল করিবার সুযোগ পায়।

উপরে বর্ণিত কারণগুলির আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জগতের জন্য চন্দ্র–বৎসরই উপযুক্ত; সূর্য–বৎসর নহে।

সংযোজন

॥ এক ॥

[মুশীর–মুরাদাবা থেকে গৃহীত ১৮ই নভেম্বর ১৯১৩ ইং]

لَا تُغْلَقُ بَابُ التَّوْبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا *

বিশুদ্ধ হাদীছগুলির মধ্যে ইহাও একটি। ইহার সারকথা– যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য স্বীয় অস্তস্থল থেকে উদিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবার দ্বার বন্ধ হইবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক গোনাহগারের তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য স্বীয় অস্তস্থল দিয়া উদিত না হইবে। যখন সূর্য স্বীয় অস্তস্থল দিয়া উদিত হইবে তখন তাওবার দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। কাহারও তওবা কবুল হইবে না।

এই হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু হাদীছের অর্থে এমন কোন কথা নাই যাহার ফলে হাদীছ স্বীয় অর্থে অকাট্য হইতে পারিতেছে না।

কোন খাঁটি মুসলমান ব্যতীত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে কোন যুবক এবং লাগামহীন স্বভাবের লোক দর্শনশাস্ত্রের সাথে তাহার সম্পর্কে থাকুক আর নাই থাকুক এবং বিজ্ঞানের নাম ব্যতীত অন্য কিছু যদি নাও জানে এই ধরনের লোক সুযোগ বুঝিয়া আপত্তি উথাপন করিয়া বসিবে যে, লা–হাওলা ইহা কেমন উল্টা কথা? ইহা ইসলামের কেমন ভবিষ্যতবাণী? ইসলামী দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদগণ কিভাবে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে? ইহা তো বিবেকও কবুল করে না এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও এই হিসাবটি বিশুদ্ধ বলিয়া সাক্ষ্য দেয় না। আর যদি আর্যরা কখনও এই হাদীছটি শুনিতে পায় তাহা হইলে তাহারা সাথে সাথে কুদরতী বিধানের ঠাট্টা করিয়া নিজেদের নাস্তিকতার গান গাহিতে থাকিবে। এই দিকে জৌতিষ বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বলিতে শুরু করিবে যে, অস্তস্থলে সূর্য উদিত হওয়ার কি অর্থ? অস্তস্থল কি কোন শহরের নাম?

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শন আমাদিগকে নির্দেশ করে যে, প্রত্যেক দেশের উদয়স্থল ও অস্তস্থল পৃথক পৃথক হয়। প্রতিদিন প্রত্যেক স্থানের উদয়স্থল ও অস্তস্থল পরিবর্তিত হইতে থাকে। এখন কিয়ামতের পূর্বে যে অস্তস্থল দিয়া সূর্য উদিত হইবে– তাহা কোন্ অস্তস্থল? যদি প্রত্যেক দিনের অস্তস্থল দিয়া সূর্য উদিত হওয়ার কথা মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বিভিন্ন মানুষের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত পৃথক পৃথক কিয়ামত হইতে থাকিবে এবং একশত আশি দিনে একশত আশি কিয়ামত হইবে।

মোটকথা; বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লাগামহীন যুবকরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সত্য ভবিষ্যদ্বাণীর উপর হাজারো প্রকারের আপত্তি উথাপন করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

আধুনিক শিক্ষার প্রতি আসক্তদের জন্য তো সম্ভবই নহে যে, তাহারা এইসব বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে। এমনকি আসমানী ওহীর প্রতিও তাহাদের নির্ভরতা নাই। এই ধরনের বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ। আর আমরা এই বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তাই লাগামহীন লোকেরা আমাদিগকে ধারণা–পূজক এবং ধর্মীয় ধোকায় পতিত বলে। কিছু কিছু লোক এমনও রহিয়াছে যাহারা নিজেদের সাথীদের খাতিরে বা আত্মীয়–স্বজন, প্রিয়জন ও বড়দের সামনে যদিও পরিষ্কার শব্দে ধর্মীয় বিষয়গুলি অস্বীকার করে না এবং প্রকাশ্যভাবে ইহাদের প্রতি কটুক্তি করার জন্য প্রস্তুত হয় না, কিন্তু তাহারা মনে মনে এইসব ধর্মীয় বিষয়গুলিকে ধোকা ও অবাস্তব বলিয়া ধারণা করে।

সুতরাং যুগ এমন সব প্রজ্ঞাবান লোকের অস্তিত্ব প্রদান করা প্রয়োজন, যাহারা ইসলামী বিষয়সমূহের জ্ঞানের সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শিতার অধিকারী হয় এবং আধুনিক দর্শনের সাথে ইসলামী বিষয়সমূহের সামঞ্জস্যতার বিবরণ পেশ করিতে পারে। যেমন ইমাম গাযযালী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী প্রমুখ মনিষীবৃন্দ ধর্মীয় বিষয়সমূহের সাথে পুরাতন দর্শনের সামঞ্জস্যতা বর্ণনা করিয়া দর্শনকে ধর্মের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলেন।

উহ! আমি প্রকৃত আলোচনা হইতে কত দূরে চলিয়া গিয়াছি! কেননা আমার দাবী হইল যে, পশ্চিম দিক অর্থাৎ সূর্যের অস্তস্থল থেকে সূর্য উদিত হওয়া সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়; বরং অস্তস্থল থেকে সূর্য উদিত হওয়া

অপরিহার্য প্রমাণ করা। কিন্তু এখানে অন্য কিছু আলোচনা করা শুরু করিয়া দিয়াছি।

এখন প্রকৃত আলোচনায় আসা যাক। যদিও বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া কঠিন ও শক্ত ব্যাপার। ইহা বিবেকের চাহিদা হইতে অনেক দূরে। এই বিষয়টি শুধু মুসলমানদের বিশ্বাসগত ব্যাপার হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি সম্পূর্ণ বাস্তব। আধুনিক গবেষণা যদিও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের অসারতা প্রমাণ করিয়া ইহাদের মূলোৎপাটন করিবার জন্য সদা সর্বদা প্রয়াস চালাইয়া থাকে, কিন্তু এই বিষয়ে ইহার উল্টো প্রভাব পড়িয়াছে। এমনকি বিষয়টির সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করিবার ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণাই আমাদিগকে সাহস প্রদান করিয়াছে। আধুনিক গবেষণার আলোকে আমরা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া শুধু সম্ভবই নহে; বরং অপরিহার্য।

ইহা এইভাবে যে, সূর্যের উদয়স্থল ও অস্তস্থল মানিয়া লওয়া বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নয় অধিকন্তু ইহা কোন নির্ধারিত স্থান নহে। কেননা সূর্য যে স্থান থেকে উদিত হয় উহাকে উদয়স্থল বলে। আর যে স্থানে অস্ত যায় উহাকে অস্তস্থল বলে। আর বৎসরে নতুন নতুন উদয় স্থল ও অস্তস্থল হইতে থাকে। যেমন, ২৫শে জুন হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন এক এক নতুন উদয়স্থল ও এক এক নতুন অস্তস্থল হইয়া থাকে। কারণ পৃথিবীর গতির কারণে প্রতিদিন একই সময়ে সূর্যের আলো পৃথিবীর এক নির্ধারিত স্থানে পতিত হয় না। ইহা আল্লাহ পাকের কুদরত। কিন্তু আমরা যে অস্তস্থল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি প্রকৃতপক্ষে এইগুলি সে অস্তস্থল নহে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অস্তস্থল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন– উহা প্রকৃতপক্ষে সহীহ অস্তস্থল। আমরা উহা নির্ধারণ করিতে চলিয়াছি। তবে যাহারা এই মহাবিশ্ব সৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করে না তাহাদের সাথে আমাদের কোন আলোচনা নাই। আর যাহারা ধারণা করে যে, এই মহাবিশ্ব এমনিতেই জন্মলাভ করিয়াছে তাহাদের সাথেও কোন আলোচনা হইতে পারে না। কেননা তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে বাতিল। তাহাদের এই ধারণা খণ্ডন করা পৃথক একটি বিষয়। আধুনিক চিন্তাধারা এই সকল নাস্তিকদের ভেদ খুলিয়া দিতেছে। তবে যাহারা সূর্যকে সৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, সর্বপ্রথম দিন অর্থাৎ যে দিন সূর্য জন্মলাভ করিয়াছে সে দিন

সূর্য কোন না কোন এক স্থান দিয়া উদিত হইয়াছিল। সুতরাং সূর্য সর্বপ্রথম যে স্থান দিয়া উদিত হইয়া ভূপৃষ্ঠকে আলোকিত করিয়াছিল উহাই প্রকৃত উদয়স্থল। সমবন্টনের নীতির চাহিদা হইল যে, দিনরাত্রি উভয় সমান সমান সময়ের অধিকারী হইবে। অর্থাৎ রাত্র দিন উভয় বার ঘন্টা করিয়া হইবে। যেমন বৎসরে মাত্র দুই বার দিন রাত্রি সমান সমান থাকে। ২১শে মার্চ আর ২৩শে সেপ্টম্বর। এই দুই তারিখে অধিকাংশ বসতি এলাকাতে দিন রাত্রি পরিপূর্ণ বার ঘন্টায় সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং দিবসের পূর্ণ বার ঘন্টা পুরা হওয়ার পর সূর্য যে স্থানে অস্ত গিয়াছে উহাই প্রকৃত অস্তস্থল।

হাদীছের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, হাদীছে مِنْ مَغْرِبِهَا (সূর্যের অস্তস্থল) বলা হইয়াছে। কিন্তু مِنْ مَغْرِبِكُمْ (তোমাদের অস্তস্থল থেকে) বলা হয় নাই। শব্দের এই পার্থক্য করিয়া পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের অস্তস্থল অনির্ধারিত এবং মানিয়া লওয়া। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন যে, বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য সূর্যের অস্তস্থলও পৃথক পৃথক হইবে। এই জন্য হাদীছে সূর্যের অস্তস্থল বলা হইয়াছে। এইরূপ বলার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল যে, আল্লাহ পাক সূর্য সৃষ্টি করিয়া সর্বপ্রথম যে উদয়স্থল দিয়া উদিত করিয়াছিলেন ঐ হিসাবে যাহা প্রথম অস্তস্থল বলিয়া নির্ধারিত আল্লাহ কিয়ামতের দিনে ঐ অস্তস্থল দিয়াই সূর্য উদিত করিবেন।

এই প্রশ্নের সমাধান ইহাও হইতে পারে যে, দুনিয়া উলট–পলট হইয়া উদয়স্থল অস্তস্থল আর অস্তস্থল উদয়স্থলে পরিণত হইয়া যাইবে। যেমন কুরআনে বলা হইয়াছেঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ *

“ঐ দিন ভূমণ্ডল বর্তমান ভূমণ্ডল ব্যতীত অন্য ভূমণ্ডলে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।”

ইহা থেকে প্রমাণিত ;হইল যে, সূর্যের প্রকৃত উদয়স্থল ও অস্তস্থল থেকে কোন একটা, তা আল্লাহর ইলমে রহিয়াছে।

কিন্তু এখনও একটি বিষয় অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, সূর্য অস্তস্থল দিয়া কিভাবে উদিত হইবে? অবশ্য ইহা এত সহজ বিষয় নয়। তাই

ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা খুব কঠিন। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, আধুনিক গবেষণা এই কঠিন বিষয়টির সমাধানও করিয়া ফেলিয়াছে। এখন থেকে প্রায় সাড়ে চারশত বৎসর পূর্বে আমরা ইহা সম্পর্কে অবগত হইতে শুরু করিয়াছি। কেননা আধুনিক গবেষণা প্রায় সাড়ে চারশত বৎসর পূর্বে আমাদের হাতে এমন এক পাথর তুলিয়া দিয়াছে যাহা দ্বারা আমরা দিগদর্শন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি। আর এই পাথরের মাধ্যমেই পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ রেখা কায়েম হইয়াছে। এই রেখার উপর আড়াআড়িভাবে আরও একটি রেখা কায়েম করিলে চতুর্দিক সহীহভাবে অবগত হইয়া যায়। আর ইহারই বদৌলতে কলম্বাস জাহাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। এখন যদি আপনি লণ্ডন বা প্যারিসের রাডার অফিসে গিয়া সেখানকার মহাকাশ বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাহারা অবস্থার যাচাই করিয়া তাহাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর প্রদান করিবেন। যে, দিগদর্শন যন্ত্রের সূচঁটি উত্তরদিক থেকে ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সরিয়া আসিতেছে। আধুনিক গবেষণার ফলে আজ আমরা জানিতে সক্ষম হইয়াছি যে, দিগদর্শন যন্ত্রের সূচঁটি ধীরে ধীরে উত্তর দিক হইতে পূর্ব দিকে সরিয়া আসিতেছে। অস্তস্থল ও আস্তে আস্তে উত্তর দিকে সরিয়া আসিতেছে। সুতরাং কয়েকশত বৎসর পর উত্তর মেরু সূর্যের অস্তস্থলে পরিণত হইবে। এইরূপ হইতে থাকিলে এমন এক সময় আসিবে যে, সূর্যের বর্তমান অস্তস্থল তখন দক্ষিণ মেরু হইয়া পড়িবে। আর দক্ষিণ মেরু সূর্যের উদয়স্থলে পরিণত হইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফের সারকথাও ইহাই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক দিন-রাত্রির সাথে গ্রহজগতকে সামঞ্জস্য করিয়া অস্তস্থলকে উদয়স্থলে পরিণত করিয়া দিবেন। আজ থেকে মাত্র সাড়ে চারশত বৎসর পূর্বে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, উত্তর মেরু ধীরে ধীরে অস্তস্থলে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে এই বিষয় সম্পর্কে এক মাত্র আল্লাহ পাকই অবগত ছিলেন। আর তিনি ইহার পূর্ববর্তী অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞাত। অর্থাৎ সূর্যের প্রকৃত উদয়স্থল কোনটি তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। অতঃপর প্রকৃত অস্তস্থলে পৌঁছিতে আর কত সময় অবশিষ্ট আছে ইহাও একমাত্র তিনিই অবগত।

যদি প্যারিস ও লণ্ডনের রাডার অফিস আর সেখানকার মহাকাশ বিশেষজ্ঞগণ আমাদিগকে এই বিষয়ে অবগত না করিতেন যে, দিগদর্শন যন্ত্রের সূঁচ উত্তর দিক হইতে ধীরে ধীরে পশ্চিম [illegible] হইলে

এই কঠিন বিষয়টির সমাধান আমরা পাইতাম না আর আমাদের যুগের বেপরোয়া যুবকরা কখনও উল্লিখিত হাদীছ বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইত না। আর তাহারা ইসলামী এই বিষয়টি সম্পর্কে সর্বদা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িত। কিন্তু আল্লাহ পাকের শোকরিয়া যে, ইসলামের শত্রুরা যে আধুনিক গবেষণাকে ইসলামের শত্রুতায় নিজেদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে- ইহা আমাদের এই সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করিয়াছে।

আহকারের (অর্থাৎ হযরত থানবী (রঃ)-এর) পক্ষ থেকে নোটঃ

কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে সূর্যের এই বিশেষ উদয়ের অবস্থার বর্ণনা আসিয়াছে। তন্মধ্যে ইহাও রহিয়াছে যে, পরদিন থেকে সূর্য নীতি মোতাবেক পূর্ব দিক থেকে উদিত হইবে। সূর্য অস্তস্থল থেকে উদিত হওয়ার উল্লেখিত বিবরণ এই রেওয়ায়েতের সাথে খাপ খায় না। এই সব রেওয়ায়েত আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিবরণ ব্যতীত যদি বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে তাহা হইলে সে যেন এতটুকু স্বীকার করিয়া লয় যে, সূর্য একদিন স্বীয় অস্তস্থল দিয়া উদিত হইবে। বিষয়টির এই অংশ অনেক হাদীছে উল্লেখিত হইয়াছে। বিষয়টির দ্বিতীয়াংশ (অর্থাৎ ইহার পরদিন থেকে সূর্য নিয়মিতভাবে পূর্ব দিক থেকে উদিত হওয়া) যেহেতু ইহা বিষয়টির প্রথমাংশের (অর্থাৎ অস্তস্থল দিয়া সূর্য উদিত হওয়ার) পর্যায়ের নয়। তাই যদি কেহ দ্বিতীয়াংশকে দলীল হিসাবে গ্রহণ না করে অর্থাৎ ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না চায় তাহা হইলে সে কমপক্ষে প্রথমাংশের অস্বীকার করা থেকে বাঁচিয়া গেল। তবে এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইল এই যে, যে মহান সত্তা অংকশাস্ত্রের সুদৃঢ় বিধান সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন একদিনের জন্য বা সর্বদার জন্য ইহা পরিবর্তনও করিতে পারিবেন। তবে কুরআন পাকে উল্লিখিত لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا "আপনি কখনও আল্লাহর বিধানের পরিবর্তন পাইবেন না।"-এর আয়াতের দ্বারা উল্লিখিত সমাধানের উপর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত পরিবর্তন পাওয়া যাইবে না। অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা পরিবর্তন পাওয়া যাইবে না।

সমাপ্ত